চেনামুখ

সৌরীন সেন

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু
জবাকুসুম হাউস : কলিকাতা-১২

শ্রীরণজিৎ সেন কর্তৃক আর্ট ম্যাণ্ড লেটার্স
পাবলিশার্সের পক্ষে জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ : শুভ-আশ্বিন, ১৩৬৬

মূল্য : চার টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীঅজিত গুপ্ত

ব্লক করেছেন : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

ছেপেছেন : শ্রীসুনীলচন্দ্র পাল
বেনলী প্রেস,
১২১-বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

শ্রীনির্মলচন্দ্র মৈত্র
শ্রীমতী রাধারাণী মৈত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্য বই

'অন্য কোন খানে"

এই পুস্তকের কাহিনী ও চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তব-জীবনের কোন ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে তিল মাত্র সম্পর্ক নেই।

লেখক

অনুমান মিথ্যে নয়। বেশ বুঝলাম সহযাত্রী আমাকে উচ্চপদের একজন সরকারী কর্মচারী বলে ভুল করেছেন।

পরিচয় দিতেই একটু অবাক হন ভদ্রলোক। একটা 'তবে' বলেই, বাকী কথাগুলো দেখলাম গিলে খেলেন চটপট।

—টিকিট করবার সময় দেখেছিলাম, ফিনান্সের জয়েণ্ট সেক্রেটারি মিঃ কে. কে. রায়ের সঙ্গে এক কামরায় চলেছি আমি?

বুঝতে পারি, গণ্ডগোলটা হয়েছে এখানেই। সহযাত্রীকে জানাই,—ঠিকই দেখেছিলেন আপনি। শেষ মুহূর্তে তিনি যাত্রা স্থগিত রেখেছেন। তাঁর টিকিট ফেরত দিয়ে আমার রিজার্ভেশান হয়েছে।

ভদ্রলোক মাদ্রাজী। তবু ইংরাজী উচ্চারণে দেখি সেই তক্কার-ওপর-পেরেক-ঠোকা নেই। টানটুন কম, অর্থাৎ 'বোথ' বা 'স্থইট্' শব্দ 'বোথা' বা 'স্থইট্টা' হল না। সম্মতির প্রকাশভঙ্গীটাও দুপাশে মাথা দুলিয়ে নয়। আমি বাঙালী, দেখি চমৎকার কথা বলছেন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে বাংলায়।

পরিচয় জানলাম তারপর। নাম কে. পি. আয়েঙ্গার। ইম্পীরিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস। ফুড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশানের নিমন্ত্রণে 'সিলভি কালচারাল স্টাডি টুরে' গিয়েছিলেন রোমে। এখন দিল্লী হয়ে কাজের তাগিদে চলেছেন কলকাতায়।

ছোট্ট আঁটসাঁট বজ্রবাঁটুল চেহারা। বয়সের তুলনায় মুখখানা কচি কচি। ভেতরে বস্তু আছে বলে মনে হয়। সংযত সংহত। শুধু মাথার চুলগুলো তাঁবে নয়। সিঁথির বর্ডার-লাইন ভেঙেচুরে চুলগুলি মাথার ওপর নাগা-ডান্স করছে। দেখতে একটু বেয়াড়া, কিন্তু সবটা মিলিয়ে বেমানান নয়।

আমার কিন্তু ভালই লাগছিল ভদ্রলোককে। অনেক দ্রুত কথা বলেন। ঠোঁটে লেগে-থাকা মৃদু হাসিটি অন্তরের সম্পদের পরিষ্কার নজীর। সুন্দর

গুছোনো কথা, আর সেই সঙ্গে হামেশাই 'আরে বাবা'র ব্যবহার মন্দ লাগছিল না।

আমার পরিচয় শুনে কেমন যেন একটু দমে গেলেন মনে হল ভদ্রলোক। স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ অজান্তেই বেরিয়ে এল ঠোঁট থেকে—'অ'। পাশে-রাখা সাইক্লোস্টাইল-করা একটি পত্রিকা তুলে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কোনো এক অত্যাবশ্যকীয় সংবাদের মধ্যে যেন ডুবে গেলেন তারপর।

এতে আমি অভ্যস্ত। প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করেছি। নিজেকে ভয়ানক ছোট মনে হয়েছে। অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে মন।

দূর থেকে আমাকে আসতে দেখে বলতে শুনেছি—এই রে, ব্যাটা আবার আসছে। যে ভদ্রলোকের খোঁজে গেছি, আলো নিভিয়ে দিয়ে দোতলার জানালা থেকে তিনিই জানিয়েছেন—পরিমলবাবু আন্দুল থেকে ফেরেননি। তারপর দিনের বেলায় গেছি, মুচকি হেসে শিশুপুত্র জানিয়েছে—বাবা বাড়ী নেইকো। বুঝেছি, পরিমলবাবু বাড়ীতেই আছেন, তবু হাসতে হয়েছে আমাকে। পরিমলবাবুর ছেলেকে বলেছি—ফিরলে কি বলবে বলো তো?

—তুমি তো বালাখানার মৌলবী-সাহেব।— কথাটা বলেই ছুটে ভিতরে চলে গেছে বালকটি।...বাবারই ছেলে, তবে বয়সে শিশু। বুঝলাম, তামাক বাবদ পরিমলবাবুর কাছে কিছু অর্থ পাওনা আছে বালাখানার কোনো-এক মৌলবী-সাহেবের।

শুধু পরিমলবাবুই নন। এরকম বহু বাবুর সংস্পর্শে বহু ঘটনার ঘটকালি ক'রে হাড় কালি হয়েছে আমার। কিছু মনে আছে, কিছু গেছি ভুলে।

চুরি না ক'রে, চুরির দায়ে ধরা পড়া অভ্যাস হয়ে গেছে আমার। তাই আয়েঙ্গার সাহেবের স্বরবর্ণের ধাক্কা আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না। কানে তুলো, পিঠে কুলো আমার! আমার লজ্জা কিসের?

'করেন কি'— প্রশ্নের উত্তরে পরিচয় দিতে গিয়ে প্রশ্নকর্তার চোখের ওপর চোখ রেখেই আজ আস্তে বলি: ইনসিওরেন্স। অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ভাবে। ঠোঁটে প্রফেশন্যাল হাসি টেনে।

কাগজ থেকে চোখ তুলে মিঃ আয়েঙ্গার কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ পাড়েন। বলেন: দিল্লীতে আলোড়ন পড়ে গেছে! মার্শাল টিটো এসেছেন রাজধানীতে। ভি. আই. পি আর ভি. আই. পি। এঁদের জ্বালায় প্লেনে প্যাসেজ পাওয়া মুস্কিল! ফরেন-পলিসিতে একটা নড়চড় হবে বলে মনে হচ্ছে।

বেশ বুঝি, আমার পরিচয়ে মিঃ আয়েঙ্গার বিব্রত হ'য়েছেন কিছুটা।

শীতের রাত্রি। অন্ধকার আকাশের গায়ে ধোঁয়ার তুলি বুলিয়ে চ'লেছে ট্রেন। কাঁচের জানালা দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডার আভাষ জানান দিচ্ছে। কম্বল টেনে নিলেন মিঃ আয়েঙ্গার। এবার নিশ্চয়ই ঘুমতে চেষ্টা করবেন।

সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে দু'আঙুলে। ঘুম আমার বড় একটা আসে না ট্রেনে। বাইরে জমাট অন্ধকার। ইঞ্জিনের জলন্ত পাথুরে কয়লার কুচি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাঝে মাঝে পিছনে ছুটে যাচ্ছে। দীর্ঘ পথ। কলকাতা অনেক দূর।

ট্রেনের ইঞ্জিনের মত অবিশ্রান্ত এই ছুটে চলার আমারও যেন শেষ নেই। রাত্রে বিছানায় থাকি ক'দিন? বাড়ীতেই বা থাকি কতক্ষণ? এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে কি অবিরাম আমার ছুটে চলা। মানুষের পেছনে আমার কি দুরন্ত অনুসরণ।

পুরনো দিনের অনেক কথাই ভীড় ক'রে আসে আজ। বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো স্মৃতি সামনে এসে হাজির হয় এক এক ক'রে। সামান্য জীবনের কঠিন আবর্তে তুচ্ছ সে সব কথাগুলি জলবিন্দুর মত হয় তো বিলীন হ'য়ে গেছে বহুদিন। মোচড়গুলির ব্যথাও আজ মিলিয়ে এসেছে অনেকটা! কিন্তু দাগ? থুতনির তলার কাটা দাগের মত হৃদয়ের অন্তস্তলে সূক্ষ্ম সে সব রেখা তো আজও মিলিয়ে যায়নি। অসতর্ক বেয়াড়া মুহূর্তে নাড়া খেয়ে ওঠে কখনও কখনও। হাঁটতে চলতে বড় লাগে।

দেশ ছিল আমার পদ্মাপার।

শৈশব ও কৈশোরের সেই নিস্তরঙ্গ জীবন কাহিনী আর যে কোনো দশজনের মতো। অতি শৈশবেই লক্ষ্য করেছি, বাবার কোন কর্তব্যই

গুছোনো কথা, আর সেই সঙ্গে হামেশাই 'আরে বাবা'র ব্যবহার মন্দ লাগছিল না।

আমার পরিচয় শুনে কেমন যেন একটু দমে গেলেন মনে হল ভদ্রলোক। স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ অজান্তেই বেরিয়ে এল ঠোঁট থেকে—'অ'। পাশে-রাখা সাইক্লোস্টাইল-করা একটি পত্রিকা তুলে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কোনো এক অত্যাবশ্যকীয় সংবাদের মধ্যে যেন ডুবে গেলেন তারপর।

এতে আমি অভ্যস্ত। প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করেছি। নিজেকে ভয়ানক ছোট মনে হয়েছে। অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে মন।

দূর থেকে আমাকে আসতে দেখে বলতে শুনেছি—এই রে, ব্যাটা আবার আসছে। যে ভদ্রলোকের খোঁজে গেছি, আলো নিভিয়ে দিয়ে দোতলার জানালা থেকে তিনিই জানিয়েছেন—পরিমলবাবু আন্দুল থেকে ফেরেননি। তারপর দিনের বেলায় গেছি, মুচকি হেসে শিশুপুত্র জানিয়েছে—বাবা বাড়ী নেইকো। বুঝেছি, পরিমলবাবু বাড়ীতেই আছেন, তবু হাসতে হয়েছে আমাকে। পরিমলবাবুর ছেলেকে বলেছি—ফিরলে কি বলবে বলো তো?

—তুমি তো বালাখানার মৌলবী-সাহেব।— কথাটা বলেই ছুটে ভিতরে চলে গেছে বালকটি।...বাবারই ছেলে, তবে বয়সে শিশু। বুঝলাম, তামাক বাবদ পরিমলবাবুর কাছে কিছু অর্থ পাওনা আছে বালাখানার কোনো-এক মৌলবী-সাহেবের।

শুধু পরিমলবাবুই নন। এরকম বহু বাবুর সংস্পর্শে বহু ঘটনার ঘটকালি ক'রে হাড় কালি হয়েছে আমার। কিছু মনে আছে, কিছু গেছি ভুলে।

চুরি না ক'রে, চুরির দায়ে ধরা পড়া অভ্যাস হয়ে গেছে আমার। তাই আয়েঙ্গার সাহেবের স্বরবর্ণের ধাক্কা আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না। কানে তুলো, পিঠে কুলো আমার! আমার লজ্জা কিসের?

'করেন কি'— প্রশ্নের উত্তরে পরিচয় দিতে গিয়ে প্রশ্নকর্তার চোখের ওপর চোখ রেখেই আজ আস্তে বলি: ইনসিওরেন্স। অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ভাবে। ঠোঁটে প্রফেশন্যাল হাসি টেনে।

কাগজ থেকে চোখ তুলে মিঃ আয়েঙ্গার কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ পাড়েন। বললেন: দিল্লীতে আলোড়ন পড়ে গেছে! মার্শাল টিটো এসেছেন রাজধানীতে। ভি. আই. পি আর ভি. আই. পি। এঁদের জ্বালায় প্লেনে প্যাসেজ পাওয়া মুস্কিল! ফরেন-পলিসিতে একটা নড়চড় হবে বলে মনে হচ্ছে।

বেশ বুঝি, আমার পরিচয়ে মিঃ আয়েঙ্গার বিব্রত হ'য়েছেন কিছুটা।

শীতের রাত্রি। অন্ধকার আকাশের গায়ে ধোঁয়ার তুলি বুলিয়ে চ'লেছে ট্রেন। কাঁচের জানালা দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডার আভাষ জানান দিচ্ছে। কম্বল টেনে নিলেন মিঃ আয়েঙ্গার। এবার নিশ্চয়ই ঘুমতে চেষ্টা করবেন।

সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে দু'আঙুলে। ঘুম আমার বড় একটা আসে না ট্রেনে। বাইরে জমাট অন্ধকার। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত পাথুরে কয়লার কুচি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাঝে মাঝে পিছনে ছুটে যাচ্ছে। দীর্ঘ পথ। কলকাতা অনেক দূর

ট্রেনের ইঞ্জিনের মত অবিশ্রান্ত এই ছুটে চলার আমারও যেন শেষ নেই। রাত্রে বিছানায় থাকি ক'দিন? বাড়ীতেই বা থাকি কতক্ষণ? এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে কি অবিরাম আমার ছুটে চলা। মানুষের পেছনে আমার কি দুরন্ত অনুসরণ।

পুরনো দিনের অনেক কথাই ভীড় ক'রে আসে আজ। বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো স্মৃতি সামনে এসে হাজির হয় এক এক ক'রে। সামান্য জীবনের কঠিন আবর্ত্তে তুচ্ছ সে সব কথাগুলি জলবিন্দুর মত হয় তো বিলীন হ'য়ে গেছে বহুদিন। মোচড়গুলির ব্যথাও আজ মিলিয়ে এসেছে অনেকটা! কিন্তু দাগ? থুতনির তলার কাটা দাগের মত হৃদয়ের অন্তস্তলে সূক্ষ্ম সে সব রেখা তো আজও মিলিয়ে যায়নি। অসতর্ক বেয়াড়া মুহূর্তে নাড়া খেয়ে ওঠে কখনও কখনও। হাঁটতে চলতে বড় লাগে।

দেশ ছিল আমার পদ্মাপার।

শৈশব ও কৈশোরের সেই নিস্তরঙ্গ জীবন কাহিনী আর যে কোনো দশজনের মতো। অতি শৈশবেই লক্ষ্য করেছি, বাবার কোন কর্তব্যই

নেই সংসারে। 'কইরব্যার চাইছিলাম সবই, কিন্তু কইরল্যাম না,—এই নৈর্ব্যক্তিই বীতরাগ এনেছিল তাঁর জীবনে।

বিদ্যে ছিল, বুদ্ধিও তাঁর কম ছিল না। তবে সে বিদ্যে নিয়ে উকিল হওয়া গেছে স্বচ্ছন্দে কিন্তু ওকালতি করা যায়নি। কাগজ কলমে জমি-জমা থেকে কি পরিমান পাওনা হাতে আসা উচিত, তার আঁক কষা গেছে সহজেই, কিন্তু সে বুদ্ধিতে আদায় হ'য়েছে সামান্যই।

সারাদিন দেখতাম বাড়িতেই থাকতেন বাবা। মাটিতে শতরঞ্চি পাতা, আর আমাদের গোল হ'য়ে বসা। কাঁঠাল কাঠের চৌকির ওপর দাঁড়িয়ে গলাবন্ধ কোট প'রে কলেজ স্কোয়ারের স্থরেন ব্যানার্জির মত বক্তৃতা দিতেন বাবা।

'ওথেলো'র কথা কি আমি আজ শুনেছি! ইংরেজী হরফই বোধ হয় ভাল করে জানা হয়নি তখনও। বাবা রাত্রে বাঙ্গলা তর্জমা শোনাতেন মাকে। গল্প ক'রতে ক'রতে বাবা উত্তেজিত হয়ে প'ড়তেন। সব কিছু ভুলে গিয়ে অন্য মানুষ হ'য়ে যেতেন।

আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। গ্রীষ্মকালে জানালার ধারে কাঠের সিন্ধুকের ওপর বই নিয়ে বসতাম। এখানে বসবার পেছনে এক বিশেষ কারণ ছিল। এক হাতে বই থাকতো, অন্য হাতে দড়ি। সে দড়ির অপর প্রান্ত লিচু গাছের সঙ্গে লটকানো পটকার চেরা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা। অল্পক্ষণ পর পরই আমাকে দড়ি টানতে হতো। পট্-পট্, খট্-খট্—শব্দ তুলে বাদুড় তাড়াতে হ'তো।

বাবার শরীরটা খারাপ ছিল সেদিন। গতরাত্রের ঝড়ে পড়া কাঁচা আম নিয়ে মা হয়তো ব্যস্ত ছিলেন।

বাবা বললেন: কিসের আম! এদিকে এস!

প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে মা বিছানার এক প্রান্তে এসে বসেন। তারস্বরে চীৎকার ক'রছিলাম তখন: 'আমরা যে দেশে বাস করি, তাহার নাম বাঙ্গলা দেশ!' এক নজর তাকিয়ে নিয়ে বাবা বললেন: আস্তে।

তারপর গত রাত্রের অসমাপ্ত কাহিনীর খেই ধরে বাবা কিছুটা উঠে বসেন। কতটা বুঝেছিলাম জানি না কিন্তু তন্ময় হ'য়ে শুনছিলাম।

হঠাৎ কি হলো জানি না। খাট থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাবাকে এত উত্তেজিত হ'তে দেখিনি কোন দিন। ঘরের অপর প্রান্তে চলে গেলেন। শাল কাঠের খুঁটির সঙ্গে লণ্ঠন জ্বলছিলো একটা। শিশুর মত আমরা সবাই কাদার আস্তর লাগানো বাঁশের দেওয়ালে বাবার বিশাল ছায়া মূর্তিটি দেখতে থাকি।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ইংরেজীর তুফান উঠে আসে। আশ্চর্য রকম গম্ভীর গলায় অদ্ভুতভাবে এগিয়ে এলেন। সামনের লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিলেন চট্ ক'রে। তারপর কখনও ধীরে কখনও উঁচু পর্দাতে, রাগে, ক্ষোভে আর আত্মগ্লানিতে তছনছ হতে হতে সামনে আসেন। সে ইংরেজীর এক বর্ণও বুঝিনি সেদিন। শুধু মনে হ'য়েছে ভয়ানক কিছু ঘটছে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বুকের রক্ত শুকিয়ে জমাট হ'য়ে গেছে তখন আমাদের। ভয়ে, বিস্ময়ে আর উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে উঠেছে। ছোট ভাইটি চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। আমরা সবাই একসঙ্গে কেঁদে উঠি হাউমাউ করে।

কাহিল ক'রেছিলো দিদিকেও। তবু হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বলে : ক্যারে, কান্দিস্ ক্যারে? এত সব মিথ্যা, সবই খেলাখেলি।

দিদির কথায় মন প্রবোধ মানেনি। আশ্বস্ত হ'য়েছি মায়ের গলায়।

বাবাকে দেখলাম টল্‌তে টল্‌তে বিছানার এক প্রান্তে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে চোখ তুলে অদ্ভুত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন : ফুল…ফুল…।

ইংরেজী ও শব্দের অর্থ আমার জানা ছিল। ভাবলাম আমার অন্যমনস্কতা দেখে বাবা তিরস্কার করছেন আমাকে।

বইয়ের দিকে চোখ তুলে দেখি বাঙ্গলা দেশ ভিজে উঠেছে। বাদুড়ের আনাগোনা লক্ষ্য ক'রেও পটকার দড়ি টানতে পারিনি। 'ইয়াগো'র মুখটা ইঁচে ডাঙায় ধরা পড়া নোয়াখালির সাংঘাতিক খুনে ডাকাত জরিপ মণ্ডলের মুখের মত মনে হলো। কতটা বুঝেছি জানি না, তবে ডেসডিমোনার দুঃখে আমার হৃদয় তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠেছিলাম অনেকক্ষণ।

চেনা মুখ

রাত্রে ভাল ক'রে খাওয়াই হ'লো না সেদিন। ভাত ধরে গিয়েছিলো। দুধ খেয়েছিলো বেড়ালে।

সেদিন রাত্রে দিদির সঙ্গে একমত হওয়া গেল। ইঁচেডাঙায় বাবাই যে সব চেয়ে বেশী ইংরেজী জানা লোক, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। অনেকদিন পর দিদি আমাকে সেদিন পাশে শুতে দিয়েছিলো। আশ্চর্য, হাঁটু দুটো কিন্তু সেদিনও আমার সঙ্গেই ছিল।

কাঁথা দিয়ে মুখ ঢেকে দিদির গলা জড়িয়ে জানতে চেয়েছিলাম ; হ্যারে দিদি, ডেসডিমোনার দেশ কি ফরিদপুরে ?

তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখদুটিতে এক টুকরো ক্লান্ত হাসি টেনে, অলস বাহুতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে দিদি বলেছিলো : বিল্যাত্ !

গভীর রাত্রে ঝড়ে পড়া আম কুড়োনোর লোভে পূবের আকাশে সামান্য আলোর ক্ষীণ আভাষ না পেয়েও অন্ধকার আকাশের গায় শুকতারার হাতছানি দেখে চুপিসাড়ে বিছানা ছাড়া ও শাস্তি হিসাবে সারা দুপুর বাবার সামনে বসে অঙ্ক কষার মধ্যেও আনন্দ ছিল কিছু।

দৈনন্দিন গ্রাম্য জীবন নিতান্তই সীমাবদ্ধ। আমার মত কিশোরের জীবন সেখানে আরও অনেক বেশী ছিল সীমিত। চিত্র হয়তো ছিল কিছু, বৈচিত্র্য ছিল সামান্যই।

কল্লতোয়ার খাল পেরিয়ে বাতাবীলেবুর ফুটবল খেলা ফেলে দত্ত বাড়ির ছেলের দয়ায় দৈবাৎ যেদিন চামড়ার বল খেলে আসতাম, সেদিনের কথা মনে থাকতো অনেক দিন !

গরমের দিনে সন্ধ্যাবেলায় পড়া মুখস্ত করার মধ্যে দৈবাৎ যদি কোনোদিন বাড়ির কোথাও এক সাপ বেরুতো, ভয়ের সঙ্গে খুশীর সে এক অদ্ভুত আনন্দে প্রাণমন ভ'রে উঠতো। মনে হতো, রোজ সন্ধ্যাবেলায় ঠিক পড়ার সময় মা মনসা যদি একটা করে সাপ পাঠান তাহ'লে বড় ভাল হয়। পর মুহূর্তেই মনে হয়েছে, তা কি কখনও হয়। অত সাপ মা মনসা পাবেন কোথায় ?

স্কুল ছিল প্রায় এক ক্রোশ পথ। তাও এ বাড়ির উঠোন দিয়ে, সে বাড়ির দাওয়া ঘুরে, ছায়া দিয়ে দিয়ে। মাঝে ধানের জমির বিরাট

এক মাঠ। আলের ওপর দিয়ে প্রখর সূর্যতাপ মাথায় নিয়ে ফিরতে হ'তো স্কুল থেকে।

পৌষের ফসল কাটার পর শূন্য জমিতে পাকা ধান খেতে আসতো অসংখ্য ঘুঘু পাখী। ফেরার পথে থমকে দাঁড়াতে হতো। দিগন্ত বিস্তৃত ধূ ধূ করা ফাঁকা মাঠের মধ্যে গলায় ঘন্টা বাঁধা গরুর পেছনে সাদা বকের লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে অবিরাম পিছু নেওয়া দেখতে বড় ভাল লাগতো। নিস্তব্ধ চরাচরে, অখণ্ড মৌনতার মধ্যে থেকে তাপদগ্ধ ধরিত্রীর ক্লান্তি শুনতে পেতাম। শ্রান্তি যেন মূর্ত হ'য়ে উঠতো ঘুঘু পাখির ডাকের মধ্যেঃ ঘু··· ঘু···ঘু···ঘু···ঘু···ঘু! বিরামবিহীন সেই ডাকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলে যেতাম একটানাঃ গোপাল ঠাকুর······ওঠো······ওঠো!

অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কলকাতায় এলেন মা-বাবা। আমারও সেই সঙ্গে প্রথম আসা। গঙ্গাস্নান আমার ভাল মনে নেই। তবে চিড়িয়াখানার সত্যিকারের বাঘ আমাকে বিস্মিত করেছিলো অনেকটা। ঘোড় দৌড়ের ময়দানে অসংখ্য মানুষের দৌড় অবাক করেছিলো অনেকখানি। কিন্তু পথের ধারে লোহার চৌবাচ্চায় ঘোড়ার জল খাবার ব্যবস্থা দেখে আমি সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হ'য়ে যাই।

তারপর ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটিতে মায়ের শাড়ী কিনতে আসার অধ্যায় আমার আজও ভোলা মুস্কিল।

'বাসন্তি'র এগারো হাত শাড়ী'—চওড়া গোঁফওয়ালা দোকানের সেই ফতুয়া পরা কর্মচারীটি কার উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লেন বুঝলাম না। তবে অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম আমার মাথার ওপর দিয়ে কাঠের রেলিংয়ের ওপাশ থেকে ধপাস ক'রে একগাদা কোরা শাড়ী এসে পড়লো।

মা বাছেন পাড়, বাবা দেখেন জমিন, আর আমি দেখি অবাককাণ্ডবাণ্ড! অনিমেষ নয়নে কোরা শাড়ীর গায়ে ফুলকাটা সোনালী ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেছি শুধু!

ভবিষ্যতে আমি দারোগা হ'বো। মনে মনে এই রকমই ঠিক করে রেখেছিলাম আমি। কিন্তু চওড়া গোঁফওয়ালা কর্মচারীটিকে দেখে হিংসা হ'লো! বড় হ'লে নতুন কাপড়ের দোকানে কাজ নেওয়াই স্থির ক'রে ফেলি সেদিন!

চেনা মুখ

গদ্দির ওপর বসে থাকা। সামান্য কাঁচি চালিয়ে নতুন শাড়ীর জোড় একটানে ছিঁড়ে ফেলা! হরেক রকম খরিদ্দার! লাল শালুর কাপড়ে দস্তুর মত দশ টাকার নোট বেঁধে অনেক দূরে ছুঁড়ে দেওয়া, ও এক চুল না নড়েও ফেরৎ হাতে ফিরে পাওয়া! ধপাস্ ধপাস্ ক'রে ধুতি শাড়ীর স্তূপ প'ড়বে রেলিং থেকে! খাকি পরা দরোগার চাকুরীও কেমন নিষ্প্রভ মনে হ'লো।

কলকাতা থেকে যেন রাজ্য জয় ক'রে ফিরলাম। নানান গল্প করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলাম!

জমি-জমা আমাদের ছিল বিস্তর। বহুদূরের সীমানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছিল সে জমির সীমারেখা। হঠাৎ কোথা থেকে ঝড় উঠে এলো। মাথার ওপরে দুর্য্যোগ নেমে এলো। চুরমার ক'রে দিয়ে গেল প্লাবনে। দুর্ধর্ষ পদ্মা তার করাল জিহ্বায় যেন লেহন ক'রে নিয়ে গেল সবকিছু। যে টুকু রেখে গেল, তাতে তার ছোবলানো নোনা স্বাদই পাওয়া গেল শুধু।

গলার স্বরটি আমার ক্রমে ঘেষ-ঘেষে হ'য়ে ওঠে। রোগাটে দেহটা লম্বা হ'য়ে প'ড়ছে তখন হঠাৎ ক'রে। ওষ্ঠাগ্রে গোঁফের রেখার আভাষ জানান দিচ্ছে। কৈশোরের স্বপ্ন ঘেরা পৃথিবী এক এক ক'রে উধাও হয়ে যেতে থাকে। জীবনের সহজ সরল সাবলীল গতিছন্দ কেমন চোরাই আবর্তের মুখে প'ড়ে হারিয়ে যেতে থাকে। ইঁচেডাঙার সবচেয়ে বেশী ইংরেজী জানা লোকটিকে মা যখন ভাগ্যবিড়ম্বিত এক অপদার্থ মানুষ হিসাবে আখ্যা দিতেন তখন আমি স্থির হ'য়ে বুঝতে চেষ্টা করতাম।

দেখতাম দৈনন্দিন তেল-নুন-লকড়ির সংগ্রামে বাবা যেন পরাজিত, অপহৃত এক সৈনিক। স্বাস্থ্য অপগত। বুদ্ধি অপদস্থ। আর বিদ্যে? সে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।

রাজা বেচাল হলে রাজ্য যায় ছারেখারে। বাবা ছিলেন নিরাসক্ত ধরনের একজুতের মানুষ। তাই মাকে হতে হয়েছিল কিছুটা বাস্তববাদী। সংসার শাসন করতে শক্ত হতে হয়েছিল তাঁকে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর চেহারায়, কথাবার্তায়। এরকমটি সচরাচর চোখে পড়ে না। আমার সামান্য সাফল্যটুকুও প্রধানতঃ তাঁরই খাতিরে।

দেশের স্কুল থেকে পাস করে কলকাতার কলেজে পড়তে আসার অধ্যায়টি আমার স্পষ্ট মনে আছে। মায়ের শাড়ীর পাড় দিয়ে শতরঞ্চিতে জড়ানো সেই বিছানা আর লালগোলাপ-ফুল-মার্কা সবুজ টিনের সুটকেস নিয়ে শিয়ালদহ আসা, আমি জীবনেও ভুলবো না। তারপর শিয়ালদহ থেকে ভবানীপুরে তিন-নম্বর বাসে চড়ে, পেট্রোলের গন্ধে বমি করতে-করতে রানী শঙ্করী লেন।

শ্রীযুক্ত কেদার লাহিড়ী, এম-এ, বি-এল ;—পাথরের ওপর নাম খোদাই করা দোতলা বাড়ীর সামনে এসে অভয়কাকা বললেন,—এই বাড়ীতেই তোমাকে থাকতে হবে।

থেকে গেলাম লাহিড়ী-মহাশয়ের বাড়ীতে। সিঁড়ির তলায় ফালতু জায়গা ছিল, সেইখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হল। ইলেকট্রিক লাইটের মেন সুইচ-বোর্ড ছিল একদিকের দেয়ালে। মিটার-বাক্সের ওপরে একটি ছোট লাল মড়ার মাথা আঁকা থাকবার পিছনে সেদিন কোনো যুক্তিই খুঁজে পাইনি।

লাহিড়ী-মশায়ের বাড়ীর দুটি ছেলেকে আমার পড়াতে হত। তা ছাড়া এটা সেটা ফুটফরমায়েশও আমাকে তামিল করতে হত সকাল-সন্ধ্যে। দুপুরে কলেজ।

কোনো দিন বাড়ী ছেড়ে কোথাও থাকিনি। ভয়ানক অসুবিধা হ'ত প্রথম প্রথম। অতি সামান্য একখানা পোস্টকার্ডের জন্য কি পরিমাণ যে কাতর হয়ে পড়তাম তখন!

লাহিড়ী-মশায়ের স্ত্রী ছিলেন কিছুটা ঝাঁঝালো প্রকৃতির স্ত্রীলোক। তাঁর তাড়নায় সারা সংসারটি কেঁপে কেঁপে উঠত মাঝে মাঝে। হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে না দিলেও, এ বাড়ীতে বিয়ে দিয়ে তাঁর বাবা যে নিতান্তই মাটি-খাওয়া কাজ করেছেন, সে-কথা গলা ফাটিয়ে সর্বসাধারণের কাছে জাহির করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতেন না তিনি। লাহিড়ী-মশায় কোর্টে সওয়াল করতেন শুনতুম বাঘের মতো, কিন্তু কখনো জবাব দিতে শুনিনি কোনদিন তাঁর স্ত্রীর মুখোমুখি। শুধু দেখতাম, ঘরে আগুন লাগলে বেরিয়ে আসতেন ছুটে। —গামছা পরে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত পায়চারী

করছেন আর জিভ চিবোচ্ছেন। দাঁত-চাপা অস্ফুট মন্তব্য শুনে বুঝি, লাহিড়ী-মশায়ও তাঁর শ্বশুরের মতোই মাটি খেয়েছেন।

সাধারণতঃ, আশ্রিত বলে বেশ খানিকটা দূরে রেখেই কথাবার্তা বলতেন তিনি। আবার দেখেছি কখনো আপন হয়ে গেছেন আমার সঙ্গে। কাপড় জামা ধোপাবাড়ী না দিয়ে, নিজে হাতে কেচে নেওয়ার মধ্যে যে যথেষ্ট নৈতিক বলের পরিচয় আছে, এ কথা তিনি আমাকে প্রায়ই শোনাতেন। আর ছাত্রজীবনের তাঁর সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের সিকি ভাগও যে আমাদের মতো হাল আমলের ছেলেদের দ্বারা সম্ভব নয়, সে কথা তিনি হলপ করে বলতে পারতেন।

তবু আমি লাহিড়ী-মশাইকে আমার অন্তরের নমস্কার জানাই। নমস্কার জানাই এই কথা স্মরণ করে যে, কঠিন এই শান-বাঁধানো কলকাতায় তিনিই আমাকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছিলেন দয়া করে।

কলকাতায় আমার কিছু আত্মীয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিত্তবানও ছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু কোনো আশ্রয়,—সামান্য কোনো ভরসা দিতে চেয়েছেন কেউ, এরকম আমার স্মরণে আসে না। উপরন্তু কলেজের কেতাবী পড়াশোনা বন্ধ রেখে কলকব্জার মধ্যে ঢুকে পড়বার মহামূল্য পরামর্শ দিয়ে আমাকে ধন্য করতে চেয়েছেন অনেকেই। আজ আমি তাঁদেরও নমস্কার জানাই।

ধন্য আমি আগে থেকেই, অনেক বার। নিজেকে কিন্তু সবচেয়ে বেশী ধন্য মনে করি, যখন দেখি বিশ্বসংসারে আমি একা—নিতান্তই একা। জীবনের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি, সব সমস্যা ও জটিলতার সামনে আমি একা।

পাস করলাম। ভর্তি হলাম্ বি-এ ক্লাসে। তারপর দ্রুত কতগুলি ঘটনা ঘটে গেল। আমার দিদি বিধবা হলেন। লাহিড়ী-মশায়ের আশ্রয় খোয়াতে হল। বন্ধু রণেনের বাড়ীতে একরকম জোর করেই ঢুকতে হল আমাকে। ওদিকে হিটলার অতর্কিতে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে বসল। পরীক্ষার দু'মাস আগে দেশ থেকে তার পেলাম—বাবার অবস্থা খারাপ; সত্বর চলে এসো।

বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। গিয়ে দেখি মার বিয়ের সর্বশেষ গহনা, একজোড়া বালা বাঁধা দেবার পাতক থেকে বহু আগেই তিনি আমাকে পরিত্রাণ দিয়ে গেছেন।

গল্পে গল্পে পরে শুনি, শরীরটা খারাপ লাগতেই মাকে বলেন এক গ্লাস জল দিতে। তারপর জল খেয়ে সেই-যে শুয়ে পড়েন, সেই শোয়াই হয় বাবার অন্তিম শয্যা।

বরাবরই আত্মসম্মানী লোক,—সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেই চলে যান বাবা।

বাবা চলে গেলেন, কিন্তু আমাকে আবার ফিরে আসতে হল কলকাতাতেই। রণেনের অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিলাম। ভারে এমনিতেই কাটতো না, ধারেও কাটল না—ফেল করলাম।

রণেনের বাবা আমাকে একটি চাকরি জুটিয়ে দিলেন এক বীমা-অফিসে। মাইনে পঁয়ত্রিশ টাকা। বেঁচে গেলাম দুর্দিনে।

মাসের প্রথম মাইনে হাতে পেয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম রণেনের বাবাকে। প্রণাম নিলেন না ভদ্রলোক। মনে আছে, বলেছিলেন—নিজেকে প্রণাম ক'রো।

এইখানেই আমার গাঙ্গুলী-সাহেবের সঙ্গে পরিচয়।

শ্রীযুক্ত ও. কে. গাঙ্গুলী—সত্যি স্বনামধন্য পুরুষ। গোটা বীমা-কোম্পানীর একমাত্র কর্ণধার। অঙ্কুর থেকে মহীরুহ, কোম্পানী তাঁর নিজ হাতে গড়া। চাকরি হবার কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল আমার। ভয়ে ভয়ে দেখা করতে গেলাম। বিরাট অফিস-রুম, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে একা বসে আছেন গাঙ্গুলী-সাহেব।

বসতে বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন,—দীনেনবাবুর কাছে তোমার কথা শুনেছি। (দীনেনবাবু রণেনের বাবা)। চাকরি করছ করো; কিন্তু আমি তোমাকে একটা এজেন্সি নিতে বলব। ভালো একজন অর্গানাইজারের হাতে দেব তোমাকে···চেহারা আছে······বলতে কইতে পারো······আমার মনে হয় প্রচুর কাজ তুমি কোম্পানীকে দিতে পারবে। একবার কাজে ঢুকলেই দেখবে প্রচুর আনন্দ।···আমি বিশ্বাস করি তোমার এতে উন্নতি হবে।

বিশ্বাসে বিশ্বাস আসে। নিলাম এজেন্সি গাঙ্গুলী-সাহেবের কথায়।

প্রথমটা পাঁচজনের কাছে বিদ্রূপ আর ঠাট্টাই জুটেছে বেশী। পরিচিত লোক হতাশ করেছেন সবচেয়ে। দীর্ঘ দু'মাসের মধ্যে সামান্য অঙ্কের একটি কাজও জোগাড় করতে পারিনি আমি।

চেনা মুখ

গাঙ্গুলী-সাহেব আবার ডেকে পাঠালেন একদিন। তেমনি উৎসাহ দিয়ে বললেন,—কাজকর্ম দিতে পারছ না? খুব হতাশ হয়ে পড়েছ, কেমন? প্রথমে এরকম হয়-ই। দিনে অন্ততঃ দুটি নতুন মুখের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করবে, কথা কম বলবে, আর নিজের বৃত্তিকে শ্রদ্ধা করবে···। জানবে, এটাও পুরোপুরি একটা আর্ট। কবি যে সিন্‌সিয়ারিটি নিয়ে কবিতা লেখে, শিল্পী আঁকে ছবি—তোমাকেও তোমার বৃত্তিকে সেইভাবে গ্রহণ করতে হবে। ভরসা হারিয়োনা, তোমার হবে।—তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

যদি মেলে তো এই বিশ্বাসেই বস্তু মিলাবে। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার কর্ম সুরু। ক্লান্ত দেহে সারাদিনের ব্যর্থতা পকেটে নিয়ে রাত্রে যখন বিছানায় যাই, গাঙ্গুলীসাহেবের কথা মনে ভাবি: ভরসা হারিওনা,—তোমার হবে।—তোমার ওপরে আমার বিশ্বাস আছে।

আলবৎ হবে। নইলে আমি দাঁড়াব কোথায়?

ভবানীপুর থেকে শ্রীমানী-বাজার, পায়ে হেঁটে দিনের পর দিন একই লোকের পেছনে ছুটেছি। ধর্মতলায় স্যাণ্ডালের ফিতে গেছে আলগা হয়ে। শীতে কাঁপতে-কাঁপতে রাত্রে বাড়ী ফিরেছি।

ঘুম নেই চোখে। দেশ থেকে মায়ের সমস্যাপূর্ণ পত্র উদ্বিগ্ন করেছে প্রাণমন। এলোমেলো চিন্তা। রাত্রে ভয়াবহ স্বপ্ন। বিছানা-বালিশ ঘামে ভিজে সব একাকার হয়ে গেছে।

আমিও কেমন যেন দুর্মদ হয়ে উঠেছি তখন।···একটা কাজ হল এক কেরানীবাবুর কাছে। সামান্য প্রিমিয়াম, তাই কমিশনও পাই যৎসামান্য। তবু কি খুশিই যে হই সে-দিন! পরে আমেদাবাদে শান্তিরাম শেঠিয়ার কাছে ছয় অঙ্কের লোভনীয় কাজ করেও এত আনন্দ পাইনি।

দীর্ঘকাল পার হয়ে গেছে তারপর। শুধু আমার নয়, সারা দুনিয়ার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে—যুদ্ধ গেছে, দুর্ভিক্ষ গেছে গোটা দেশটার ওপর, বিক্ষোভ উঠেছে নগরে শহরে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সে-পটভূমির কোথায়ও আমি নিজেকে খুঁজে পাই না। যে প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে আজ এই দিল্লী-মেল ছুটে চলেছে, ঠিক তেমনি দৃক্‌পাতহীন ছুটে চলার আমারও বিরাম

নেই। স্টীম-ইঞ্জিন গতি পায় কাঁচা কয়লার দাপটে,—আমি ছুটে চলেছি 'পয়সা করো'র দুর্মদ প্রেরণায়।

আজ আমার বয়স উনচল্লিশ। সাদার্ন অ্যাভিন্যু বামে রেখে স্টেট-বাস যেখানে বাঁক নেয়, তার মুখেই আমার বাড়ী। ইনসিওরেন্স-জগতের নতুন কর্মীরা আজ আমার কাহিনী শুনে তাদের বৃত্তিতে লেগে থাকার ভরসা পায়। তাতে কিছুটা গল্প থাকে—অতিকৃতি, অতিভঙ্গীও থাকে কিছুটা। তা থাকে।

আমার আত্মীয়স্বজন আমার মাসিক রোজগারের যে কাহিনী বলে বেড়ায়, সেটা নিতান্তই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বাড়ানো। ঠিক-ঠিক কামাই যে কত হয়, তার সঠিক হিসেব নেই আমার। তবে কোম্পানী ডিষ্ট্রিক্ট সেভেনের ইনকাম ট্যাক্স অফিসার যে বলতে পারবেন না, সে-কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

মিঃ আয়েঙ্গারের সঙ্গে আমার আলাপ জমল পরদিন। সকালের রাঙা আলোতে দেখলাম আমার ব্যবসার দিক দিয়ে তিনি মোটেই লোভনীয় পাত্র নন। তবু কাউকে আমি কম প্রয়োজনীয় বলে মনে করি না। কি সূত্রে কার কথায় কোন্ ভাগ্যের হদিশ মেলে কে জানে? —দুর্বল টাঙ্গায় এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথ বেয়ে এসেও এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড সেলুন-কামরার হদিশ মেলা বিচিত্র কি?

মিঃ আয়েঙ্গার দেখলাম একজন দুঁদে অফিসার। ধরাবাঁধা ছক-কাটা জীবন। লাল ফিতের গেরোয় বড় বেশী শক্ত করে বাঁধা। তিন শো পঁচিশে কর্ম সুরু, সাতাশ শো পঞ্চাশে শেষ। পঞ্চান্ন বছর বয়সে চাকুরি-জীবনের অনিবার্য পরিসমাপ্তি। মুরুব্বীর জোর থাকলে, 'ইন দি ইণ্টারেস্ট অফ, পাবলিক সার্ভিস' দেরাদুন বা দিল্লীতে অবশ্যই স্বচ্ছন্দে পুনর্বহাল হতে পারবেন। নচেৎ ঢাকী-বিদেয় মাসিক পাঁচ শো টাকা পেন্‌শন নিয়েই ফিরে যাবেন দেশে। তার পর হাতি-খেদা বা বন্যজন্তু-সংরক্ষণের ওপর সচিত্র কাহিনী লিখবেন হয়তো স্টেটস্‌ম্যানে। পুরোনো চাল ভাতে বেড়ে হাঁড়ি ফাঁসাবেন আরও কোথাও কোথাও।

চেনা মুখ

মানুষের মনের দুর্বল ক্ষোভ, লোভ আর আফসোসে ঠিকমতন সুড়সুড়ি দিতে পারলে লোকটিকে আবার ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। ক্ষ্যাপার কাজই তো পরশপাথর সংগ্রহ করা, তো সে ক্ষেপবে না কেন? তবে অপারেশন-টেবিলে যে নিপুণতার সঙ্গে সার্জন রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করেন, এতে অনেকটা সেই নিপুণতার দরকার করে। সামান্য বেতাল হলে ওদিকে রোগী মারা যায়, এদিকে আমার কৌতুহল একচুল বেসুরো হলে ম্যানার্সে টান পড়ে। অপারেশান-টেবিলে যদি সার্জনের লাগে ছ'মিনিট থেকে ছ'ঘণ্টা, আমার লাগে চার গজ থেকে চারশো মাইল। ঘণ্টার কাঁটা ঘড়ির ডায়ালটিকে প্রায় পঁচাত্তর ডিগ্রী আবর্তন করে এল।

মিঃ আয়েঙ্গারের ক্ষোভ নিতান্তই সূক্ষ্ম। অভিমানটি মোটেই মোটা দাগের নয়। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তাঁর। তবু নালিশের ভাবে খানিকটা যেন বলতে চান, দেশের টেকনিশিয়ান বা 'নো হাউ' লোকগুলো যেন দাদার বাড়ীতে সব বিধবা বোন। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসারদের দাপটে কোনো জায়গায় কোনো কিছুই করবার উপায় নেই। বিভাগীয় 'অ্যাফরেস্টেশন্ স্কীম' কেন যে আই.সি.এস. সেক্রেটারির অনুমোদনের অপেক্ষা রাখবে, তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না। দুই আর দুই যোগ করলে পাঁচ শুধু বললেই হবে না, যোগফলটার নির্ভুলত্ব সম্পর্কে আবার চেঁচিয়ে জানান দিতে হবে সর্বত্র।

অতিশয় সত্য কথা। এ প্রসঙ্গ নিয়ে চিন্তা করবার সুযোগ হয়নি, কিন্তু অভিযোগ শুনেছি প্রচুর। এ যেন ভালো রেডিওলজিস্টকে দিয়ে রেডিও মেরামত করানো। ডেপুটি কমিশনার বদলি হয়ে আসুন চীফ কমিশনার হয়ে, এমন কি তিনি পুনর্বাসন-দপ্তরে নির্বাসিত হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রবল বেগে ও প্রচণ্ড দাপটে ডেপুটি আর এস্. পি. তাড়না ক'রে এসে আয়েঙ্গার-সাহেবকে শাল-প্ল্যান্টেশানের জায়গায় 'ক্যাসিয়া সাইমা' রোপণের প্রসঙ্গটি ভেবে দেখতে বলে ফাইলে নোট দিলে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ অছে বৈকি?

এ সমস্যা আজ শুধু বাঙ্গলা দেশের নয়,—সর্বত্র আজ এই একই সমস্যা। এ শুধু আয়েঙ্গার-সাহেবের দুঃখ নয়, ভারতের সমস্ত সরকারী টেক্‌নিক্যাল অফিসারদের মনের কথা।

ভয়ানক দ্রুত কথা বলেন মিঃ আয়েঙ্গার। পরে আমাকে দেখি আর এড়াতেই চাইছেন না। বই বা খাতাপত্তরের মধ্যে ঢুকে পড়বার কোনো চেষ্টাই করেন না তিনি।

অনেক কথা হয়েছিল পরে। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, তাঁর ছেলে সিংহল থেকে বজবজে বদলি হয়েছে। বিদেশী একটি পেট্রোল কোম্পানীতে কাজ করে সে। লিফ্‌ট দুর্ঘটনায় স্ত্রী অনেকদিন আগেই মারা গেছেন।

আমি আমার ব্যবসার কথাটি বাঁচিয়ে সব কথাতেই যোগ দিচ্ছিলাম। শুধু এইটুকু মনে হচ্ছিল, দিল্লী থেকে কলকাতা—দীর্ঘ এই ক্লান্তিকর পথযাত্রা কি একেবারেই বৃথা যাবে? আয়েঙ্গার-সাহেব হঠাৎ একেবারে জানান না দিয়ে সোজা প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, মিঃ সেন, শতখানেক টাকা মাসিক প্রিমিয়ামে কতটা রিস্ক্‌ কভার করা যায়?—এই এমনি, টাকাটা কততে গিয়ে দাঁড়ায়?

আগে আগে এইরকম অবস্থায় চোখমুখের ভাবই আমার হয়ে উঠত অন্যরকম। ব্যাগের জীপ্‌-ফাস্নারে টান পড়ত সঙ্গে সঙ্গে। মুহূর্তে খুলে ব'সতাম নামতার বই; প্রশ্ন করতাম—হোল-লাইফ না এণ্ডাওমেণ্ট? বয়স কত? বিশবছরের এণ্ডাওমেণ্ট করুন স্যার,—লোকে এইটাই বেশী করে। রিস্ক্‌ কভার করতে চান তো উইদাউট-প্রফিট-ই করতে বলব আপনাকে। আজ আমি একটু ভিন্ন পথে হাঁটি। এক গাল হেসে বলি, অবাক করলেন স্যার। এ বয়েসে আবার ইন্সিওর করবেন কি?

উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন আয়েঙ্গার-সাহেব। ইচ্ছাকৃত আমার হাসির পর্দাটিও আমি আর-এক ধাপ ওপরে তুলে দিই। আয়েঙ্গার-সাহেব বলেন, —ছেলের জন্য বলছিলাম। প্রশ্নের জবাব দিই মাত্র, কিন্তু তাতে কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাই না।

তার পর কত কথা হয়েছে। কিন্তু ইন্সিওরেন্সের কথা তুলিনি। শেষের দিকে কথাবার্তা তাঁর বিদেশ-ভ্রমণেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রচুর প্রশংসা করছিলেন ওদেশের। তবে তাতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ছিল না। সে-দেশের লোকের কথাও খুব বেশী হয়নি। ছিল শুধু বনের কথা।

বন দেশের অমূল্য সম্পদ সন্দেহ নেই; কিন্তু আয়েঙ্গার-সাহেবের কথায় মনে হচ্ছিল সে-দেশে বন ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।

উপেক্ষিত হয়েছেন সব দরজায়, তাই শেষকালে এক এজেন্সির ছাড়পত্র নিয়ে প্ল্যাস্টিকের থলি হাতে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলেছেন। মন পড়ে আছে খিদিরপুরের রেলওয়ে দপ্তরে বা কয়লাঘাট স্ট্রীটের হিসাব-পরীক্ষার অফিসে। এজেন্সি নেহাত-ই একটা স্টপ-গ্যাপ। সামান্য একটা ইশারার অপেক্ষা মাত্র। সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে তক্ষুনি দৌড় দেবেন সেই দিকে।

এঁদের অনেকেই আজকাল আমার কাছে অদ্ভুত সব অনুরোধ নিয়ে এসে থাকেন। আমার নাকি খুব হাত। আমি একটু বলে দিলেই নাকি মাস-মাইনেতে ইনস্পেক্টর বা অর্গানাইজারের চাকুরি পাওয়া যায়।

তাঁদের হাস্যকর অভিজ্ঞতা এ লাইনে। নিজে কিছুই জানেন না, অথচ অপরকে শেখাবেন কি করে, আমি বুঝি না। শুধু এইটুকু বুঝি, ওঁরা শুধু বুঝতে চান মাস-মাইনে। অনেকে আবার আমার সামনেই প্রেস্টিজের কথা পেড়ে থাকেন।

অতি সোজা প্রশ্ন করি আমি: বলুন তো, অমুক কোম্পানি যে নিয়মে হাজারে তেপ্পান্ন টাকা নিয়ে থাকে, সেখানে আপনার কোম্পানি চুয়ান্ন দাবি করেন কি হিসাবে? এরকম প্রশ্ন কোন পার্টি ক'রলে কি উত্তর দেবেন?

জবাব নেই। সম্পূর্ণ নিরুত্তর।

এ ধরনের কর্মীদের 'সেল্‌স টক্' শুনে জগুবাবুর বাজারের দাঁতের মাজনের ফিরিওয়ালাদের কথাই মনে হয়।

রাস্তার ফিরিওয়ালাদের তবু বাহবা দিতে হয়। তাসের খেলা দেখাতে পারে তারা। বাজিমাত ক'রে লোক জড়ো করবার ক্ষমতা আছে তাদের। মুখ দিয়ে রক্ত তুলে ভোজ-বাজি দেখাচ্ছে তারা।

আমি নিজের জীবন দিয়ে খতিয়ে দেখেছি, শুধু সাজানো বানানো কথায় অকারণে সকারণে অপরকে বড় করে, রেঁস্তরা সিনেমায় আর দোকানে দাম গুণে বাজি জিতবেন বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভুল করেন এ বৃত্তিতে।

নিজেকে সস্তা করে তুরুপের তাসের সন্ধান পাওয়া যায় কি? সে দীনতায় কারও করুণার সঞ্চার হয়তো হয়, কিন্তু তাতে আর যাই হোক, ইনসিওরেন্স

কেস্ হয় না। আমার স্ব শ্রেণীর কর্মীদের এ কথা জানা থাকা দরকার।

কলকাতা শহরে গাড়ী-বাড়ী, বন্ধুবান্ধব আছেন, আর্থিক সচ্ছলতার গ্যারান্টি আছে, এমন ঘরের ছেলের প্রথম জীবন এ বৃত্তিতে কিছুটা আশাপ্রদ সন্দেহ নেই। প্রথম চোটেই কয়েকটা কেস্ দিয়ে অর্গানাইজারকে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু বৌদির ভাই শেষ হলে, বোনের দেওর ফুরিয়ে গেলে, সারা কলকাতায় তিনি আর একটি প্রাণীরও সন্ধান পান না। এমন বহু উৎসাহী কর্মীর এজেণ্ট-জীবনের অপমৃত্যুর কথা আমার নোট-বইয়ে লেখা আছে।

এই শ্রেণীর কর্মীদের হাত দিয়ে যে পরিমাণ নতুন কেস্ কোম্পানির পাকা খাতায় ওঠে, তার শতকরা প্রায় পঞ্চাশটি পলিসি সূতিকা-গৃহেই মারা যায়। দুই-এক খেপ টাকা জমা পড়ল, তারপর সব চুপচাপ। লোকে মারা গিয়ে নিজের পলিসির কাগজটি বাঁচিয়ে রেখে যান। কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো। বেঁচে থাকেন তিনিই, পলিসির হয় অপমৃত্যু।

আমাকে যাঁরা চেনেন তাঁরা অনেকেই হয়তো একটু হেসে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলবেন : খুব যে জ্ঞান দিচ্ছেন স্যার, ক্যালকাটা ক্লাবের আপনার সেই 'এপিসোড'টি দেব নাকি ফাঁস করে? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো মিস্ পাওয়েল-কে ছেদীলালের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য মোট কত টাকা খরচ করেছিলেন আপনি?…রেঁস্তরায় খাওয়ানোর কথা বলছেন, কিন্তু যে পরিমাণ হুইস্কির বিল আপনি মেটান তার ক'পেগ আপনি নিজে খান? আরও শুনতে চান? জলপাইগুড়ির চা-বাগান গ্রাস করবার জন্য দোলগোবিন্দ রায়কত-কে ডিনার দিয়ে সুবিধা হবে না জেনে ছ'মাসের মধ্যে দু'বার আপনার ভাগ্নীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান করেছিলেন, এ কথা কি সত্যি?

সত্যি। অভিযোগ অস্বীকার করবো না। তবে সবটা সত্যি নয়। অভিযোগ অর্ধসত্য। পুরোটা জানা নেই তাই হিসেবে গোলমাল ঠেকবে। মিথ্যে নয়, তাই বলে সেটা সবচেয়ে বড় সত্যি নাও হতে পারে।

আমার সাফল্যের এইগুলিই যাঁরা টপ্ সিক্রেট বলে মনে করেন তাঁদের কিন্তু ঠকতে হবে।

চেনা মুখ

চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। ইনসিওরেন্স বিজ্‌নেস কোনো মহৎ কাজ নয় স্বীকার করি, কিন্তু চালাকির দ্বারা যে সেটা সম্ভব নয় এ-দাবি আমি করবোই।

নিজের চারিত্রিক কাঠামোকে করতে হয় ভয়ানক বেশী 'অ্যাকোমোডেটিভ'। তাতে অবশ্য বেশ কিছুটা চাপ পড়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু করতেই হয়। নিজের সঙ্গে চাই পরিষ্কার বোঝাপড়া। এগুতে হলে কতটা এগুবো, পিছুতে হলেই বা কতটা। স্বর্গ-নরকের জিওগ্রাফিটা ভালো করে জানা থাকা চাই।

আমার বিরুদ্ধে অনেকের অনেক কিছু বক্তব্য আছে জানি। সুনাম যেটুকু পেয়েছি, দুর্নাম কুড়িয়েছি তার অনেক বেশী।

আমার বিরুদ্ধে কেউ যখন চার্জশীট দাখিল করতে চান, তখন আমার ভালো উকিলের কথা মনে পড়ে না; বরং তাকে আরো কিছু পয়েণ্ট ধরিয়ে দিতে ইচ্ছা করে।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাত জেগে আমি সেদিনও নিখিলবাবুর সঙ্গলাভের খাতিরে উচ্চ মার্গ-সঙ্গীত শুনতে গিয়েছি। তবলার কানি ধরে ঘরানা বুঝিনি বটে, কিন্তু তেহাই-এর মধ্যে ভুল করে হাততালি দিয়ে বসিনি।

আমি নিজেকে কিছুটা শক্ত ও নিরেট লোক বলে জানি। ছবির 'ছ' বুঝিনে, কিন্তু কোনো বিশেষ মক্কেলকে খুশী করবার জন্য আমার প্রদর্শনীতে যেতে হয়। ছবির কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে হয়: কোয়ায়েট, কোয়ায়েট—মাচ্ ইনফ্লুয়েন্সড্ বাই ভ্যান্ গগ্। প্রশংসা করতে গিয়ে স্ট্রোক্ কথাটা সন্তর্পণে এড়িয়ে আলতো করে বলি—ব্লিদম্।

এরকম অনেক, এরকম বহু ঘটনা। ছেদীলালের সঙ্গে মিস্ পাওয়েলের পরিচয়ের পিছনে শুধু টাকা নয়। বিজলী আলোতে টাকা গুনে দেখতে হয় বলে কেউ হয়তো দেখে ফেলেছেন। কালো অন্ধকারে বায়োস্কোপ দেখেননি কেউ? পাগল হয়েছেন, সে কথা আমি ফাঁস করব!

এ এক অধ্যায়। এখানে আমি এক রকম, অন্যত্র এই আমি-ই হই দুই। আমাকে দেখা দিতে হয় বহু রূপে, বহু বার।

চেনা মুখ

বেহালার তারাতলায় ইজ্‌মা-র (ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স অ্যাসোসিয়েশন) মর্ডার সাহেব পাঁচ পেগ কুমেলের পর শ' ও এলেন টেরির প্লেটোনিক প্রেমের কাহিনী যখন শেষ করেন, আমাকে তখন গর্ডন ক্রেগের এপিলোগ টানতে হয়। পিনাকী রায় চৌধুরীর চেম্বার্স অব কমার্সে দুর্ধর্ষ দাপট। তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে বহু লোকের সুস্থ দেহ মুহূর্তে চুরমার হয়ে যেতে পারে। তাঁকে ডিনারে আমি করব আপ্যায়ন? মিস্ পাওয়েলের দীঘল দেহ তাঁর মনে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে না। তাই আমাকে টেনে বার করতে হয়েছিল তাঁর গোপন ভালো-লাগাটি। ছবি-পাগল পিনাকী রায় চৌধুরীকে আমিই সন্ধান দিয়েছিলাম: মাতিস সম্বন্ধে জানতে চান? রজার্স ফ্রাইতে কুলোচ্ছে না বুঝি? সোভিয়েটে ট্যাবু না থাকলে আপনাকে আলেক-জাণ্ডার রমের বইটি পাঠিয়ে দেব।

ভাববেন না আমার সামান্য রকমেরও পড়াশোনা আছে। পড়াশোনা যাঁরা করেন তাঁরা আমার মতো তড়িঘড়ি খবর রাখতে পারবেন না। ট্রেনের সঙ্গে মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ-র যে সম্পর্ক, বইয়ের সঙ্গে আমার সেই খাতির। রেলের ইঞ্জিন দৌড়বে তেরোশো মাইল, মেডিক্যাল রিপ্রেজে-ণ্টেটিভ-র দৌড় ধানবাদ পর্যন্ত। চারশো পাতার বইয়ের প্রিফেস্‌টুকু পড়ি বটে, বাকী পাতাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই। বই শেষ করি সোয়া ঘণ্টায়। তাই যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট, সে ফুলের জোগাড় রাখতেই হয়। পুজোর মন্ত্র আমার ব্যাগেই ভরা থাকে।

আজ দেশে স্কুল-মাস্টারের চেয়ে দারোগার সামাজিক মর্যাদা বেশী। ঘরে বাড়ন্ত মেয়ে থাকলে প্রফেসর ফেলে গেজেটেড অফিসারের পেছনে ছোটেন মেয়ের বাবা। গল্প লিখে আজ সাহিত্যিক যে অর্থ পান, স্টুডিওতে বিয়ের সিকোয়েন্সে শাঁখ বাজিয়ে বিগতযৌবনা এক্সট্রা তার চেয়ে অনেক বেশী রোজগার করে।

কিউবিজম্ বা অ্যাবস্ট্রাক্ট্ আর্ট না বুঝলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু হিসাবে ভুল করলে চলবে না। পুরো নামটা জানা থাকা চাই পাব্‌লো পিকাসোর।

নিখিলেশের ফোনে এক খবর পেলাম—অনিল মিত্তির ক'দিন আগে ভয়ঙ্কর মোটর-দুর্ঘটনা করেছেন যশোর রোডে। জীবনে বেঁচে গেছেন, কিন্তু নতুন হাড্‌সন গাড়ীটি চুরমার হয়ে গেছে। চুরচুর হয়ে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে মৌলালীর এক গ্যারেজে। সাংঘাতিক আহত হয়েছেন অনিলবাবু। এখন কিছুটা ভালো। ডাঃ দত্তগুপ্তের নার্সিং-হোমে আছেন। মাস চারেক আগে গাড়ীটি আমার হাত দিয়েই ইন্‌সিওর্ড হয়েছে।

বেরুনোর মুখেই ছিলাম। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়ি। ল্যান্সডাউন রোড ধরি। এখনই আমাকে যেতে হবে ডাক্তার দত্তগুপ্তের নার্সিং-হোমে।

' সত্যি, অনিল মিত্তিরের গেরো চলেছে যেন। হাড্‌সন গাড়ী কেনবার পর থেকেই কপালে 'দ' লেগেছে। এইতো সেদিন কী মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মারাত্মক ব্রেকে টায়ারের ঘষা দাগ আজও বোধহয় মুছে যায়নি যশোর রোডের পীচের রাস্তায়। কী দুরন্ত অঘটন গেছে একটা! এ আবার কি নতুন বিভ্রাট!

অনিল মিত্তিরের কাছে আমি ঋণী। নিতান্ত অকৃপণ হাতে আমাকে কাজ দিয়েছেন। ঢিলেঢালা এবড়ো-খেবড়ো নয়, আঁটসাঁট লোভনীয় কেস্।

নার্সিং-হোমের সামনেটায় একফালি মরসুমী ফুলের বাগান। খোঁজ নিয়ে জানি সাত নম্বর কেবিনে আছেন অনিল মিত্তির।

আমাকে দেখে বেশ প্রীতই হলেন অনিল মিত্তির। ডান পায়ে ও বাঁ হাতে দীর্ঘ প্লাস্টার। মাথায় পটি। একটা শক্ত কাঠি প্লাস্টারের ফাঁক দিয়ে চালিয়ে পা চুলকোচ্ছেন। মুখটা শুকনো-শুকনো। চোখ-দুটো বসা।

মুখে হাসি টেনে বলি: হাত-পা ভেঙ্গে 'দ' হয়েছেন! এমনিতে তো ভালোই দেখছি। কিছুক্ষণ আগে আপনার খবর পেলাম। সোজা আপনার এখানেই আসছি।

একজন নার্স স্ক্রু আলগা করে বিছানার এক প্রান্তের উচ্চতা কমিয়ে নীচু করে দিয়ে গেলেন।

আমার চেয়ারের হাতলে হাত রেখে ঝুঁকে বলেন অনিল মিত্তির: আজ কি বার মিঃ সেন?

—বুধবার।

—আচ্ছা, এরা আলোগুলো জ্বালতে চায় না কেন বলুন তো? কি বিশ্রী অন্ধকার-অন্ধকার লাগছে।

আলো ছিল ঘরে। বাইরে বেশ রোদ। তবু উঠে গিয়ে বোতাম টিপে আলো জ্বালি। চেয়ারে ফিরে এসে বলি: গাড়ীটাকে শাসনে রাখতে শিখুন···আমি তো সর্বদাই আপনাকে ভয়ানক জোরে গাড়ী চালাতে দেখি। কত বড় একটা ফাঁড়া গেল বলুন তো!

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন অনিল মিত্তির। বলেন: কিছু না, কিছু না। বিশ বছর এই বেগে গাড়ী চালাচ্ছি। অন্যায় অভিযোগ তুলে আপনিও দেখছি সকলের মতো আমাকে দোষী করছেন।

—দোষগুণের প্রশ্ন নয়। কতবড় একটা দুর্ঘটনা গেছে! মীরাকে হারিয়েছেন সেদিন, হাত-পা ভেঙ্গেছেন এবার, সেই সঙ্গে গাড়ীটাও এনেছেন চুরমার করে। আমার কোম্পানির একজন অফিসার, যিনি সকালে ফোন করেছিলেন, তিনি বলছিলেন, এরকম সাংঘাতিক কার-অ্যাক্সিডেণ্ট তিনি জীবনে দেখেননি। পথের লোকের দোষ দিয়ে লাভ নেই স্যার, আপনার গাড়ী চালানো দেখে আমারই ভয় হয়।

জবাবে বলেন: আপনার মতো সংযমী অবশ্য নই আমি, তবে আমার কাহিনীর পুরোটা শুনলে এ মন্তব্য যে আপনি করতেন না তা আমি জানি।

হেসে বলতে হয় আমাকে: দেখবেন আবার এমন কিছু বলবেন না যাতে 'ক্লেমে' চোট পড়ে।

উচ্চকণ্ঠে হাসতে গিয়ে হাঁটুতে বোধহয় আঘাত পান অনিল মিত্তির। বলেন: আপনার সঙ্গে কি আমার শুধু ইন্সিওরেন্সের সম্পর্ক? পুরোটা আপনাকে আমায় বলতেই হবে।

শুরু করলেন অনিল মিত্তির:

চেনা মুখ

অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে জমিজমা দেখতে গিয়েছিলাম। এস্টেট-অ্যাকুইজিশানের হাতে পড়ে জমিজমার সুখ গেছে। একটা কেসের তদন্ত করতে কিছু দেরী হবে জেনে অবিনাশকে রেখে আমি একাই ফিরছিলাম। আধ ঘণ্টার পথ, উল্টো-মুখো জোয়ার থাকবার জন্য প্রায় সন্ধ্যে-সন্ধ্যি বসিরহাট এসে পৌছোই। মুরারি অবশ্য রাত করে এতটা পথ একা আসতে বারণ করেছিল। মুরারিকে তো আপনি চেনেন?

—চিনলাম। মুরারিমোহন নাথ, টাকীর।

—মনে আছে দেখছি। যাক্‌গে, পথে বেরিয়ে পড়লাম। কোলকাতা ফেরবার আমার প্রয়োজনই ছিল। চোরাই সোনা নিয়ে একটা ঝামেলা চলেছে কিছুদিন। সলিসিটারের সঙ্গে কিছু পরামর্শ ছিল। কিছুটা পথ এসেছি, হঠাৎ বেমক্কা একটা শেয়াল পড়লো রাস্তায়। ডানদিকে না বাঁ-দিকে খেয়াল নেই। আপনি এসব মানেন না জানি, আপনি হাসতে পারেন, কিন্তু আমি এসবে খুব বিশ্বাস করি। মনটা আমার তখনই গেল খারাপ হয়ে।

জোরে গাড়ী চালানোর কথা ওঠে না। অতি সাধারণ গতিবেগ ছিল আমার গাড়ীর। একা চলেছি, পেছনের একটা চাকাও ছিল দুর্বল।

বেশ কিছুটা পথ এলাম। এক ঘূর্ণির মুখে অনেকটা আকাশ হাতে পেলাম। গোল চাঁদ উঠেছে আকাশে। থালার মতো পুর্ণিমার চাঁদ। ছাঁৎ করে উঠলো বুকটা। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল আমার সারা দেহে। এই দিনেই, এই পথেই মীরাকে হারিয়েছি এইখানেই!

এই কথা মনে হবার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেলাম আমি। রুমাল দিয়ে হাতের তেলো মুছে কূল পাইনে। হাত-পা আমার ঘামতে লাগলো। বাইরে আকাশ ছিল পরিষ্কার। ব্যাটারি কিছুমাত্র কমজোরী নয়। তবু দৃশ্যমান জগতের সব-কিছুই যেন আবছা মনে হতে লাগল। গাড়ীটা রাখি। গাড়ী থেকে নেমে সামনে তাকাতেই আবার একটা শেয়াল চোখে পড়লো। কয়েক হাত দূরে বাঁ-দিক থেকে ডানদিকের বাঁশবনে ঢুকে গেল। যাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে বার বার আমাকে দেখে গেল। শুকনো বাঁশের পাতার ওপর পায়ের ছপ্‌ছপ্‌ আওয়াজ মিলিয়ে না যাওয়া

পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। ফিরে এলাম গাড়ীতে। হাতের ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে তখন।

এই যশোর রোডের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি উঁচুনীচু আমার ভালোভাবেই জানা আছে। হামেশাই যাওয়া-আসা ছিল বসিরহাটে। হাজার হাজার মাইল আমি গাড়ী চালিয়েছি এই পথেই।

কিন্তু আপনাকে আমি বোঝাতে পারবো না মিঃ সেন, আমার যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো। আকাশে ছিল জ্যোৎস্না—পুর্ণিমার রাত, গাড়ীর আলো কিছুমাত্র অপ্রচুর নয়, তবু পীচের রাস্তা খুঁজতে গিয়ে এ-পাশে ও-পাশের মেঠো পথে এসে পড়ছিলাম।

ঠিক এই সময়েই জুঁইফুলের গন্ধ পেলাম। গন্ধে ভরে উঠলো আমার গাড়ী। কেমন যেন বেতালা লাগলো। গাড়ীর গতি কমিয়ে পিছনে ফিরে তাকাই। সামান্য কোনো কিছু চোখে পড়লো না। অসঙ্গতি নেই কোনো কিছুতেই। কিছুটা বেশীমাত্রায় থরথর করে, বন্ধ হয়ে গেল গাড়ীটা।

আমার নিজের যেটুকু কলকব্জার জ্ঞান তাতে গোলমাল কিছু চোখে পড়ল না। উপর্যুপরি ক'বার চেষ্টা করে হতাশ হয়ে পথে নেবে আসি। পরিপূর্ণ মৌনতা চারদিকে।

কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না। গাড়ীর দরজা বন্ধ করবার শব্দে চমকে উঠলাম। দ্বিতীয় কোনো প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। গাড়ীর দরজার আওয়াজ হবার কোনো কারণ নেই। পা চালিয়ে ফিরে আসি গাড়ীতে। অন্য কোনো কিছুর সামান্য আভাসও নেই কোথাও। চাবি ঘুরিয়ে পায়ে আস্তে চাপ দিতেই আমাকে অবাক করে দিয়ে গাড়ীটা আবার গর্জে উঠল।

বিনা কারণে হর্ন বাজাই। চারিদিকের নিস্তব্ধতা খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়ে। শুরু হলো জুঁইফুলের গন্ধ। সে গন্ধে ভরে উঠল আমার আকাশ-বাতাস!

যুক্তি দিয়ে বোঝা আমার শেষ হয়েছে তখন। বুদ্ধি আমার ফুরিয়েছিল হয়তো, কিন্তু কিছুমাত্র ভুল হয়নি। আমার বাঁ দিকের জায়গাটাতে কিসের যেন

সাড়া পেলাম। গাড়ীর স্টিয়ারিং হুইল দু'আঙুলে রাখা যায়, কিন্তু দুই মুঠোর মধ্যেও সেটিকে শাসনে রাখা সম্ভব হল না, সেনসাহেব।

সাহসে বুক বেঁধে পাশে তাকাই। এক সজীব পদার্থের আভাস পেলাম। দেহ নেই, মুখ নেই, চোখ নেই। কোনো কিছুই নেই। তবু মনে হতে লাগল আমার অতি নিকটে পাশে বসে কে যেন আমাকে দেখছে।

ভুল-ভাল আমার আগেই হয়েছিল। গোলমাল ঠেকছিল আগে থেকেই। কিন্তু এতটা বেসামাল হয়ে পড়িনি।

জুঁইফুলের গন্ধে বাতাস ছিল ভরপুর। নিশ্বাস নিয়ে কূল পাইনে। বেশ বুঝি আমি কাঁপছি। বুক শুকিয়ে উঠেছে আমার। একটি নিদারুণ উত্তেজনায় ডান পা সোজা হয়ে পড়েছে তখন। গাড়ীর ওপর তখন যেন আর কোনো অধিকার রইল না।

যখন খেয়াল হলো তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। সামনে পথ খুঁজে পাইনে। হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে সব, বেশ বুঝতে পারলাম। নিদারুণ কিছু ঘটে গেল এইটুকু শুধু বুঝলাম। চেতনা বোধ হয় আমি আগেই হারিয়েছিলাম। চূড়ান্ত সংঘাতের মুহূর্তটা তাই আমার মনে নেই।

জ্ঞান হতে দেখি হাসপাতালে। ডাক্তার দত্তগুপ্তের নার্সিং-হোমে। আজ ছ'দিন।

সিগারেট আমার শেষ হয়ে এসেছে আঙুলে। অনিল মিত্তিরের মুখের ওপর চোখ তুলে তাকিয়ে থাকি। রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো কাহিনীটির মধ্যে এক নীরব সত্য উঁকি দিতে থাকে আমার মনে।

অনিল মিত্তির বলেন: ক'দিন থেকে শরীরটা আমার খারাপ যাচ্ছিল। মীরা চলে যাবার পর একদিনও রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। নানা চিন্তা আমায় পেয়ে বসত। আপনাকে পুরো ঘটনাটা বলে কিছুটা হালকা হলাম। কেন যে এমন হল সে-রাত্রে! আপনাদের সাইকোলজিতে কি বলে?

মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় আমি পটু নই। তাতে আগ্রহও নেই আমার। তবে খাপছাড়া পুরোনো ঘটনা, বহু প্রশ্নের হিজিবিজিগুলো আমার কাছে যেন একটা পরিপুর্ণ ছবি হয়ে দেখা দিল। নানা সংশয় আর সন্দেহ যেন পরিষ্কার হয়ে গেল অনেকটা। অনিল মিত্তিরের কাহিনীতে সত্য-মিথ্যা যাচাই

করতে বসলে হয়তো কিছু পরিমাণ খাদ বেরুবে, কিন্তু তাই বলে দুঃস্বপ্ন বলে সবটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। ধোঁয়াটে গুমট অন্ধকারে যেটুকু ছিল অস্পষ্ট তার অনেকটাই এখন পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল।

নাটকীয়ভাবে আমার সঙ্গে পরিচয় অনিল মিত্তিরের।

অনিল মিত্তিরের মামা অঘোর দত্তের সঙ্গে অমল দের পরিচয় ছিল। কী সূত্রে এঁদের পরিচয় সে কাহিনী আমার অজ্ঞাত।

অমল দে নিজে ছিলেন এম.বি ডাক্তার। কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। নিতান্ত স্নেহের ও প্রীতির চোখে দেখতেন আমাকে। তাঁর 'নক্স-ভমিকা' বা 'অ্যাকোনাইট'-এর দু'এক পুরিয়া আমি নিলে তিনি খুশী হতেন।

অমলবাবু ছিলেন বিপত্নীক। বড় ছেলে সুভাষ আমার পুরোনো দিনের সহকর্মী ছিল। তার সূত্রেই এ-বাড়ীতে আমার আনাগোনা। ইন্সিওরেন্স ছেড়ে যুদ্ধে গিয়েছিল। টিউনিসিয়াতে প্রাণ হারায় সুভাষ।

শ্যালক রেবতীবাবুকে অমলবাবুই মানুষ করেন। এক বিলিতী কোম্পানিতে কাজ করতেন রেবতীবাবু। বৌ নিয়ে থাকতেন বরানগরে। অফিসের সাহেব তাঁকে ভালবাসতেন। বহু টাকা নাড়াচাড়া করবার কাজে তিনি বহাল ছিলেন। তাঁর নিপুণ হাতে সে-টাকার অনেকটা একদিন কালো অন্ধকারে উধাও হয়ে যায়। সেই ভাঙাচোরা জোড়া লাগাবার তাগিদে দিশেহারা হয়ে উঠলেন পরে রেবতীবাবু। ক্যাশ মেলাবার জন্যে তিনি ঘোড়-দৌড়ের মাঠে ছুটোছুটি করলেন। হাতীবাগানে অমলবাবুর পায়ে এসে কেঁদে পড়লেন তারপর। বললেন : জামাইবাবু আমি আত্মহত্যা করব।

ব্যস্ত হওয়া অমলবাবুর স্বভাব। এই দুর্যোগ থেকে রেবতী বাবুকে কিভাবে বাঁচানো যায় সেই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসল। রেবতী বাবুকে সঙ্গে নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরলেন। সব জায়গা থেকে তিনি ফিরে এলেন।

রাত্রে ঘুম নেই। রেবতীবাবুর জেল হবে। সংসারটা জলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে। নানা চিন্তায় দিশেহারা অমলবাবু। ক্লান্ত দেহমন। ঘুম আসতে রাত গড়িয়ে যায়। ঘুমহারা চিন্তার খেই ধরে খুঁজে পেলেন চিন্তা-নিবারণের একমাত্র পন্থা।

চেনা মুখ

পরদিন রেবতীবাবুকে বাঁচাতে চললেন অমলবাবু। কিছুটা দ্বিধা অবশ্য ছিল। রেবতীবাবুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে তিনি কোথায় নিয়ে চলেছেন এ প্রশ্ন তাঁর মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন তাঁর নান্য পন্থাঃ। অমলবাবু সোজা এসে হাজির হলেন শেষ আশ্রয়স্থল অঘোর দত্তর দোকানে।

শো-রুমের পাশের ঘরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে অঘোর দত্ত তখন তাঁর কোনো এক কর্মচারীকে বোধ হয় ধমকাচ্ছিলেন। অমলবাবুকে দেখে বললেনঃ ডাক্তার, এসো। কি মনে করে?

—একটু কাজে।

—তুমি যে অকাজে আসবে না, জানি। তোমার পুরিয়াতে আমার ব্যথাটা কমেছে। ব'সো, বলো কি সংবাদ?

এ-কথা সে-কথার পর আসল কথাটি পাড়েন অমলবাবু। সব শুনে গুম হয়ে রইলেন অঘোরবাবু। রূপোর থালায় পান ছিল। গোটাকয়েক পান মুখে দিয়ে উঠে গেলেন ঘর থেকে। ফিরে এলেন মিনিটখানেক পরে। চেয়ারে বসে বললেনঃ অনেকগুলো টাকা—শোধ করতে পারবে তো! আমার কাছে বাড়ী বাঁধা রাখাটা এমন কিছু নয়। নিজে কতবড় একটা বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছ ভেবে দেখেছ?

ভেবে দেখা তখন শেষ হয়েছে অমলবাবুর। স্মিত হাসেন তিনি। অঘোর দত্তের হাতদুটি নিজের মুঠোতে নিয়ে বলেনঃ এটুকু আপনার করতেই হবে। আমার বড় বিপদ।

পরদিন অঘোর দত্তের কর্মচারী এলো অমলবাবুর কাছে। পাকা লোক অবিনাশ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে বাড়ীটার সবকিছু। দু'কলম কালির আঁচড় টেনে রেজিস্ট্রি দলিল হাতবদল হল। মর্টগেজ রইল বাড়ী।

দু'পকেটে গাদা গাদা নোট পুরে নিচু হয়ে অমলবাবুকে প্রণাম করতে যথেষ্ট অসুবিধে হয়েছিল রেবতীবাবুর। কয়েক মাসের মধ্যেই আবার বাড়ী ছাড়িয়ে এনে তিনি অমলবাবুকে প্রণাম করতে আসবেন, এ কথা জোর গলায় জানিয়ে গেলেন।

বছর ঘুরে এলো। কয়েক কিস্তি টাকা জমা দিয়ে অমলবাবু আর পেরে উঠলেন না। অঘোর দত্ত দেহ রাখলেন। তিলজলায় রেবতীবাবুর বাড়ী উঠল। সেই অফিসেই উচ্চপদে আজ তিনি বহাল আছেন। আর নিচু হতে হতে অমলবাবুর মাথা আজ পায়ের কাছে এসে ঠেকেছে। নিজের ছেলেমেয়েদের কাছে আজ তিনি অপরাধী। লুকিয়ে লুকিয়ে থাকেন। ছেলে দুটি এখনও ছোট। বাবার পড়ন্ত হাতদুটি শীঘ্রই ধরে তোলবার ভরসা নেই।

পারিবারিক এই দুর্যোগের দিনে অমলবাবুর মেয়ে মীরা একটি চাকরি জুটিয়ে দিতে বলে আমাকে। চাকরি মেলেনি, তবে মোটরগাড়ীর কারবারী মহেন্দ্র সিং-এর মেয়েকে বাংলা শেখানোর ভার পড়ল মীরার ওপর। যোগাযোগটা আমার মাধ্যমেই হল।

মীরা মেয়েটি ভয়ানক বেশী চুপচাপ। অতিশয় মৌন। মীরার মুখের আদলখানি গড়তে গিয়ে বিধাতা কিছুটা বেহিসেবী হয়েছেন। পক্ষপাতিত্ব করেছেন কিছু।

দিন কিন্তু বসে থাকে না। অপুত্রক অঘোর দত্তের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন ভাগিনেয় অনিল মিত্তির। প্রবল বিক্রমে নিজের মতো করে জুৎ হয়ে বসতে চান তিনি। অঘোর দত্তের আমলের সামান্য ঢিলেঢালা ফাঁস গেরো কষে বাঁধতে চাইলেন।

অমলবাবুর বেয়াড়া কাগজখানা হাতে পেয়ে ক্ষেপে উঠলেন তিনি। অবিলম্বেই আইনের দরজায় আরজি পেশ করেন। কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি সে মামলায়। জজের কাছে কথা দিয়ে এলেন অমলবাবু, একমাসের মধ্যে তিনি বাড়ী ছেড়ে দেবেন।

এমন সময় মীরার নতুন খবর আমার কানে এলো। সমুদ্রের মৌনতা ভেঙে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে। প্রেমে পড়ে মীরার কী হাল হয়েছে দেখবার কৌতূহল হল। মীরা দেখলাম কিছুমাত্র লুকোতে চাইল না। স্বীকার করল সব অকপটে।

মহেন্দ্র সিং-এর ছেলে সরমুখ্-কে সে ভালবাসে। তবে সরমুখ্ নিজের পায়ে ভালো করে না দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাদের। বেশ কিছু দেরি হলেও ওদের সবুর সইবে।

চেনা মুখ

মহেন্দ্র সিং-এর মুখেই আমি খবর পেয়েছিলাম, বোনের সঙ্গে সরমুখও বাংলা শিখছে মীরার কাছে। সপ্তাহে তিন দিনের জায়গায় রোজ যেতে হচ্ছে। রোববারও বাদ যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ নাকি পড়তে হবে সরমুখ-কে।

আরও আমার কানে এসেছে, সরমুখ মীরাকে বাড়ী পৌঁছে দেয়। পথে বাংলা-পাঠ হয়তো হয় না, কিন্তু হৃদয়ের ময়দানে এতটা লুকোচুরি যে শেষ হয়েছে ভাবিনি।

মীরাকে বলি: আমাকেও একটা ভাষা-টাষা রপ্ত করতে হবে দেখছি। তামিল-তেলেগু ভাষাতেও আমার আপত্তি নেই।

দায়িত্বহীন সহজ কথা। চা খেয়েই উঠতে যাচ্ছিলাম। জানালায় এক অপরিচিত মুখ চোখে পড়ল: ডাক্তারবাবু আছেন নাকি?

আগন্তুককে মীরা ভিতরে আহ্বান জানায়: ফিরতে কিছু দেরি হবে বাবার। আপনি অপেক্ষা করবেন কি?

ভদ্রলোকের দোহারা গড়ন। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। সুন্দর পরিপাটি বাঙালী পোশাক। আভিজাত্যের ছাপ। হেসে বললেন: হাতে একটু কাজ আছে; সেটি সেরে আমি এই পথেই ফিরব। আর একবার বিরক্ত করব আপনাদের।

মাথা হেলিয়ে দেখি পুরোনো এক মিনার্ভা-গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

মীরার মুখেই খবর পেলাম, দু'দিন ধরে অমলবাবুর খোঁজে ঘুরছেন ভদ্রলোক। অতিশয় অমায়িক। বাড়ী ছেড়ে দেবার পর কোথায় উঠবেন অমলবাবু, এইসব প্রশ্নও করেছেন।

এই আমি প্রথম দেখলাম অনিল মিত্তিরকে।

অমলবাবুর সঙ্গে অনিল মিত্তিরের দেখা করতে আসবার কারণ ছিল। কত তারিখ নাগাদ তিনি বাড়ী ছাড়বেন এ প্রশ্ন করতে অবশ্য তিনি আসেননি। অমলবাবুর বাড়ীটাকে গুঁড়ো করে ফেলে সেখানে একটি ম্যানসন তোলা সম্ভব কিনা, তার সরজমিন তদন্তে এসেছিলেন।

এসেছিলেন এই মনোভাব নিয়ে যে, সামান্য দু'চার কথার মধ্যে বাড়ীর জায়গার ঢংটুকু দেখে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠবেন। অমলবাবু আরও

কিছু সময় চাইলে কী উত্তর দিতে হবে সেটুকুও মনে মনে ঠিক করেই এসেছিলেন।

অনিল মিত্তির দেখা পেলেন মীরার। বাড়ীতে সে ছিল একা। বসতে হল। কথাও বলতে হল কিছু সেই সঙ্গে। পরে আবার আসবেন বলে উঠে পড়েন অনিল মিত্তির। পরদিন আবার এসেছেন। আমার সঙ্গে দেখা সেই সন্ধ্যেতেই।

সোনার কারবারী হয়েও একেবারে স্যাকরা বনে যাননি অনিল মিত্তির। নকল আর আসল মুক্তোর ফারাক চেনেন তিনি। দু'রাত্রি ঘুম হয়নি তাঁর। সব-কিছু উল্টেপাল্টে গেছে যেন। এমনটি তাঁর আর কখনো চোখে পড়েনি। মীরার কথা তাঁকে পেয়ে বসল।

অনিল মিত্তিরের পরিচয় পেয়ে অমলবাবু কিছুটা সরু হয়ে গেলেন। বাড়ীটা তিনি কত তারিখ নাগাদ ছেড়ে দিতে পারবেন তাই মনে মনে ভাবছিলেন।

সাদা একটি গরম জামা অমলবাবুর চেয়ারের হাতলে রেখে ফিরে যাবার পথে থমকে দাঁড়াল মীরা। অনিল মিত্তিরের গলা শুনতে পেল : আমার উকিল আপনার সঙ্গে অনেক অভদ্র ব্যবহার করেছে আমি জানি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, ডাক্তারবাবু।

অতি সহজ বাংলাভাষা। তবু যেন অমলবাবু বুঝতে পারেন না। বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকেন। ফুরফুরে মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলেন : আপনার উকিল আমায় কিছু বলে থাকলে হয়তো ঠিকই বলেছেন। এই সামান্য কারণে আপনি এসেছেন আমার বাড়ী! সামান্য লোক আমি, আপনাকে কোথায় যে বসাই!

—দেখুন ডাক্তারবাবু, মকদ্দমা জেতবার আমার বড় শখ। তবে আপনার সঙ্গে এই মামলায় জিতে কিছুমাত্র আনন্দ পাইনি। প্রথম থেকেই আপনি আমার সব কথা এমনভাবে মেনে নিতে শুরু করলেন, সেই বিনয়টুকু আমি মনে করেছিলাম দম্ভ। অন্যায় হয়েছে আমার, আমাকে ক্ষমা করবেন।

অতি সাধারণ লোক অমলবাবু। বিদ্যেবুদ্ধিও অসাধারণ নয়। অনিল মিত্তিরের কথায় মুগ্ধ হলেন।

আর বেশী কথা নয়। অনিল মিত্তির চলে আসেন অমলবাবুর বাড়ী ছেড়ে।

কয়েকদিন পর এক পত্র এল। দু'লাইনের চিঠি। অনিল মিত্তিরের।
—'আজ সন্ধ্যেতে দয়া করে আসবেন আপনি আমার বাড়ীতে ?'

দীর্ঘদিন পর যেন খুশী হন অমলবাবু। অঘোর দত্তের পরিবারের কৌলীন্য নিয়ে অনেক কথা বললেন। অনিল মিত্তির আর যাই হন, অঘোর দত্তের সম্মান যে অক্ষুণ্ণ রাখবেন তাতে আর সন্দেহ রইল না।

বৌবাজারের বাড়ীতে সন্ধ্যেতে এসে পৌছলেন অমলবাবু। দোতলার পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অবিনাশ।

কিছুটা অবাক হন অমলবাবু অবিনাশের ব্যবহারে। কোর্টে ও বাড়ীতে এই লোকটাকে তিনি যে পরিমাণ অভদ্র হতে দেখেছেন, আজ তার সহজ হাসি ও হাত কচলানোর মধ্যে তাঁর পরিচিত অবিনাশকে কোথাও খুঁজে পেলেন না।

কাজ-করা কাঠের পয়ার ওপর শ্বেতপাথরের টেবিল। সিঁড়ির পাশে সামনে ঝুঁকেপড়া শ্বেতপাথরের নগ্ন নারীমূর্তি। ঘরগুলো যেন ঘর নয়—হল্! বারান্দা যেন চাতাল। মাথার ওপর বহু পুরাতন বহু-মুখওলা ঝাড়লণ্ঠন। তারই কোথাও কোথাও ইলেকট্রিক বাল্‌ব গোজা। সিঁড়ির দেওয়ালে বাঘের গায়ে পা রেখে বন্দুক হাতে অঘোর দত্তের ছবি। যৌবনে অঘোর দত্তের গোঁফ ছিল।

অনিল মিত্তিরের সঙ্গে দেখা হল না। সাক্ষাৎ মিললো এক বৃদ্ধার। ইনি অঘোর দত্তের স্ত্রী।

কিছুটা দূরে বসে, মাথায় ঘোমটা টেনে মুখ পিছনে করে বললেন তিনি: খোকন বড় ছেলেমানুষ, তাই অপরকে নাকাল করে আনন্দ পায়। আপসোস করে শেষে। আমার স্বামী আপনাকে টাকা দিয়েছিলেন। আপনার টাকা ধার নেবার কারণও আমার জানা আছে। খোকন আপনাকে যদি অসম্মান করে থাকে, আপনি তাকে ক্ষমা করুন! আপনার সামনে আসতে তাই তার লজ্জা। আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে পাগল ছেলে তাই পালিয়েছে। আমাকে বলে গেছে, আপনার বাড়ীতে তার কোনো অধিকার নেই, আপনার বাড়ী আপনারই থাকবে। বড় নরম মন খোকনের—সে কষ্ট পাচ্ছে। খুবই ছেলে-

মানুষ। বিয়ে একটা দিয়েছিলাম। মাস তিনেকের মধ্যে বউটি চলে গেল। সতীলক্ষ্মী ছিল সে। দমকা কি-এক জ্বর হল, চিকিৎসাও করাতে পারলাম না। আমার ঘর শূন্য। সব থাকতেও কিছু নেই। আপনার ছেলে-মেয়ে ক'টি?

অনেক কথা। বহু সংবাদের আদান-প্রদান। রুপোর থালায় ফল এলো। সেইসঙ্গে মিষ্টি। রুপোর গেলাসে এলো সরবৎ।

অবিনাশ গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল অমলবাবুকে। করজোড়ে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বিদায় নিল সে।

সে-রাত্রেও ঘুম আসেনি অমলবাবুর। এলোমেলো নানা চিন্তার খেই পাননি। এটাও সত্যি, ওটাও সত্যি। তবে মিথ্যে কোন্‌টা?

পরদিন সকালে অবশ্য সত্য-মিথ্যা ধরা পড়ল। যেটুকু অসঙ্গতি অমলবাবুকে ভাবিয়ে তুলেছিল সেটুকু সহজ হয়ে এল। বুঝতে পারলেন সব।

অবিনাশ এল সকালবেলা। দু'চার কথার পর জানাল, একটি বিশেষ সংবাদ নিয়ে এসেছে সে। অঘোর দত্তের স্ত্রী তাকে পাঠিয়েছেন। আমতা-আমতা করে বললে : দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনার মেয়ের সঙ্গে খোকাবাবুর বিয়ের প্রস্তাব ক'রে রাণীমা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার মতামত আমাকে পৌঁছে দিতে হবে।

সামান্যরকমও প্রস্তুত ছিলেন না অমলবাবু। অবিনাশের কাছে তাই কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়েন। চোখ তুলতে পারেন না। ভাবতে থাকেন আকাশ-পাতাল।

এ ঘরে বিয়ে হলে মীরা রাণী হবে। সুখের শেষ থাকবে না অমলবাবুর। তা ছাড়া এরূপ একটি সৎপাত্র যে সারা কলকাতায় মেলা ভার তাতে সামান্য-রকম সংশয় ছিল না অবিনাশের। এত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও বাবুয়ানি কাকে বলে খোকাবাবুর নাকি জানা নেই। যে পরিমাণ মেয়ের বাবা হত্যা দিয়ে পড়ে থাকেন সকাল-সন্ধ্যা, তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

অমলবাবু এসব কোনো কথাই শুনছিলেন না। গলা এসেছিল শুকিয়ে। নানা কথায়, বহু চিন্তায় বিভ্রান্ত অমলবাবু শুধু ঠোঁটে হাসি টেনে বলেছিলেন—আমাকে সময় দিতে হবে। ভেবে দেখতে হবে আমাকে। বাড়ীর মতটাও জানা দরকার।

চেনা মুখ

সময় শুধু অমলবাবুই নিলেন না। মীরাও দু'দিন সময় চাইলে।

মীরার মনের কথা শুধু আমি কেন, এক অন্তর্যামী ছাড়া হয়তো কেউ জানেন না। শাড়ির আঁচলে বা বালিশে নীরব অশ্রুর সে-স্বাক্ষর অন্ধকারেই র'য়ে গেছে। কারও চোখে পড়েনি।

বড় নীরব মেয়ে মীরা। মৌনতা ওকে ঘিরে থাকে। শিশুবয়সেও তার নাকি চেঁচিয়ে কান্না শোনেনি কেউ। তার সামান্য রাংতা বা পেনসিলের টুকরো অন্য কেউ দাবি ক'রে বসলে জোর করত না সে। বাদ-প্রতিবাদ ঠিক তার ধাতে নেই। দরজার পাশে নিজেকে আড়াল করে নীরবে অশ্রুপাত করেছে মীরা।

প্রথমে সরমুখকে কোনো কথাই জানাতে পারেনি সে। চোখের পাতা উঠেছিল ভিজে। কণ্ঠ হয়েছিল অবরুদ্ধ। ঠোঁট-দুটো থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। দুলে উঠেছিল সারা প্রাণমন।

মীরার সঙ্গে সরমুখের সম্পর্কটি অমলবাবুর জানা ছিল না। কী নিদারুণ এক অন্তর্দ্বন্দ্বে যে সে তছনছ হয়ে যাচ্ছে; এ সংবাদ অনেকের কাছেই ছিল অজ্ঞাত। যুক্তিতর্ক নিজেকেই খতিয়ে দেখতে হয়েছিল। সরমুখ আর অনিল মিত্তিরকে পাশে রেখে পছন্দ-অপছন্দের ধাঁধাঁয় পড়েনি সে মোটেই। মানদণ্ডের বিচার ফুরিয়েছে। ব্যক্তির স্থান দখল আজ বস্তুতে।

তাই নিজের জীবনে চূড়ান্ত মৃত্যু টেনে, অতি আপনার নিকটের সবাইকে বাঁচানোর পথটাই মীরাকে বেছে নিতে হল। মীরা কিছুটা স্বতন্ত্র। অসাধারণ নয় কণামাত্র।

সরমুখ ছিল পুরুষ মানুষ। পৌরুষ ছিল তার চরিত্রে। তবু সেই এক সন্ধ্যেতে সে শিশুর মতো অবুঝ হয়ে উঠল। মীরার সব কথা সে মন দিয়ে শুনেছে। নিরুপায় মীরা বোঝাতে চেষ্টা করেছে। তবু দু'হাতের মধ্যে মীরার উষ্ণ মুখটিকে কাছে টেনে বলেছে—কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকব মীরা? এ হয় না, এ হতে পারে না! আমি তোমাকে যেতে দেব না। তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচব না।

সে-রাত্রে নিজেকে সামলানোই মীরার পক্ষে কঠিন। সরমুখের ব্যাকুল যুক্তিগুলো শুনতে শুনতে মীরার সব সঙ্কল্পগুলো বার বার ঝড়ের মুখে খড়-

কুটোর মতোই উড়ে যেতে চাইল। তবু বিচলিত হল না মীরা। সরমুখকে বোঝাতেই হবে তাকে। অন্তত এখানে কোনো জোড়াতালি দিয়ে চলে যেতে পারবে না সে।

অবশেষে সরমুখকে মীরার কথাই বুঝতে হল। মীরাকে সরমুখ ভালবেসেছে। সেই ভালবাসাই আজ তাকে দূরে চলে যাওয়ার শক্তি দিল।

মীরাকে সান্ত্বনা দেয় শেষেঃ তুমি মর্যাদা পাবে, প্রতিষ্ঠা পাবে। সুখী করতে পারবে কতজনকে তুমি। যদি সার্থক হও তাহলেই খুশী থাকব আমি।

অদ্ভুত নীরব হাসে সরমুখ। যেন এক নিঃসঙ্গ ঊষর মরুভূমি বেয়াড়া বাতাসে গা ভাসিয়ে হা-হা করে উঠল।

সোরগোল উঠে এল কঠিন নীরবতার মধ্যে থেকে। অমলবাবু আমাকে বলেন—তুমি কাজের মানুষ জানি। কিন্তু আমার তো কেউ নেই। শুভকাজে তুমি আমার পাশে থেকো।

বিনা স্বার্থে নড়বার লোক আমি নই। অমলবাবুকে খুশী করার মতো জায়গা নেই আমার নোট-বইতে। তবু কেন জানিনে, সেদিন ফেলতে পারিনি তাঁর কথা। আজ ভাবি, ফেলতে পারলেই ভালো করতাম।

বৌবাজারে অনিল মিত্তিরের বাড়ীতে আমাকে কারণে অকারণে ছুটতে হল। এ-কথা সে-কথা পৌঁছতে ফোন করতে হল যখন তখন। তবে স্বার্থ কিছু ছিল বইকি। বেগার খাটবার লোক আমি? দেহের অ্যাপেনডিক্সের মতো মনের সেন্টিমেণ্টকে কোন্ দিন ছেঁটে ফেলেছি। গলা টিপে মেরেছি সেটাকে। অনিল মিত্তিরকে আমার পাত্র বলে যেটুকু মনে হল, মক্কেল হিসেবে দেখলাম তাকে অনেক বেশী।

আমার কি পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি জানা নেই। হয়ত অতিভঙ্গী করে কিছু বলে থাকবেন অমলবাবু। সম্ভবতঃ সেইজন্যই খুব খাতির করতে শুরু করলেন আমাকে অনিল মিত্তির। বাংলার চেয়ে ভুল ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত অনিলবাবু। আমি না থাকলে নাকি পুরো কাজটা এত সুন্দর হতে পারতো না। এমন কথাও তিনি আমাকে বিয়ের পরে জানিয়েছিলেন।

চেনা মুখ

এমন বউ নাকি দত্ত-বাড়ীতে এর আগে আসেনি। বিয়ের রাতেই শুনতে পেলাম।

ছুতোনাতায় অবিনাশের হাত দিয়ে বহু অর্থ এ-বাড়ীতে খরচা হল। দু-বাড়ীর ভারসাম্য রাখতে গিয়ে কিছুটা বেসামালই হয়েছিলেন অনিল মিত্তির। একতাড়া নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন—আমার অনেক আত্মীয়স্বজন। কাল সকালে মেয়েরা থাকবে অনেক। শয্যা-তোলার এই টাকাটা পিসি-ভাইয়ের হাতে দিয়ে দেবেন। সবটাই তো বুঝতে পারছেন।

অদ্ভুত অর্থপূর্ণ হাসি। আমাকে বুঝতে হয়, এটাকে উনি জানেন প্রেষ্টিজ। আমার নয়। অনিল মিত্তিরের নয়। অমলবাবুর।

শুভকাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। ঘট দুলে উঠেছিল কিনা বা শুভদৃষ্টির সময় মীরার চোখের পাতা কি পরিমাণ অশ্রুসিক্ত হয়েছিল, সে সংবাদ আমার জানা নেই। তবে গভীর রাত্রে আমি যখন বাড়ী ফিরছিলাম, অমলবাবু গাড়ীর দরজায় হাত রেখে বলেছিলেন—সৌরীন, আমি ভুল করলাম না তো?

আমি প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছি। বলেছিলাম—অনেক রাত। কাল সকালে আবার হাঙ্গামা আছে। আপনি কিছু মুখে দিয়েছেন তো? কিছুটা বিশ্রাম দরকার আপনার।

বিপুল সমারোহ। প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাস সর্বত্র উপচে পড়ছে। সাবেকী ঢঙ-ঢাঙ অনেক বাদ পড়ল বটে, কিন্তু যেটুকু আমার চোখে পড়ল তাতেই আমাকে হতবাক্ হতে হল।

কোমরে যেন দাগ না পড়ে সেই কারণে ধুতির একদিকের পাড় ছিঁড়ে পরবার রীতি ছিল এই বাড়ীতে। গায়ের রঙ শঙ্খবরণ করবার জন্য দুধে আলতা ফেলে গড়াগড়ি দিতে হত মেয়েদের। হ্যামিলটনের বাড়ীর লাখটাকার আয়নায় ঘোড়ার মুখ দেখবার মতো মুখরোচক কাহিনী অবশ্য এ পরিবারের শুনিনি। তবে অঘোর দত্তের দুর্গাপূজায় নাকি ফাঁকি ছিল না। এই সেদিন পর্যন্তও ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী বাজতো নহবতখানায়। সেইসঙ্গে নর্মদা ও তাপ্তীর জলে হ'ত মায়ের অভিষেক।

সবুজ-মীনে-করা সোনার কলাপাতায় মীরাকে প্রথম দিন সন্দেশ ভেঙে মুখে দিতে হয়েছিল। এইরকম নাকি রেওয়াজ অঘোর দত্তের বাড়ীতে। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হয়েছিল ছাদ থেকে। রাতকে দিন করে ফেলা হয়েছিল বিজলীবাতিতে। মীরাকে বরণ করবার সময় অনিল মিত্তিরের জ্ঞাতি-খুড়িমার হাত বেঁকে গিয়েছিল। এতে তাতে ঠোকাঠুকি খেয়ে প্রদীপের শিখা দৈবাৎ ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লেগে যায় বরণডালায়। কপালের সামনের দু'চারগাছি চূর্ণ কুন্তল জ্বলে গিয়েছিল মীরার। নানা কথা উঠেছিল তাই নিয়ে। পাঁচ কান থেকে সাত কানে কানাকানি হল সে-কথা। কিন্তু সব কথাই চুপ করিয়ে দেন অনিলমিত্তির।'

তারপর এক নতুন অধ্যায়। উকিলের টাইপ-করা কাগজ আর বাড়ী-বিক্রীর রেজিষ্ট্রি-দলিলের সঙ্গে অনিল মিত্তির আরও নতুন কাগজ পৌঁছে দিলেন অমলবাবুকে।

অনিল মিত্তিরের সঙ্গে আমার মেশবার শুধু ইচ্ছে নয়—আগ্রহ। সতর্ক পা ফেলে এগুতে যাব, কিন্তু তিনিই হলেন বেহিসেবী। হামেশাই দেখা হ'ত। ফোন করতেন প্রায়ই। সময় পেলেই বৌবাজারের দোকানে হাজির হতাম। সুগন্ধি পাত্তির সঙ্গে পানও খেতাম দু'চার খিলি। আমার পরামর্শে বিরাট এক সেফটি-ভল্ট তৈরী করালেন। দু'চারটি কেস্ পেলাম অক্লেশে।

আমার মাতুল ছিলেন সম্পূর্ণ আমার বিপরীত চরিত্রের লোক। নরাণাং মাতুলক্রমঃ-তে যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে আমার হওয়া উচিত ছিল ভ্যাগাবণ্ড। আধুনিক অনিল মিত্তির অতি আধুনিকতার টাল সামলে-ছিলেন। অঘোর দত্তকে আমি দেখিনি। কি কায়দায় তিনি মরা সোনায় জেল্লা তুলতেন তা আমার জানা নেই। তবে তিনি যে পরিমাণ বিত্ত রেখে গেছেন তা থেকে লোকটিকে আন্দাজ করা চলে।

অল্পদিনেই বুঝতে পারি অনিল মিত্তির অঘোর দত্তের সুযোগ্য উত্তরা-ধিকারী। সামনে যদি বা না-এগুতে পারেন, পিছু হটবার ভয় নেই। পুরাতন শ্লোকের নজীর মিথ্যে হয়নি এখানে।

ওদিকে মীরাকে যেন বোবায় পেল। এমনিতেই সে চুপচাপ। এখানে সে হল স্তব্ধ। কাজও নেই, অকাজও নেই কিছু। শুধু 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই কাজ। এটা করতে নেই, ওটা করতে নেই, এখানে দাঁড়াতে নেই, ওখানে দাঁড়াতে নেই—এই ধরনের অনুশাসন তাকে অহরহ পীড়ন করেছে।

মীরাকে অঘোর দত্তের স্ত্রী কতটা পছন্দ করেছেন বলা কঠিন। তবে পাঁচ-জনের কাছে হামেশাই বলতে শোনা গেছে: গরীবের মেয়ে ঘরে এনেছি, এই শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে আর কি। মীরার হাবভাবে আরও কিছুটা বর্তে যাওয়ার ভাব থাকলে হয়তো তিনি খুশী হতেন।

অনিল মিত্তির কিছুটা তেড়া ধাতের ঝাঁঝালো ধরনের মানুষ। সেইসঙ্গে ছিল জিদ। হাটে-বাজারে পাঁচজনের কাছে অবশ্য সে চরিত্র শাসনে রাখতে তাঁকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। তাঁকে অমায়িক বলে জানতো বাইরেরই সকলে।

সম্পূর্ণভাবে মীরার কাছে প্রকাশ হতে তিনি অবশ্য চাননি। তাই বলেছেন: মীরা, মামীমা যা বলেন, শুনো। মঙ্গলের জন্যেই বলেন তিনি।

অনিল মিত্তিরকে বুঝে ফেলতে অবশ্য কষ্ট হয়না মীরার। মামীমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে অনিল মিত্তির যে নিজেকে আড়াল করতে চায় তা সে বুঝতে পারে। বেশ বুঝতে পারে সে যে নতুন পৃথিবীতে এসেছে, সে-দেশের সব-কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেবার প্রশ্ন অবান্তর। এখানে হার স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। যুক্তির কথা তোলা হবে বোকামি। ন্যায়শাস্ত্র এ-দেশে নিষিদ্ধ।

সন্তান-ধারণের যোগ্যতা থাকা ছাড়া আর কোনো যোগ্যতায় এ-বাড়ীর বউয়ের প্রয়োজন নেই। এই নীতিই চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। মীরা তার শিক্ষিত মন নিয়ে ক্ষত-বিক্ষতই হয়েছে অহরহ। তার কলেজী শিক্ষার স্বল্প পরিধিতে এখানকার একুশে আইনগুলোর স্বেচ্ছাচারী গতিবিধি বুঝতে চেষ্টা ক'রে নাজেহাল হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে শেষটায়।

অবশ্য নিজের ধ্যানধারণা অনুযায়ী মীরাকে খুশী-ই করতে চেয়েছেন অনিল মিত্তির। হামেশাই অমলবাবুর বাড়ীতে রেখে গেছেন। নিয়ে গেছেন এখানে ওখানে। বরং মীরার নির্লিপ্ততাই তাঁকে পীড়া দিয়েছে। অনিল মিত্তিরের ইচ্ছা মীরা তার পছন্দ-অপছন্দের কথা নিজে বলবে। শাড়ি-গয়নাতে

মীরার কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখে তিনি তাজ্জব বনে গিয়েছেন। এত স্বল্পে সন্তুষ্ট হবে সামান্য লোক। তাঁর স্ত্রীর কাছে তো শাড়ি-গহনার কোনোটাই যথেষ্ট মনে হওয়া উচিত নয়। মীরার আকাঙ্ক্ষা যদি গল্পের সুয়োরানীর মতো না হয়, তবে তাকে খুশী করবেন তিনি কি করে?

আমার সঙ্গে কি সূত্রে মীরার কথা উঠেছিল একদিন। বললেন: দেখুন সেন সাহেব, অল্পদিনেই আপনার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আপনাকে সত্যি আমার ভালো লাগে। বাড়ীর বৌয়ের নিন্দে আমি করতে চাইনে, তাতে গৌরব বাড়েনা জানি; তবে আপনার তো কিছু অজানা নেই—মীরা আমাকে বিয়ে করে খুশী হয়নি। হাবভাবে মনে হয়, আমি ফাঁকি দিয়ে অধিকার করেছি তাকে।

বললাম: কোথা থেকে কোথায় গেছে। কতবড় নড়চড় হল জীবনে। সময় কিছু লাগে বৈকি? আপনার সম্পর্কে তার তো খুবই উচ্চধারণা মনে হল। সেদিন তো বেশ হাসিখুশীই দেখলাম অমলবাবুর ওখানে।

অনিল মিত্তির হাতের কাছের গহনার ক্যাটালগের একটা পাতা ভাঁজ করছেন আর সোজা করছেন। সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই জবাব দিলেন: হ্যাঁ, ওখানে গেলে সে খুশীই হয়। ভালোই থাকে সেখানে। আচ্ছা মিঃ সেন, সেদিন এক শিখ ছোকরাকে দেখলাম মীরার বাবার বাড়ীতে। চেনেন আপনি?

প্রসঙ্গটি ভালো লাগেনি। তবু জবাব দিতে হয়। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলি: বিলক্ষণ! বড় ভালো ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। ওর বাপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। খুব গোঁড়া শিখ। মীরার কাছে এই ছোকরা যেন কিছুদিন বাংলা শিখেছিল।

অনিল মিত্তির জবাব দিলেন: হ্যাঁ, মীরাও তাই বলছিল। দেখুন, আমার বাড়ীর ঢঙ কিছুটা অন্যরকম। আধুনিকতা ভালো, তাই বলে মেয়েদের ধেই-ধেই করাতেই কি খুব বাহাদুরি আছে? আপনাকে আর কি বলবো; মীরা যে কিসে খুশী হবে বুঝি না। অনেকগুলো টাকা খরচ করে নতুন গাড়ী কিনলাম—ঐ হাড্‌সন—আপনি তো জানেন সব।

কিন্তু সামান্য কোনো প্রশ্ন করলে না মীরা—জানেন আপনি? যাই বলুন, মেয়েমানুষ এক অদ্ভুত চীজ।

স্বামী-স্ত্রীর জোড় মেলানো আমার কাজ নয়। তা ছাড়া ওসব আমার ধাতে সয় না। তবু মীরার সঙ্গে দেখা হলে দু'চার কথা বলবার ইচ্ছা রয়ে গেল।

ক'দিন পর ডাক্তার দত্তগুপ্তের এই নার্সিং-হোমে আমাকে আসতে হয়েছিল। দালাল মানুষ, তাই মানুষ-অমানুষ বিচার করিনে। ডাক্তার দত্তগুপ্ত যুদ্ধের সময় চাকরি নিয়ে বাইরে যান। বিদেশের সামরিক হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেশে ফিরে অল্পদিনেই কিভাবে এই নার্সিং-হোম গড়ে তুললেন, দামী দামী যন্ত্রপাতিতে ভরে তুললেন একতলাটা, সে তথ্য অনেকেরই অজ্ঞাত।

তবে আমি এটুকু জানি, দত্তগুপ্ত সহজ লোক নন। লোকে যখন চূড়ান্ত বিপদে প'ড়ে ছুটে আসে, ডাক্তার তখন তাদের আশ্রয় দেন। সে বিপদে প্রাণে মারা যাবার ভয় থাকে না, কিন্তু ইজ্জতের ক্যাশবাক্সে হাত পড়ে। রুগী আর ডাক্তার ছাড়া সে রোগের ইতিহাস সহসা কেউ জানতে পারেন না। রুগীর চেয়ে রোগিণীর সংখ্যা বেশী এখানে। বায়োলজির একতলার অস্থিরতা নিয়ে হামেশাই যে-সব অঘটন ঘটে থাকে, ডাক্তার দত্তগুপ্তের নিপুণতা সেখানে নাকি দুর্বার।

সুগঠিত দেহ। গায়ের রঙ শামলা। মুখশ্রী শ্রীহীন নয়।

দরকারী কথা শেষ করে উঠে আসছিলাম। ঠিক সেই সময়েই ফোন বাজল ঝন্‌-ঝনিয়ে। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ফোনে কথা বলেন ডাক্তার দত্তগুপ্ত: হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, আপনার রক্ত পেয়েছি। আর এক কোর্স পেনিসিলিন দেব। হ্যাঁ, সাবধানের মার নেই। আপনার কখন সময় হবে বলুন, আমি ইঞ্জেক্‌শানটা দিয়ে আসব।

ভেজানো দরজা ঠেলে ও-ঘরে গিয়ে বলতে শুনলাম ডাক্তারকে: অনিল মিত্তিরের ব্লাড-রিপোর্টটা কই? ডাক্তার সান্যাল বলছিলেন, সম্পূর্ণ নেগেটিভ হয়নি। দিন সেটা। পেনিসিলিন কয়েকটা আমার ব্যাগে পুরে দিন। আমাকে একটু বৌবাজারে যেতে হচ্ছে। এই যাব আর আসব।

মনে মনে ভাবি, অনিল মিত্তিরের রক্ত নিয়ে ডাক্তার দত্তগুপ্ত কি করছেন? তিনি কি খুঁজছেন রক্তে? এখানে তো লোকে শুধু কালো রক্তের চিকিৎসায় আসে জানি।

আমার কাজ শেষ হয়েছে। ঘড়ি দেখি। ছেড়ে চলে আসি নার্সিং-হোম। মনটা কিন্তু খচখচ করতে থাকে।

অমলবাবুর বাড়ীতে সরমুখকে অনিল মিত্তির দেখেছেন। সরমুখের সঙ্গে মীরাকে গল্প করতেও দেখেছেন একদিন। সরমুখের সব কথাতেই মীরার কি স্বাভাবিক হাসি। তার তুচ্ছ কথা শুনতে মীরার কত আগ্রহ। এ বাড়ীতে সরমুখের আসা-যাওয়া যে নেহাতই মীরার পরিচয়ের সূত্র ধরে এ কথা তাঁর জানা ছিল। অনিল মিত্তির এসব পছন্দ করেননি। একদিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, বাইরের লোকের সঙ্গে গাল পেতে মেয়েদের এত গল্প কিসের?

পরে এ নিয়ে মীরাকে কিছু কথা শুনতেও হয়েছিল। সবকিছু মেনে নিতেই চায় মীরা। তবু সরমুখ-প্রসঙ্গে কিছুটা অসুস্থ ইঙ্গিত ছিল অনিল মিত্তিরের কথায়। তাই প্রতিবাদ করেছিল মীরা।

ঠিক এই ঘটনার কয়েকদিন পর সরমুখের ভারত-সরকারে বৃত্তি পাওয়ার খবর আসে। অতি শীঘ্র রওনা হ'তে হবে তাকে। ইউরোপের কয়েকটা কারখানার কলকব্জা তৈরি হাতে-কলমে শিখে আসবে।

খবরটা প্রথমেই মীরাকে পৌছে দেবার ইচ্ছে হল সরমুখের। মীরা ভয়ানক বেশী খুশী হবে। তবু দ্বিধা তার হয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত ভেবেছিলও।

অনিল মিত্তির দুপুরের বিশ্রাম শেষ করে দোকানে চলেছেন। নেবেই গিয়েছিলেন নীচে, খেয়াল হল, গাড়ীর চাবিটা রেখে এসেছেন টেবিলের উপর। ফিরতে হল।

টেলিফোন একটানা বেজে চললেও মেয়েদের রিসিভার তুলবার নিয়ম নেই এ বাড়ীতে। ফোন ধরেছিল রাম। দীর্ঘ ত্রিশবছর এ বাড়ীতে তার চাকরি, কিন্তু কোনো বাইরের পুরুষ মানুষ বাড়ীর বৌ-ঝিকে ডেকে দিতে বলেনি কখনও। তাই কিছুটা সঙ্কোচ আর বিস্ময় ছিল তার কথায়।

চেনা মুখ

সরমুখের কথায় খুশীতে ভেঙে পড়েছিল মীরা। সিঁড়ির বাঁকের মুখে অনিল মিত্তির আটকে গেলেন। চুপচাপ শুনলেন সব। এত হেসে কথা কইতে, এত খুশী হতে মীরাকে দেখেননি কখনও।

সে-কথা অনিলবাবুর জানবার নয়, তাই চট করে ঘুরে নেবে এলেন নীচে। রাজমিস্ত্রীর কাজ হচ্ছিল সেখানে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখলেন কিছুক্ষণ। মাথার রক্ত উঠে গিয়েছিল। কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে আবার যখন উপরে এলেন দেখলেন মীরা তখন আলতা পরছে সরলার কাছে। জলচৌকির ওপর বসে পা মেলে দিয়ে হাসিমুখে বসে আছে মীরা গালে হাত রেখে। একপলক দেখলেন অনিল মিত্তির। যেন নতুন করে দেখছেন তাকে। তারপর চাবিটা নিয়ে আবার নেবে এলেন। বেরিয়ে গেলেন বাড়ী থেকে।

এখানে ওখানে এ-পথে ও-পথে ঘুরলেন কিছুক্ষণ। দোকানে এলেন দেরি করে। বিনা কারণে ছুতোনাতায় একে ওকে ধমকালেন। অবিনাশকে বললেন ঃ স্কাউণ্ড্রেল।

সেই রাত্রে বাড়ী ফিরে কি-সব কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নতুন গাড়ীর একটা ভালো ড্রাইভারের জন্য বিজ্ঞাপন লিখলেন কাগজে দেবার জন্য। লিখবার সময় ভাবলেন, 'সোফার' বানানটা ঠিক আছে তো ? সন্দেহের নিরসন করতে 'চেম্বার্স' টেনে নিলেন।

বইয়ের ভাঁজ খুলতেই শক্ত একটা খাম গলে এলো। ছড়িয়ে পড়ল নানা সাইজের কতকগুলো ছবি। এখানে এভাবে ছবিগুলি থাকবার কথা নয়। ক'দিন আগে মীরার ভাই লাল্টু মীরার ক'খানি বই, উল বোনবার ছোট-বড় কাঁটা আর সেই সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতে এই ছবিগুলি রেখে গিয়েছিল।

অতি সাধারণ ছবি। শিবপুর বাগানের। অনেকগুলো ছবিতে কয়েকটা অপরিচিত মুখের মধ্যে অনিল মিত্তির মীরা আর সরমুখকেই শুধু চিনলেন। একটা ছবিতে এসে চোখ কিন্তু আটকে গেল।

গাড়ীতে বসে স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে সরমুখ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে বাইরে। মীরার নাকটা টিপে ধরেছে দু'আঙুলে, আর দুজনেই খুব হাসছে।

অভিধানে 'সোফার' বানান আর দেখা হয়নি সে-রাত্রে। বিজ্ঞাপন লেখা শেষ হল না অনিল মিত্তিরের।

এই সময়ে অনিল মিত্তিরের সুপারিশে একটা মোটা কেস্ এসেছে। কিছু সন্দেশ আর ফুল পাঠিয়ে দিয়ে ফোনে ধন্যবাদ দিতে গেলাম। আমার মতো সামান্য লোক প্রতিদানে তাঁর মতো লোককে কিছুই দিতে সাহস হয় না—এইসব কথা বলছিলাম। অপর প্রান্ত থেকে ক'বার শুধু 'অ, অ, তাই নাকি' ভেসে এল। তারপর হাতলটা নামিয়ে রাখবার আওয়াজ পেলাম। এটাকে আমি মনে করেছিলাম যান্ত্রিক কোনো গোলযোগ।

দু'দিন পর অমলবাবু সিঁড়ি দিয়ে নাবতে গিয়ে পা ভাঙলেন। বিপদে আপদে আমাকে ওঁদের মনে পড়ে। গেলাম। অমলবাবু বললেন: তোমার তো হাতের কাছেই ফোন, অনিলের দোকানে খবরটা দিয়ো। অবশ্য এমন কোনো দরকার নেই, তবে মীরা যদি একবার পারে যেন আসে।

ফোনে সংবাদটা জানাতে নরম গলায় জবাব পেলাম অনিল মিত্তিরের: নিশ্চয়ই মীরাকে আমি পাঠিয়ে দেব। আপনি এত ফুল আর সন্দেশ পাঠিয়েছেন দেখলাম। একবার আসবেন সময় করে। আপনার পাঠানো জুঁইফুল পেয়ে মীরা খুব খুশী হয়েছে।

পরদিন মীরা এল অমলবাবুর বাড়ী। সেদিন ছিল রবিবার। পাশের ময়দানে বিনা-পয়সার সিনেমা-প্রদর্শনী। বাড়ীর সবাই দেখতে গেছে। মীরা ছিল বাড়ীতে আর পা ভেঙে পড়ে ছিলেন অমলবাবু।

সন্ধ্যে নাগাদ সরমুখ এসে হাজির। মীরা তখন ঘরে। দুজনে ছিল মুখোমুখী। তবে নিভৃত বিশ্রম্ভালাপে নয়। বিলেত গিয়ে আমার হবে কি?—এইরকম প্রশ্ন করছিল সরমুখ মীরাকে। সেখানকার কলকারখানায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবার তার ইচ্ছে নেই। লোকে যেটাকে জীবনের উন্নতি বা উৎকর্ষের সোপান হিসেবে জানে, আজ সেই পথে সে পা বাড়াতে মোটেই 'ময়্যাল সাপোর্ট' পাচ্ছে না মন থেকে।

মীরা ভয় পেল। শান্ত করতে চাইল সরমুখকে।

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। মীরার মুখের ওপর কি একটা যেন উড়ে এসে পড়ল। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল মীরা। মাথার চুলের সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে পাখনা দুটো কাঁপতে থাকে থরথর করে। হাত দিয়ে ছাড়াতে গিয়ে মীরা পা হড়্কে পড়ল গিয়ে একেবারে সরমুখের ওপর।

মীরার মাথা থেকে দু'আঙুলে ছাড়িয়ে নিয়ে সরমুখ ছাখে সেটা আর কিছু নয়—প্রজাপতি। হাসি পায় সরমুখের। মীরাও ম্লান হাসে। জানালায় বসিয়ে দিতেই একেঁবেঁকে সেটা উড়ে গেল বাইরে।

মীরার মাথার চুলের একপ্রান্ত সরমুখের শার্টের বোতামের সঙ্গে গিয়েছিল জট পাকিয়ে। সাদা শার্টের বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে মীরার মাথার সিঁদুরের ছাপ চওড়া হয়ে লেগে গেল।

আর সেই মুহূর্তে এসে হাজির হ'লেন অনিল মিত্তির। বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলেন।

সরমুখ ঝুঁকে পড়ে মীরার চুল ছাড়াল, তারপর হাসতে-হাসতে চেয়ারে গিয়ে বসল। মীরার মাথার সিঁদুর সরমুখের বুকের ওপর যে রক্তিম স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছিল, সেটুকু বড় বেশী চোখে পড়ল অনিল মিত্তিরের। বাড়ীতে ঢোকা হল না। নিঃশব্দে অন্ধকারে তিনি নেবে গেলেন।

সরমুখ চলে যায়। তারপর আকাশ-পাতাল ভাবে মীরা। সরমুখ দূরে চলে যাবে, হয়ত তাতে ভালোই হবে। নিজের দ্বৈত জীবন নিয়ে বেহিসেবী হবার ভয় থাকবে না। সুখী হবার চেষ্টা করে হয়তো সুখী হতে পারবে কোনদিন। ফাঁকগুলো উঠবে হয়তো ভরাট হয়ে।

আবার সেদিনই বেশ কিছু রাত করেই এলেন অনিল মিত্তির। মীরা বলে: এত রাত করে এলে? আমি ভেবে ভেবে সারা—আজই ফিরব মনে করেছিলাম—তুমি আমাকে নিয়ে চলো।

তেড়া স্বভাবের ঝাঁঝালো ধরনের মানুষ অনিল মিত্তির নিজেকে সংযত করলেন অনেক কষ্টে। সন্ধ্যের সেই বিচ্ছিন্ন দৃশ্যটি কিছুতেই তিনি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছেন না। শুধু ভাবেন, অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁকেও করতে হবে অভিনয়।

মীরা বলেঃ কি ভাবছ তুমি? আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে যেতে ভয়ানক ইচ্ছে করছে। এখানে আমার ভালো লাগছে না। আমার কিছু করবারও নেই এখানে।

যে বিষ দলা পাকিয়ে উঠেছিল অনিল মিত্তিরের কণ্ঠে, ঠোঁটের হাসির সঙ্গে সেটা আবার গলাধঃকরণ করলেন তিনি। ঠোঁটে হাসি টেনে বলেনঃ বুড়ো বাপের পা ভেঙেছে, কোথায় তুমি এখানে থাকতে চাইবে, না, আমার সঙ্গে যাবার জন্য অবুঝ হয়ে উঠেছ। শোনো, পরশু সকালে চলে এসো। গাড়ী পাঠিয়ে দেব আমি। মুরারির বিয়েতে দুপুরেই আমাদের যেতে হবে বসিরহাট। রাত হয়েছে, আমি এখন গেলাম। দু'দিন ভালো হয়ে থেকো, মন খারাপ কোরো না।

তবু মীরা বুঝতে চায়নি। শানের উপর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে সলজ্জ হেসে বলেছেঃ একটু মিষ্টি কিন্তু মুখে দিয়ে যাও। বাবা অসন্তুষ্ট হবেন। একটু বোসো, আমি এখনই আসছি।

মিষ্টি কিন্তু মুখে দেননি অনিল মিত্তির। ভয়ই পেয়েছিলেন তিনি। অতি সহজ মীরার ব্যবহার তাঁর মনে আরও সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। গোপনে অর্ধেক সন্দেশ ভেঙে নিয়ে যত্নে সেটি পকেটে পুরেছিলেন। পরদিন সকালে সেই সন্দেশ ডাঃ দত্তগুপ্তের লেবরেটরিতে পৌঁছে গেল। ছানা আর চিনির সঙ্গে অন্য কোনো-কিছুর গুঁড়ো অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে ধরা পড়ে কিনা তার পরীক্ষায় লেগে গিয়েছিলেন ডাঃ দত্তগুপ্ত নিজেই। মীরার অনিল মিত্তিরকে বিষে নীলিয়ে দেবার ইচ্ছে হওয়া বিচিত্র কি?

মীরা ফিরে এল শ্বশুরবাড়ী। বিয়েবাড়ীতে কি কাপড়-গহনা মীরা পরবে তাই নিয়ে হুলুস্থূল করলেন অনিল মিত্তির। সাদা বেনারসী যদি বা ঠিক হল, কিন্তু গহনা বাছতে হিমসিম খেয়ে গেলেন দুজনে। অনিল মিত্তির শেষে বললেনঃ তোমার যা খুশী পরো। যেভাবে ইচ্ছা সাজাও তোমাকে। তবে আমিও তোমার সঙ্গে থাকব, একেবারে যেন নিষ্প্রভ না হয়ে যাই।

বেশ ভালোই লাগছে আজ মীরার। নিজের মনেও কোনো একটা মীমাংসায় পৌঁছেছে সে। স্বামীকে বিশ্বাস করতে ভালো লাগছে তার। স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে আজ আর বাধছে না মীরার।

আন্তরিক আনন্দের সঙ্গেই সে সায় দিল অনিল মিত্তিরের সমস্ত ছেলে-মানুষিতে। হীরে-চুনী-পান্নার গহনাগুলোও ভালবেসেই পরল। অনিল মিত্তির নিজে হাতে জুঁইফুলের মালা জড়িয়ে দিলেন মীরার খোঁপাতে। কণ্ঠে তুলে দিলেন বহুমূল্য নেকলেশ। এমনিতেই মীরা ছিল অপূর্ব। সেজেগুজে সে যেন হল তুলনাহীন। অনিল মিত্তিরের পোশাকও হয়েছিল দেখবার মতো।

নিমন্ত্রণ শেষ করে ফিরতে কিছু দেরিই হয়েছিল সে-রাত্রে।

পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আকাশে। দুরন্ত গতি নিয়ে অনিল মিত্তির যশোর রোড ধরে কলকাতার পথে ফিরে আসছিলেন। মীরার খোঁপার জুঁইফুলের গন্ধে জ্যোৎস্নায় ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস ছিল ভরপুর। ক্লান্ত দেহ। রাত গভীর। মীরা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল। অনিল মিত্তিরের ঠোঁটে ছিল জ্বলন্ত সিগারেট। দু'হাতের মধ্যে স্টীয়ারিং হুইল।

এক বাঁকের মুখে বিপজ্জনক এক ব্রেক কষতে হল। পথ জুড়ে ছিল দূরের হাট থেকে ফেরা গোরুর গাড়ীর সারি। পাশেও ছিল দুজন লোক। মাথায় তাদের বোঝা।

গাড়ীটা লাফিয়ে উঠল, সেই সঙ্গে যান্ত্রিক আর্তনাদ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। দিগ্‌দিগন্তে তার রেশ কেঁপে-কেঁপে মিলিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। গীয়ারের ঘাট বদ্‌লে-বদ্‌লে অনিল মিত্তির আবার বাতাসের আগে গাড়ী নিয়ে চলেন। হঠাৎ নজরে পড়ল। চোখ পড়ল অনিল মিত্তিরের। মীরার মুখ যেন কোল বেয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে নাড়া দেন—দেহটা যেন ঝুঁকে পড়ল আরও। রুখে দেন গাড়ী। বোতাম টিপে আলো জ্বালেন। হিম-ঠাণ্ডা দেহ। মনে হল যেন মীরার দেহে প্রাণ নেই।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো গাড়ী ছুটিয়ে চলেন তারপর। মীরাকে ডাঃ দত্তগুপ্তের নার্সিং-হোমে নিয়ে এলেন সোজা।

ডাঃ দত্তগুপ্ত বলেন : মীরা মারা গেছে অনেকক্ষণ। ঘুমন্ত অবস্থায় দেহ ছিল আলগা। মারাত্মক ব্রেকের ধাক্কায় ঘাড়ের শলাটি মট্ করে ভেঙে গেছে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে। বাইরে কোন প্রকাশ না

থাকলেও, মাথার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়েছে। সচরাচর চোখে না পড়লেও দু'একটি এরকম কেস্ তাঁর জানা আছে।

পরদিন ভোরবেলা ফোনে খবর পেয়ে ছুটে গেলাম। সাদা বেনারসীতে জড়ানো মীরাকে দেখে শিউরে উঠেছিলাম। আধো-ঘুম, আধো-জাগরণে আছে যেন মীরা। ঠোঁটে যেন তখনও লেগে আছে স্মিতহাসির সঙ্গে প্রশ্ন : আপনাকে এতদিন দেখিনি কেন সৌরীনদা? বাসী জুঁইফুল খোঁপায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। সিঁথির তাজা সিঁদুর কিছুমাত্র ম্লান হয়নি।

লাল কম্বলে মীরার দেহটি ঢেকে দিয়ে নার্স চলে গেল। কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়লাম।

সম্পূর্ণ ঘটনাটিই সাজানো এ অভিযোগ উঠেছিল। একটা গভীর ষড়যন্ত্র যে সব-কিছুর ওপর যবনিকা টেনে দিল এরূপ মন্তব্য আজও আমার কানে আসে। আমি নিজে এসব নিয়ে হৈচৈ করিনি। মীরা নেই, সত্যমিথ্যে যাচাই করব কিসের তাগিদে?

অনিল মিত্তিরের টাকার সামনে আজ যে-কোনো সত্য অসত্য হতে কতক্ষণ? তবু অন্য কারও সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমার বলতে ইচ্ছা করে না : ঘাড়ের শলা ভাঙলেই হল···ভূতের কাছে মামদো-বাজী······যশোর রোড থেকে ডাক্তার দত্তগুপ্তের নার্সিং-হোমের মধ্যে আর কি কোনো ডাক্তার ছিল না?

তবে নিজের কাছেই অতি সাধারণ প্রশ্নের জবাব আমি খুঁজে পাইনি। টুকরো-টুকরো ঘটনাগুলো একত্র করলে গোটা জিনিসটাই মনে হয় কেমন অস্পষ্ট।

মীরার ঘাড়ের শলাটা মট্ করে ভেঙে যাওয়াটা আদৌ সম্ভব কিনা সে বিচার করিতে বসা আজ অর্থহীন। তবু প্রশ্ন মনে জাগে : মীরার দেহটা মর্গে দেওয়া হল না কেন? মীরার সুন্দর দেহ কাটাকুটি করলে আমারও অবশ্য খারাপ লাগত। কিন্তু পুলিশ-অফিসার ডাঃ দত্তগুপ্তের সব কথাই খুশী হয়ে মেনে নিলেন কেন? সরমুখকে পুলিশ কি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তার বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যায়? মীরার দেহটি আগুনে না

তোলা পর্যন্ত সে বৈঠক শেষ হল না কেন? গাড়ীর মধ্যে থেকে নাকি একটা শোলার ছিপি পাওয়া গিয়েছিল? তীব্র এক গন্ধ নাকি ছিল তাতে? তার তো কোনো কিনারাই হয়নি! প্রশ্ন কেন ওঠেনি সে সব কথার?

রাঁচি গেছেন কখনও? কাঁকেতে? সেখানে দৈবাৎ এক শিখ যুবকের সঙ্গে দেখা হওয়া বিচিত্র নয়। পরনে স্যুট। নিখুঁত বাঁধা টাই। সুদর্শন এই যুবককে আপনি ডাক্তার বা ট্যুরিস্ট বলে ভুল করতে পারেন। আপনাকে দেখতেই পাবেনা সে হয়তো। অথবা জলন্ধরের দেশের গল্প বলবে। হকিখেলার গল্পে তন্ময় হয়ে যাবে। সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হবেন আপনি। আবার একদম জানান না দিয়ে ফেটে পড়বে হয়তো আপনার ওপরেই। অসংলগ্ন একটানা নানা কথা বলে যাবে। পাথরের নুড়ি হাতে তুলে জোরে কামড়াতে থাকবে। তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে সে আর কেউ নয়—সরমুখ। মীরার নাম ধরে একটা রিক্ত কণ্ঠ যদি ফেটে পড়ে সাদা দেয়ালে বা সাজানো বাগানের আনাচে কানাচে তবে ভয় পাবেন না।

এক্স-রে রুমে ডাক পড়ল অনিল মিত্তিরের। বিদায় নিয়ে উঠে পড়ি। পথে নেবে আসি তারপর।

অনিল মিত্তিরের পুরোনো পাপ খুঁচিয়ে তুলে হয়তো আজ তাকে পাগল করে দেওয়া যায়। বিশ্বাসও করি, সে কালসাপ আমিই জাগিয়ে তুলতে পারব। আমার যেটুকু ঝাড়ফুঁক জানা আছে তাতে ছুবলে দিলেও ধাক্কা সামলানো যাবে। কিন্তু কেন যেন উৎসাহ পাই না। সব-কিছু যেন অবান্তর হয়ে গেছে আজ। হাড্‌সন্ গাড়ী চুর করে এনেছেন, তবু প্রাণে বেঁচে গেছেন এ-যাত্রায়। তবে মুঠো-মুঠো সোনা ছিটিয়ে নিজের যে বিষাক্ত অপরাধ ঢেকেছেন নিপুণ হাতে, আগামী কোন একদিন সে-বিষে নিজেই তিনি নীলিয়ে উঠবেন। মীরার খোঁপার জুঁইফুলের গন্ধ সুযোগ পেলেই পাগল করে দেবে অনিলমিত্তিরকে।

গাড়ীর 'ক্লেম' সম্পর্কে আমার হাত হয়ত কিছুমাত্র বক্রগতি নেবে না, কিন্তু গাড়ী আর আমি ইন্‌সিওর করব না অনিল মিত্তিরের।

বাড়ীতে পা দিয়ে সামনেই দেখি সোমনাথ। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও আমি যে জীবনে কিছুই করলাম না, সে ধারণা সোমনাথ শুধু মনে মনেই পোষণ করে না, যেখানে সেখানে বলেও বেড়ায়। সে প্রসঙ্গকে আমি অবশ্য আপ্রাণ ধামাচাপা দেবার চেষ্টাই করে থাকি।

সোমনাথ আজ যশস্বী অধ্যাপক। দীর্ঘ একহারা গড়ন। পরণে ধুতি, লংক্লথের পাঞ্জাবী, আর পায়ে স্যাণ্ডাল। হাতে পাইপ।

সোমনাথের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। প্রাচুর্য থাকা সত্বেও অতি সাধারণ জীবন যাপন করে গেল। গাড়ী সে চড়ে বটে, তবে ট্রামে-বাসে তাকে হামেশাই দেখা যায়। আমি যে পরিমাণ পেট্রোলের বিল মেটাই, বইয়ের পেছনে সোমনাথ তার চেয়ে কিছুমাত্র কম খরচ করে বলে মনে হয় না। পুরোনো বই খুঁজে বেড়ায় কলেজ স্ট্রীটে। কোনো প্রিয় ছাত্রের সঙ্গে পথে দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। মনিব্যাগ আর ছাতা অনায়াসে সে খোয়াতে পারে।

সোমনাথের বাবা ছিলেন দুর্ধর্ষ ডাক্তার। রোগী মরবার কয়েক ঘণ্টা আগে ছাড়া তাঁর ডাক সাধারণতঃ আসত না। রোগী মারা গেলেও লোকে সান্ত্বনা খুঁজে পেত: যাক, ডাক্তার মিত্র তো দেখেছেন! বাবার ইচ্ছে ছিল সোমনাথ বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস পাস করে আসে। প্রয়োজনীয় খোঁজখবর তিনি যখন শেষ করেছেন, সোমনাথ তখন ডুবে ছিল ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরির বইয়ের গাদায়।

ডাঃ মিত্র আজ মৃত। আমি জানি, শেষদিন পর্যন্ত সোমনাথের খামখেয়ালির জন্য তিনি দুঃখ পোষণ করেছেন।

সোমনাথ আর আমার জীবনের গতিপথ শুধু ভিন্নমুখী নয়, বিপরীতধর্মী। কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক সোমনাথ। আমি সেখানে নিতান্ত এক ইন্সিওরেন্স এজেন্ট।

আমাকে দেখে সোমনাথ বললে: অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।

সোমনাথের পাশে বসে পড়ি।

সাধারণ দু'চার কথার পর সোমনাথ বলে : তোমার কাছে এসেছি একটু বিপদে পড়ে। কি যে করব আমি···

—কি হল আবার ?

কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল সোমনাথ। তারপর মাটিতে দৃষ্টি নামিয়ে বলে : আদিনাথ বড় বাড়াবাড়ি স্বরু করেছে ইদানীং। কোর্টে যাচ্ছে না, বাড়ীতে থাকছে না সারাদিন···! আদির ছেলের পোলিও, রুগ্ন ছেলেটাকে নিয়ে রিণির যে কি অবস্থা! তুমি যদি সেবাকে বলো···

কথা শেষ না করেই থামল সোমনাথ। পেতলের ছাইদানটা নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে কি যেন নিরীক্ষণ করে। তারপর আবার স্বরু করে : ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয় সৌরীন, দোষগুণ দেখে বিচার করার কথাও নয়। সেবাকেও আমি দোষ দিই না। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, নতুন একটা গাড়ী সেবা ইদানীং ব্যবহার করছে। শুনছি না কি সেটা আদিনাথেরই দেওয়া। দু'হাতে খরচা করছে আদিনাথ। একরকম নিজের হাতে মানুষ করেছি—বাবার বড় ইচ্ছে ছিল, আমি বিলেত গিয়ে মানুষ হই। তাই আদিনাথকে আমি বিলেতে পাঠিয়েছিলাম। সান্ত্বনা ছিল বাবার ইচ্ছেটা একভাবে পূর্ণ হল। আর আদিনাথও আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি। আমার চোখের ওপর চোখ তুলে কথা বলেনি কোনোদিন। কাল রাত্রে আমাকে···কি আর বলব তোমাকে···। আমি জানি, সেবা আমাকে দেখে নিতে চায়। কিন্তু আমি তো বহু আগেই হার স্বীকার করেছি সৌরীন! তুমি বুঝিয়ে বলবে সেবাকে ?

অসংলগ্ন কথা বলে গেল সোমনাথ। আমার অবশ্য কিছুটা জানা ছিল। কিন্তু এতদূরে যে গড়িয়েছে ভাবতে পারিনি। সোজা প্রস্তাব না করলেও এর আগে আভাসে ইঙ্গিতে সোমনাথ জানতে চেয়েছে, আমার কিছু করবার আছে কিনা।

—কিন্তু আমার কি করবার আছে, আমি কি করব সোমনাথ ?

সোমনাথ নিরুত্তর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে : আমি জানি তোমাকে ভয়ানক মানে সেবা। আমার মনে হয়, তোমার কথায় কাজ হবে।

গম্ভীর কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ সোমনাথের গলায়।

আমি বলি : অবশ্য তুমি যদি মনে কর, আমি বললে কোনো কাজ হবে, বলব। মীনাক্ষীকে বলব।

স্বল্প হাসি মুখে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে সোমনাথ।

আজ দেশের লোকের মীনাক্ষীতে পেয়েছে! সর্বত্র মীনাক্ষী আর মীনাক্ষী!

মীনাক্ষীর বাজার-দর আজ ক্যাশে ত্রিশহাজার, তারপর চেকে বাকি হাজার হাজার। ব্ল্যাক-মানি যদি না দেন তো দু'দফায় মোট পঞ্চাশহাজার। বহু কন্ট্রাক্ট। মরবার ফুরসুত নেই মীনাক্ষীর। তাই তার ইচ্ছেমতো শ্যুটিংয়ের দিন ফেলতে হয়। টালিগঞ্জে বিয়ে শেষ করে ধর্মতলায় লাল আলো দেখে থরথর করে না কেঁপে সোজা গাড়ী চালিয়ে দেয় সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুয়ের দিকে। একমুহূর্ত সময় নষ্ট করবার উপায় নেই। নতুন বইয়ের মহরতে তাকেই ক্ল্যাপ-স্টিক দিতে হবে দক্ষিণেশ্বরে।

মীনাক্ষীর সচিত্র জীবন-কাহিনী আজ হাটে-বাজারে সর্বত্র। খবরের কাগজের অন্ততঃ তিন চার জায়গায় তার ছবি চোখে পড়ে। তার নতুন ফ্যাশান দু'দিনে এলার্জির মতন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের মেয়েদের পোশাকে-আশাকে। সে ব্লাউজের গলা আছে তো হাতা নেই! হাতা আছে তো গলা নেই! হাতা বা গলা দুই-ই যেখানে থাকল সেখানে পেট-পিঠ বলে হয়তো কিছুই রইল না।

দেশ থেকে প্রথম যখন আমি সংসার কলকাতায় নিয়ে আসি তখন থাকতাম বলরাম বসু সেকেণ্ড লেনে। একতলা একটা জীর্ণ বাড়ীর অর্ধেকটা নিয়ে। তারই আর এক ফালিতে থাকত সেবা। তখন সে মীনাক্ষী হয়নি। সেবার বাবা এক কারখানায় কাজ করতেন খিদিরপুরে। এক ভাই কাজ করত রেলে। যুদ্ধে ছিল আর একজন।

সেদিনকার সেবাকে আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

আমাদের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তার মায়ের দেওয়া ফুল-বড়ি শুকোতে দিতে যেত সে ছাতে। আমার বোন অপির সঙ্গে ছিল বন্ধুত্ব। বাড়ীর আল্‌সেতে বসে তেঁতুলের আচার লুকিয়ে খেত দুজনে। সেবাকে আমি রসগোল্লা

চুষতে দেখেছি পথে। সেই মিষ্টিতেই অতিথি আপ্যায়ন করেছেন সেবার মা।

ছোট গলি থেকে বড় গলি, বড় গলি থেকে বড়রাস্তায় বাসা পালটেছি আমি। আজ এসে ঠেকেছি সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে। সেবার তবু আসা-যাওয়া ছিল আমাদের বাড়ী। অপির সঙ্গে বন্ধুত্ব তার অটুট।

বছর সাতেক আগে নিতু চৌধুরী যখন তার নতুন ছবির জন্য নতুন মুখ খুঁজছিল তখন সেবাকে নিয়ে তার বাড়ীতে হানা দিয়েছিলাম। নিতুর কাছেই সেবার প্রথম কাজ হল। সেবা—এই একান্ত নরম-সরম নামটা বাতিল করল তারা। রাতারাতি সেবা হল মীনাক্ষী। শুধু নামই নয়, মানুষটাও গেল বদলে। এমন বদলালো যে মীনাক্ষীর কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গুটোতে গুটোতে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল সেবা।

সাত বছরে মীনাক্ষী মোট ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা ছবিতে কাজ করেছে। অর্থ আর যশ আজ তার জীবনে দ্রুত লয়ে বেজে চলেছে। কি বই? কিসের বই? কার বই! এসব প্রশ্ন অবান্তর। শ্রেষ্ঠাংশে মীনাক্ষী—ব্যস। তিনটে, ছ'টা, ন'টা—জায়গা নেই। হাউস ফুল।

মীনাক্ষীর বিনয় কিন্তু যথেষ্ট। সত্যি কথাটুকু সে সিনেমার কাগজে বা সচিত্র জীবন-কাহিনীতে জোর গলায় প্রচার করে থাকে। তার সাফল্যের প্রথম সোপান আমি নিজে হাতে গড়ে দিয়েছিলাম, এ কথাটা বাড়িয়েই বলে মীনাক্ষী। সেই সঙ্গে অবশ্য আরও বলে, তার বাবা ছিলেন টাটার ইঞ্জিনীয়ার। প্রতিদান অবশ্য দিয়েছে সে। অনেক টাকার ইন্সিওর করেছে আমার কাছে। বহু মক্কেলকে আমার কাছে এনে ফেলেছে অতি সহজেই। চিত্র-প্রযোজক থেকে স্বরু করে পপুলার নায়ক-নায়িকা, মায় টালিগঞ্জের এক সাপ্লায়ার পর্যন্ত, কেউ বাদ যায়নি। কথাপ্রসঙ্গে আমাকে কয়েকবার ছবি-টবি সম্পর্কে ভাবতে ও বলেছে মীনাক্ষী। আমি যদি কোনোদিন বই-টই করি তাহলে সে নাকি আমার প্রথম ছবিতে কপর্দক না নিয়েই কাজ করবে।

আমি কিন্তু রাজী হইনি। বাংলাদেশের মেয়েদের নিয়ে স্বন্দর গল্প লেখা যায় সত্যি, কিন্তু আমার কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে ছবি তুলে দেশের মেয়েদের সেন্টিমেন্টের হাতে তার সাফল্যের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিতে ভয় পাই। সিনেমা-

ব্যবসায়ে অতি উৎসাহী পরিচিত দু'একজনকে দেখেছি—গাড়ী গেছে, বাড়ী গেছে। ধর্মতলার পথে পথে খালি পায়ে বাদাম ভাজা চিবোতেও দেখেছি একজনকে। মহাজনদের পন্থা ধরবার উৎসাহ পাইনি।

সোমনাথ চলে যাবার পরও বসে রইলাম কিছুক্ষণ। মীনাক্ষীর কাছে গিয়ে আমি কি বলব? কথাটা পাড়বই বা কেমন করে? সোমনাথ ভাবে, আমার কথায় কাজ হতে পারে কিন্তু আমি তো মোটেই ভরসা পাইনে। মীনাক্ষীর ভয় আছে কিনা বলা শক্ত। লজ্জিত হবে, সে কথাও বিশ্বাস হয় না। রামদাস পোদ্দারের বাড়ীতে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমায় আবিষ্কার করেছিলাম সেদিন। মীনাক্ষী পাবে আমায় লজ্জা? সোমনাথ খালি বই-ই পড়েছে, শেখেনি কিছুই।

তবে মীনাক্ষী আমাকে চেনে, এই যা ভরসা। পাঁচজনের সঙ্গে এক ঢঙের আদব-কায়দায় কথা বলে, আমার বেলায় তার ভিন্ন ব্যবহার। কথার ওপর হাত নেই, তাই মীনাক্ষীকে নিয়ে অনেক কথা, অনেক গুজবই বাজারে চালু আছে। তবু আমি জানি, মীনাক্ষীর মন নীচু নয়। ঘুরতে ঘুরতে এমন এক জায়গায় আজ এসে পৌঁছেছে যেখানে থামা অসম্ভব। সব-কিছুর সঙ্গে তাল রেখে চলতে আজ তাকে সামনে এগুতেই হবে অন্ধের মতো।

আদিনাথ সোমনাথের ভাই। অনেকদিন দেখছি তাকে। শুনেছি, সকাল-সন্ধ্যে মীনাক্ষীর ওখানে পড়ে থাকে। এরকম অনেকেই পড়ে থাকে। মীনাক্ষীর এ এক অদ্ভুত বিলাস।

মীনাক্ষীর বাড়ীতে আমি হামেশাই যাই। যাবার আগে তার হালের একখানি বই দেখে যাই এবং তার অভিনয়ের প্রশংসা করতে আমার কিছুমাত্র বাধে না। যে মন নিয়ে আমি কারখানার সাহেবকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করি, সেই মন নিয়েই আমি মীনাক্ষীর সঙ্গে হালকা গল্প করি!

পরদিন অবশ্য ছবি না দেখেই হাজির হলাম তার বাড়ীতে। বাইরের ঘরের বাঁশের আর পাটির কাজ এখনো শেষ হয়ে ওঠেনি। আলমোড়া থেকে এসেছেন থানু পিল্লাই মীনাক্ষীর ঘর সাজাতে। টোকিওতে ভারতীয় কুটীর-শিল্প পরিচালনার ভার পেয়েছিলেন ইনিই। একটা ঘরের পেছনে কী পরিমাণ অর্থ খরচ করছে মীনাক্ষী, দেখলে অবাক হতে হয়।

চেনা মুখ

ভেতরের ঘর জমজমাট। মীনাক্ষী বক্তা, সকলে হাঁ করে শুনছে তার কথা। সামান্য মুখ-চেনা হলেও, সবাই আমার প্রায় অপরিচিত। মীনাক্ষী আমাকে দেখে সোফা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হেসে বললে : বোসো।

সামনের এক ভদ্রলোককে ধমকাচ্ছিল মীনাক্ষী : সুহাসবাবুর সামান্য টাকা আপনি মিটিয়ে দিচ্ছেন না কেন? সে বেচারা সামান্য লোক···

—এ ব্যাপারে আপনি কেন···উনি বুঝি লাগিয়েছেন আপনার কাছে?

পুরো সিনারিও তো আমি তাঁকে দিয়ে আবার রিরাইট করিয়েছি আপনার কথা মত। না, না এ আপনি ঠিক করছেন না।

—আবার যদি পাল্টাতে হয়?

—আবার পাল্টাবেন। ভাবছেন কেন।

—আহা, টাকা তো দেবই···মানে, মানে···

—না, না কাল ফ্লোরে একগাদা লোকের সামনে কথা দিয়েছি আমি। অন্ততঃ আমার প্রেষ্টিজটা···

—আচ্ছা···

ভদ্রলোক আর কোনো কথা না বলে উঠে পড়লেন। মীনাক্ষী আমার দিকে স্মিত হাসলে। তার পর আর একজন পরিচালককে বললে : আপনার সঙ্গে, অমলবাবু, কিছু কথা আছে; আপনি অনেক বোঝেন, জানেন। আপনার কাছে আমি শিখতে পারি। কিন্তু এত বক-বক করলে অভিনয় করব কখন? এত 'ডায়লগ' থাকার তো কোনো দরকার নেই ছবিতে। আপনি পুরোটা একবার দেখুন, আমি এর আগেও আপনাকে বলেছি, লোকে নেবে না। আর যাত্রাগানের মতো খালি কথা বললেই কি অভিনয় হয়? তা ছাড়া অপারেশান-থিয়েটারে সার্জন যখন রেবার সাক্ষাৎ পেয়েছে, পরে রেবার খোঁজ করতে এসে জানলে হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেয়েছে, তখন সে সোজা শিলং যেতে যাবে কেন? হাসপাতালেই তো রেবার কলকাতার ঠিকানা পেতে পারে, অন্ততঃ খোঁজ পেতে পারে। আপনি বুঝছেন!··· আর আপনার 'ডায়লগ' একটু কমান।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ি। মীনাক্ষীর হাত খালি হতে দেরী হবে মনে হল। পর্দা সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যাই।

সত্যি ধন্যি মেয়ে মীনাক্ষী। গোটা সংসারের ভোলটাই শুধু বদলায়নি, লোকগুলোকেও যেন সেই সঙ্গে বদলে ফেলেছে।

মীনাক্ষীর বাবা দেখি পাইপের ফুটো পরিষ্কার করছেন। চেহারা ভরা-ভারা। বয়েস হয়েছে কিন্তু সুন্দর স্বাস্থ্য। কথাবার্তা, চালচলন ধীর সংযত। হাসিটুকু যেন নতুন। পরনে পা-জামার ওপর পাঞ্জাবি। মাথার নরম ক'গাছি চুল কাত করে আঁচড়ানো। হেসে বললেন: কেমন আছো? এসো, বোসো। চা না কফি দেবে তোমাকে? ভাস্কর···!—হাঁক ছাড়েন মীনাক্ষীর বাবা।

কথা বলার ঢঙটিও নিখুঁত আয়ত্ত করেছেন ভদ্রলোক। বেশীদিন আগের কথা নয়, এঁকেই আমি থলি থেকে পিছলে-যাওয়া শোলমাছ ধরতে নাস্তানাবুদ হতে দেখেছি রাস্তায়। হাতের ফুলুরী মাখামাখি হয়ে গেছে পথের ধুলোতে।

—শুনেছি আজকাল খুব উন্নতি করেছো।

—কার কাছে শুনলেন?

—আসে আসে, কানে আসে। সঞ্জয়কুমারকে চেন তুমি? বাঘা লোক, ইন্সিওরেন্সের একটা রাঘববোয়াল। গিরিডিতে ওঁর বাড়ীটা কিনেছি আমি। তাঁর কাছেই শুনলাম তোমার কথা।

—গিরিডিতে বাড়ী কিনলেন? ভালোই করলেন। শুনেছি জল ভালো।

—জল তো ভালোই বাবা, ইচ্ছে ছিল ক'দিন ঘুরে আসবো—তবে তৈরী বাড়ীর ঐ অসুবিধা—কমোড-সিস্টেম না থাকাতেই গোলমালটা বাধল কিনা। অবশ্য সঞ্জয়বাবু ওটা করিয়ে দেবেন বলেছেন। শীতটা একেবারে চলে গেল···আবার আমার একার ইচ্ছেয় তো আর হবে না।

—কমোড-সিস্টেম না হলে তো বিপদ।

—সেইজন্যই তো ভরসা পেলাম না।

চা এল। চায়ে চিনি নিলেন না ভদ্রলোক। প্রশ্ন করতেই বললেন: বড্ড ফ্যাট হয়ে যাচ্ছে, বড্ড ফ্যাট হয়ে যাচ্ছে—

অনেক কথাই বলেন মীনাক্ষীর বাবা। বেশ মজা লাগে শুনতে। ভাসতে-ভাসতে আজ এক নতুন পৃথিবীতে এসে উঠেছেন যেন!

ভাস্কর এসে জানালে, মীনাক্ষী আমাকে পাশের ঘরে ডাকছে। চা শেষ করে উঠে পড়ি।

চেনা মুখ

পাতলা পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে থতমত খেয়ে যাই। মীনাক্ষীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক দাড়িওয়ালা মুসলমান যুবক দু'হাতে মীনাক্ষীর কোমর জড়িয়ে সামনে টানছে। পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারি। লোকটা দর্জি। কোনো এক বিশেষ পোশাকের মাপ নিচ্ছে।

মীনাক্ষীর ঠোঁটের 'ছোড়ো জেরা', 'অউর জেরা'র সঙ্গে সঙ্গে হাতের ফিতে যেভাবে লম্বায় খাটো হচ্ছিল, তাত সেই কাল্পনিক ব্লাউজের গড়ন দিতে হাত কেটেকুটে ফেলবার চেয়ে নিজের বাঁ হাতের ফিতেতে ধরা আঙুলগুলো আর ওপরে তুলতেই বোধ হয় ভয় পাচ্ছিল দর্জিটা।

দর্জি চলে গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওঠ্-বোস করবার কায়দায় নিচু হয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুলে শাড়ীর কুঁচি টেনে নাবাতে-নাবাতে মীনাক্ষী বলেঃ আমার ইংরিজী শেখবার ব্যবস্থাটা করে দাও, সৌরীনদা। মানে ঘণ্টাখানেক আমার সঙ্গে বক্-বক্ করবে আর কি!

—বুঝেছি, হাসি দিয়ে আর ইংরিজী ঢাকতে চাও না।

—তুমি বেশ বলো; তোমার কাছে আর কি লুকোবো! সারা কলকাতায় তোমার তো হাজারো লোকের সঙ্গে খাতির। সাহেব-টায়েব একটা দেখে দাও না।

—কেন, সাহেব কেন? মেমসাহেব কি অপরাধ করল?

—খেপেছো তুমি? মেমসাহেব হাজার হলেও স্ত্রীলোক তো বটেই। ভয়ানক বেশী পার্সোনাল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। হিন্দী শিখতে গিয়ে সে-শিক্ষা আমি পেয়েছি। প্রথমদিনই প্রশ্ন করে বসবে, বিয়ে করেননি কেন? ঠাস করে এক চড় মারতে ইচ্ছে হয়।

খুব হাসিখুশী দেখাচ্ছে আজ মীনাক্ষীকে। মেজাজ খুব ভালোই মনে হচ্ছে। কিভাবে প্রসঙ্গটা তুলবো, কথাটা পাড়বো কি দিয়ে, মনে মনে তার খেই খুঁজছিলাম। একটু বেফাঁস প্রশ্ন করি। নিজের কানেই বাজে কথাটাঃ আচ্ছা সেবা, আমার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা বল তো?

নিতান্ত হালকা কথার মাঝখানে এরকম প্রশ্নের জন্য মীনাক্ষী প্রস্তুত ছিল না। শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। আমার মুখোমুখি সামনের

সোফায় বসে আমার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেঃ তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা?

—ঠিক তাই।

হাতের তালুর ওপর থুৎনি রেখে বললেঃ তুমি কি বলতে চাইছ সৌরীনদা?

—আমার সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার একটা ধারণা আছে?

—তোমার সম্পর্কে নতুন কি ধারণা করব আমি? তুমি অপির দাদা, আমাকে স্নেহ করো তাই আসো। তাছাড়া সব কথা তোমার সামনেই বা আমি বলব কেন? তুমি আমার জন্য যেটুকু করেছ সে-কথা আমি জীবনেও ভুলব না। সে ঋণ শোধ হবেনা, সৌরীনদা।

—প্রশ্নের জবাব পেলাম না।

—কি বলব তাহলে?

—আমি তোমার মঙ্গল চাই, তোমার সুনামে আমি আন্তরিক সুখী হই—এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়?

—হ্যাঁ।

—আমি তোমার কোনো ত্রুটি বা ভুলের কথা তুলতে পারি? তোমার খারাপ লাগবে না?

—স্বচ্ছন্দে! কিন্তু এসব কথা কেন বলছ সৌরীনদা?

—দ্যাখো, আমি আজ তোমাকে যে কথা বলব বলে এসেছি তাতে আমার কতটা অধিকার আছে জানি না, তাই ভয় পাচ্ছি। কিভাবে তুমি কথাটা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে আমার নিজের মনেই দ্বিধা আছে।

—আমি কি অন্যায় করেছি?

—ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয়। তুমি আদিনাথকে ছেড়ে দাও সেবা।

চোখ নামিয়ে নেয় মীনাক্ষী। অল্পক্ষণ পরে জবাব আসেঃ আমি তাকে ধ'রে রাখিনি।

—ধরে রাখনি ঠিকই, তবে আমি তোমাকে অনুরোধ করব আদিনাথকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে।

—এই কথা তুমি আজ বলতে এসেছ?

—হ্যাঁ সেবা, আমি এই কথাই বলতে এসেছি।

—আদিনাথ যদি আমার সঙ্গে মিশে আনন্দ পায়, আমার কোনো কাজ করে দিয়ে ধন্য হয়, আমি তাকে ফেরাব কেন?

—এইটুকুই সব হলে আমি এ অনুরোধ তোমাকে করতে আসতাম না। কিন্তু একটা সংসার চুরমার হয়ে যেতে বসেছে।

—আমার কি করবার আছে তাতে।

—আমি শুধু এইটুকু জানি—তোমার গাড়ী, বাড়ী, অর্থ ও যশ—সব ঐশ্বর্য্যের চেয়ে তুমি কিছুমাত্র ছোট নও; এ কথা আমি বিশ্বাস করি। সেই খাতিরেই এই অনুরোধ করতে আমি সাহস পাই। আদিনাথের বৌ আর তার রুগ্ন ছেলেটার কথা ভাবতে হবে। আদিনাথকে তুমি ভালবাসনা আমি জানি।

গলাটা হঠাৎ একটু উঁচু পর্দায় উঠে গেল সেবার: কিন্তু আদিনাথ আমাকে ভালবাসে, তাতে সোমনাথের এত লাগে কেন? সত্যিকথা বলব আমি? সোমনাথই পাঠিয়েছে তোমাকে। বল আমি ঠিক বলেছি কিনা?

—সোমনাথ তার বড ভাই···

—কিন্তু তোমাকে কেন? তিনি নিজে আসতে পারলেন না? 'সংসার' 'সংসার' করছ, তুমি আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছ? স্টুডিওর ফ্লোর যে আমার বাড়ীতে উঠে আসবে, আমিও তা ভাবিনি। এত অর্থ এত সুখ দিয়ে আমি কি করব?··· আমি খুব রঙচঙ ভালোবাসি, না? কী মর্যাদা দিয়েছে সোমনাথ আমাকে? আমার আজও মনে পড়ে সোমনাথের কথা: তুমি এত দ্রুত লয়ে বাজো সেবা, আমি তোমার সঙ্গে পেরে উঠবো না। এরকম নাটক আমি আজ ফ্লোরে করে থাকি। করুণ সুর টেনে ঝড়বৃষ্টি দেখিয়ে তাতে করে দর্শক আটকে রাখা যায় হয়তো, কিন্তু সত্যিকারের জীবন এর চেয়ে আর কি বিয়োগান্ত হতে পারে সৌরীনদা? সোমনাথ আমাকে ভাঙা নৌকোর মতো ফেলে চলে গেল। আজ আদিনাথ যদি সেই নৌকোয় এসে আশ্রয় চায় তবে তাকে ফেরাব কেন? সোমনাথেরই বা এত লাগবে কেন? তুমি জানো সব। আর কাউকে এসব কথা না বললেও তোমাকে সব কথাই বলতে পারি। ভাইয়ের প্রতি এত দরদ তার যদি থেকে থাকে, নিজে এলেই তো সে পারে।

—ছ্যাখো, কথাটা উঠেছে আদিনাথকে নিয়ে, সোমনাথের কথা থাক।

—আমি চাইনা তুমি এসব কথা নিয়ে এরকম অনুরোধ আমাকে করতে আসো সৌরীনদা। আমি কতটা বিব্রত হই তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু তোমাকে আমি অপ্রস্তুত দেখতে চাই না। প্রথমে তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ, তোমার প্রতি আমার কী ধারণা? কিন্তু আমার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? দুর্নাম এদেশে যে বাতাসের আগে ছোটে। তবে আমি জানি, আমি খুব খারাপ নই। যেটুকু সত্যি, তার পেছনে আমার খুব একটা হাত নেই। সত্যিকথা বলব? কিছু মনে কোরো না। আমাকে যারা 'সেবা' বলে জানে, তাদেরকে আমি আজ কেন যেন সহ্য করতে পারি না। ঐ নামটা থেকে থেকে কেমন যেন আমাকে বিদ্রূপ করে। গোলমাল করে দেয় সব। সোমনাথের চোখে আমি হয়েছিলাম ফার্স্ট-গার্ল। আরও কিছু বিশেষণ জুড়ে আজ তার কাছে হয়েছি ক্লাস-ওয়ান গ্ল্যামার-গার্ল। কিন্তু ভুল, মহা ভুল! সে ভুল করে হয়তো ঠকেনি, কিন্তু আমাকে সে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

এলোমেলো কথার মাঝখানে সেবার গলা উঁচু পর্দা থেকে নেমে এলো। পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আমি বুঝি সোমনাথের উপর সেবার কি দুরন্ত অভিমান। তারই প্রতিক্রিয়া আজ আদিনাথকে কেন্দ্র করে। অভিমান আজ এসে ঠেকেছে প্রতিহিংসায়। ক্ষোভ পৌঁছেছে বিক্ষোভে।

সিঁড়ি বেয়ে নামবার পথে সেবার গলা পেলাম: যাচ্ছো?

স্বাভাবিক গলায় জবাব দিই: রাত হয়েছে, কাল সকালেই আবার কাজ আছে। বেরুতে হবে।

ধরা গলা সেবার: এসো।

কয়েক দিন পর।

আমি নিয়মিত ডায়েরী লিখে থাকি। সারাদিনের লাভ-লোকসানের খতিয়ান মিলিয়ে দেখি।

চেনা মুখ

চিঠিপত্তর পেলাম কিছু। দেখেই বোঝা যায় কাজের চিঠি কম, অকাজের বোঝা-ই বেশী। একটা সবুজ খাম পেলাম। সবুজ কালিতে আমার নাম একটু কাত করে লেখা। খুলে দেখি মীনাক্ষীর চিঠি—

"সৌরীনদা,

আমি যদি ভুল করে অপরাধ কিছু করে থাকি, ক্ষমা করো। তুমি সেদিন রাত্রে চলে গেলে। তার পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে আমার বেয়ারা একটা সাদা স্লিপ নিয়ে এল। তাতে লেখা ছিল : সেবা, আমি সোমনাথ।

বেয়ারা ফিরে গেছে। মিথ্যে অজুহাতে আমি সোমনাথকে ফিরিয়ে দিয়েছি। সাজানো কথায় তার সাক্ষাৎ আমি এড়িয়েছি।

এইমাত্র আমি আদিনাথকে ফেরত দিয়ে এলাম। সবটা খুলে বলবার দরকার নেই। আমার ব্যবহারে আদিনাথ কতটা অবাক হয়েছে জানি না, তবে তার হাবভাবে আমি বিস্মিত হয়েছি বেশী। আদিনাথ খুব অসুখী হয়েছে বলে মনে হল না। বিধাতা সোমনাথকে যে ধাতুতে গড়েছেন, তাতে তারই একচেটিয়া অধিকার নয়। আদিনাথও তার ছিটে-ফোঁটা পেয়েছে বৈকি।

আমার গণনায় ভুল ছিল। তাই তোমার প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখি খাতায় অঙ্ক বসাতেই আমি ভুল করেছি। এটুকু খাতার পাতায় হলে ঘষে তুলে নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। নতুন সংখ্যা বসিয়ে সংশোধন চলে অক্লেশে। কিন্তু জীবন অঙ্কের খাতা নয়। আমার নিজের হাতের যুক্তির রবারটি কতটা সবল জানি না। তবে জোরে চাপ দিলে মনের খাতা ছিঁড়ে যাবার ভয় পাই।

আদিনাথ আমাকে কথা দিয়েছে, তার ছেলেকে নিয়ে জুরিখে চিকিৎসা করাতে যাবে। ভগবানের অশেষ কৃপা—সোমনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আদিনাথের প্রতি আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই, তুমি ঠিকই বলেছ। তবে একটা সংসার তছনছ হয়ে যেত, এ রকম আমার মনে হয় না। পনেরো বছরের বণ্ড দেওয়া কোনো অনুতপ্ত সৈনিকের কাছে বছর ঘোরবার আগেই ডিস্‌চার্জ-অর্ডার এলে তার যে অবস্থা হয়, আদিনাথকে যেন সেইরকমই দেখলাম।

তুমি ব্যস্ত লোক জানি। মরবার সময় আমারও নেই। কয়েকদিন পর হয়তো কিছুদিনের জন্যে আমাকে মাদ্রাজ যেতে হতে পারে। তার আগেই তুমি একবার এসো।

—সেবা"

সুন্দর টানা-টানা অক্ষরে লেখা চিঠি। খামে পুরে রাখি। সিগারেটে মুখাগ্নি করে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করি। অপর প্রান্ত থেকে কোনো সাড়া নেই। কানে আসে শুধু একটানা একটা যান্ত্রিক আর্তনাদ।

নামিয়ে রাখি রিসিভারটা।

সত্যি কাজের মানুষ আয়েঙ্গার সাহেব। সরকারী কর্মচারী বলতে যে একটা ঢিলাঢালা চারিত্রিক কাঠামোর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, এঁকে দেখলে সে কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। আমার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ডি.ও. লিখছেন কাউকে। দেরাদুনে ট্রাঙ্ক-কল বুক্ করছেন। তারই মধ্যে বই খুলে কোনো একটা গাছের বটানিক্যাল নামের বিদ্‌ঘুটে বানানটা দেখে নিলেন চট্ করে। বন আর জঙ্গলের প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছু যেন জানতে চান না। সব আলোচনাই অরণ্যকেন্দ্রিক।

ইতিমধ্যে আমি বহু কাজ এবং নানা ধান্ধার মধ্যেও দু'বার ঘুরে গেছি এখানে। দেখেছি, মরবার ফুরসৎ নেই ভদ্রলোকের। হোটেলের কামরাটাকে করে তুলছেন অফিস-ঘর।

কাজের ফাঁকে একনজর দেখে নিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসেন আর বলেন: কই স্যার, চুপচাপ হয়ে গেলেন যে? কিছু বলুন।

—সার্টেনলি আই অ্যাম্ ডিস্টার্বিং ইউ।

—কিছু না, কিছু না। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

সামনে এক প্রৌঢ় বাঙালীসাহেব 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থায় বসে আছেন। কথার সূত্র ধরে আয়েঙ্গার সুরু করেন: আরে বাবা, 'কুইক রেভিন্যু' 'কুইক রেভিন্যু' বলে চেঁচাচ্ছেন আপনারা, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ তো আপনাদের দেখতে হবে। রেভিন্যু চাইছেন—'ফায়ারউড প্ল্যানটেশন' আপনি করুন! ইউ ডু 'ক্যাসিয়া সাইমা' বিজ্‌নেস, ইভ্‌ন্ ইউ ক্যান ভেরি ওয়েল গো এহেড্ উইথ শিশ্যাল, আই ডোণ্ট মাইণ্ড। কিন্তু আরে বাবা, দিস ইজ নাইন্‌টিন ফিফ্‌টি এট্; পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটি যখন গলা টিপে ধরবে, কি উত্তর দেবেন তখন? নট্ ওন্‌লি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল—আজ রাজস্থানের মরুভূমি কাল দিল্লী ধাওয়া করবে। দিজ আর লেসেন্‌স্ অ্যাণ্ড ওয়ার্নিং! সয়েল কন্‌জার্ভেশান মাস্ট বি দি ক্রাই অফ আওয়ার ডিপার্টমেণ্ট। নাউ দি কোশ্চেন অফ স্পিসিস্…'স্যান্‌টালাম',

'টীক্' অ্যাণ্ড 'শাল' মাস্ট বি ট্রায়েড আউট। সেকেণ্ড-ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট কম টাকা দিচ্ছে না বাবা!

এক নজর দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলেন: কি মশাই, কিছু বুঝছেন টুঝছেন? বলি ইন্সিওরেন্স কেস করে কিছু হবেনা বাবা। চন্দন—চন্দন গাছ লাগাতে হবে।

বললাম: চন্দন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল? রাদার সারপ্রাইজিং।

—ডোণ্ট টক লাইক এ মিনিস্টার।—হাসিতে ফেটে পড়েন আয়েঙ্গার সাহেব।

সামনের ভদ্রলোকের প্রতি এবার একটু প্রসন্ন হন: সো মিঃ মিট্রা, উঠবেন তাহলে?

ভদ্রলোক যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে আয়েঙ্গার সাহেব বলেন: আপনি তাহলে রেলেভ্যাণ্ট ইনফর্মেশান আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। মোস্ট প্রবেবলি আই অ্যাম কামিং ডাউন এগেইন সাম টাইমস্ ইন এপ্রিল। আই.জি. আপনার 'লেটারেটিক এরিয়া'টা দেখতে চান।

—ইয়েস স্যার।

—রাইট দেন।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন ভদ্রলোককে। ফিরে এলেন হাসতে হাসতে। সামনের টেবিলে রাখা হাতঘড়িটা নিয়ে হাতে প'রতে প'রতে বলেন: দেখুন মিঃ সেন, বাঙ্গলায় একটা কথা আছে—'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। দেখলেন, চুপ করে ছিলেন ভদ্রলোক। গিয়ে কিন্তু করবেন ঠিক উল্টো। সব জানা হয়ে গেছে।

—'কুইক রেভিন্যু', 'কুইক রেভিন্যু'—চেয়ারে হেলান দিয়ে হো-হো করে হাসতে থাকেন আয়েঙ্গার সাহেব।

প্রসঙ্গটা আমি ঘোরাতে চাই: আছেন ক'দিন এখানে?

কথার যেন খেই খুঁজে পান আয়েঙ্গার: আমি শুধু শুধু আটকে রেখেছি আপনাকে অনেকক্ষণ। কাল সকালে আমার ছেলের ওখানে চলে যাব—বজবজ। এই সুযোগে আমার ছেলের ইন্সিওরটা আপনি করে দিন স্যার। কাল আপনার শনিবার, পরশু সন্ধ্যাতে আসুন না স্যার বজবজে।

আপনার অস্থবিধে হবে? ইফ ইউ সো ডিজায়ার, আমার ছেলেকে আপনার ওখানেও···

বাধা দিয়ে বলি : আমিই আপনার ওখানে যাবো।

—আপনার অস্থবিধা হবে না?

—রবিবার সন্ধ্যেতে আমার কোন অস্থবিধা নেই?

•

বাড়ী খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি আমাকে। আধ ডজন সেলাম কুড়িয়ে দোতলার দরজায় এসে পৌছই, বজবজে।

চওড়া করিডরের এক পাশ দিয়ে ফুলের টব। সারা বাড়ীটা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। একতলা থেকে যেরকম নির্দেশ পেয়েছি তাতে ঠিক দরজায় যে এসেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার উপস্থিত জানান দিই কেমন করে? দরজায় কোনো হাতল বা বৈদ্যুতিক বোতাম লটকানো না দেখে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াই। কি ভেবে সামান্য একটু চাপ দিতেই একমুখো পাল্লা খুলে গেল। ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল : কে?

দু'পা পিছিয়ে এলাম।

করিডরের এপাশে ওপাশে কেউ নেই কোথাও। কোথায় এলাম!

ঠিক এমনি সময় কাঠের সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পেলাম। ঝুঁকে দেখি এক শ্বেতাঙ্গ যুবক বাঁ পকেটে হাতঢুকিয়ে হেলতে দুলতে উপরে উঠছেন। সামনা-সামনি এলে, আয়েঙ্গারের দরজার খোঁজ করতেই সোনালী গোঁফে হেসে খোলা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন : ইয়া।

বুক ঠুকে ভেতরে পা চালিয়ে দেব কিনা ভাবছি, চোখ ফিরিয়ে এগুতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল।

—কাকে চাইছেন?

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা। পরনে পাতলা সাদা থান। ছোট-খাটো মানুষটি অল্প হেসে প্রশ্ন করেন।

কয়েক মুহূর্ত জবাব আমার ঠোঁটে এলো না। কি একটা বলতে গিয়ে বাধা পেলাম। কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে বললেন : আপনি মিঃ সেন?

—হ্যাঁ।

—আসুন, ভেতরে আসুন। আমার ভুল হয়নি, দেখেই চিনেছি তুমি বাঙালী। এসো, ভেতরে এসো।

ভেতরে এসে বসি। বড় ঘরটিতে আসবাবপত্রের বাহুল্য কম। চারপাশে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই আর ভাবি। বৃদ্ধা বাঙালী মহিলাটি আমাকে ভাবিয়ে তোলেন কিছুটা। খানিক দূরের একটা সোফায় এসে বসলেন উনি। দেয়ালের ঘড়ির দিকে দৃষ্টি রেখেই বললেন ঃ সেন তোমরা বদ্যি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেশ নিশ্চয়ই পুর্ববঙ্গে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরোনা বাবা।

—না না, মনে করবার কি আছে ?

—আমার দেশও পুর্ববঙ্গে—ময়মনসিং।

হেসে ফেলি আমি ঃ আমার মামার বাড়ী ছিল ওখানে।

খুশীর ঢেউ খেলে গেল ভদ্রমহিলার চোখেমুখে। বললেন ঃ তবে দেশবাড়ী তো আজ আর কিছু রইল না। এমনিতেই তো সারাজীবন বাইরে বাইরে কাটাতে হয়েছে। নিজের দেশের কথা ছেড়েই দিলাম, বাংলাদেশেই বা থাকলাম ক'দিন ?

বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে আয়েঙ্গারের সম্ভব অসম্ভব নানান কাল্পনিক সম্পর্ক গড়ছি মনে মনে। একটা কিছু খাড়া করে পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিতেও দেরি হচ্ছেনা মোটেই। অতিসাধারণ এই বৃদ্ধা কেমন যেন জট পাকিয়ে তুলেছেন সব।

মিনিট পনেরো পর আয়েঙ্গার সাহেব প্রায় একরকম দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। সামনের সোফাতে বসে পড়ে বলেন ঃ কি লজ্জার কথা! আপনি এসে বসে আছেন··· !

অল্পবয়সী একটি ছেলে এসে ঘরে ঢোকে। পুত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আয়েঙ্গার সাহেব। হাতজোড় করে নমস্কার জানালো। বাপের ঢঙের চেহারা। এই বয়সেই লোভনীয় চাকরিতে বহাল হয়েছে। বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছেলেটি পাশের ঘরে চলে গেল।

—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন ?

—কিছুক্ষণ। গল্প করছিলাম।

—গল্প ! আই সি, ছাট্ ওল্ড লেডী—মাই মাদার।

বিস্ময়োক্তি ঝরে পড়ে আমার ঠোঁট থেকে : মাদার !

স্থিরদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন আয়েঙ্গার সাহেব। স্বচ্ছ হেসে বলেন এগ্‌জাক্‌ট্‌লি সো। হাতের কাজটা সেরে নেওয়া যাক তাহলে ?

দাপুটে বাপের সঙ্গে জামার দোকানে গিয়ে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেমন গলাবন্ধ কোট কিনতে হয় বিনা প্রতিবাদে, আয়েঙ্গার সাহেবের ছেলেকে দেখে আমার সেই কথা মনে পড়ল। অবশ্য এক্ষেত্রে অনিচ্ছার চেয়ে ছিল কৌতূহলই বেশী। ছেলেটির কথাবার্তায় কিন্তু ইন্‌সিওরেন্সে আগ্রহ ছিল না কণামাত্র। উইথ-প্রফিট আর উইদাউট-প্রফিটের মধ্যে পার্থক্য কতটা ? দুটোর মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণ করা সুবিধাজনক, এইরকম প্রশ্ন তার।

প্রশ্নের জবাব দিলেন আয়েঙ্গার সাহেব। একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন : ইউ সুড নট্ বদার অ্যাবাউট ছাট, মিঃ সেন উইল ডু এভ্‌রিথিং ফর ইউ। ইউ সিম্প্‌লি সাইন দি প্রপোজাল। দেখুন মিঃ সেন, চিঠিপত্তর সব আমার ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। ইয়ং ল্যাড্‌স্ আর নট টু বি ট্রাস্টেড। ঠিকমতো টাকা জমা দেবে না, সব গোলমাল হয়ে যাবে।

প্রায় ফুটখানেক জায়গা লাগল পুরো নাম সই করতে। প্রপোজাল ফর্ম ব্যাগে ভ'রতে ভ'রতে বললাম : কাল সকালে ডাক্তার আমি পাঠিয়ে দেব। হাঙ্গামাটা শেষ করে ফেলাই ভালো।

আয়েঙ্গার সাহেব বলেন : বেশ কিছুদিন ধরে এই ইন্‌সিওরেন্সের কথাই ভাবছিলাম। যাক, আপনার দয়ায় এবার এটা সমাধা হল। আর এত কোম্পানি, এত এজেণ্ট—আমার তো কেমন গোলমাল হয়ে যায়। সেই আপনার বাঁশবনে ডোম কানার অবস্থা আর কি !

আয়েঙ্গার সাহেবের মুখে নির্ভুল বাংলা আমি শুনেছি। কথার ফাঁকে ছোট ছোট ছড়া আর টিপ্পনী নিখুঁত বলে যান।

দু'পাত্র কফি এল। একটা পাত্র হাতে তুলে নিয়ে বলি : আপনি এত ভালো বাংলা জানলেন কেমন করে ? বাংলাদেশে আপনি ছিলেন কখনো ?

হেসে ফেলেন আয়েঙ্গার সাহেব। বলেন: আপনাকে ভাবিয়ে তুলেছি দেখছি। দেখুন মিঃ সেন, বাঙলার পেছনে আমি ছুটিনি, বরং বাঙলাই আমার পিছু নিয়েছে। অ্যাক্সিডেণ্টালি আই অ্যাম এ ম্যাড্রাসি বাই বার্থ। আমার মায়ের সঙ্গে তো আপনার আলাপ হল। ও হো, আপনার সব মিক্স-আপ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছি। বাট দ্যাট্স্ এ ভেরি ওল্ড অ্যাণ্ড লঙ স্টোরি।

গলা থেকে টাইটা একটানে খুলে ফেলেন। সোফায় হেলান দিয়ে মিষ্টি হেসে বলেন: এভ্রি লাইফ ইজ ইন্টারেস্টিং, ইউ ক্যান হ্যাভ্ মাচ্ ড্রামা দেয়ার। ইট ওয়াজ ইন দি ইয়ার নাইন্টিন ইলেভ্ন্।

বলে চললেন আয়েঙ্গার সাহেব:

আয়েঙ্গার সাহেবের পিতা জন্মস্থান ভেলোর ছেড়ে সরকারী কাজে গিয়েছিলেন নিলাম্বুরে। মাসিক বেতন তেরো টাকা। বছরে দু'বার সরকারী খরচে খাকী পোশাক পেতেন। আর পেতেন পাগড়ী। জঙ্গলের কাজকর্মে কুলী খাটানো ছিল তাঁর কাজ। গৃহস্থের গরু চারাবাগানে ঢুকে সব যেন তছনছ করে না দেয় সে-দিকেও তাঁর দৃষ্টি রাখতে হত। ফরেস্টার আর রেঞ্জ-অফিসারকে সেলাম ঠুকে ঠুকে চাকরি-জীবনের প্রায় সায়াহ্নে এসে ঠেকেছেন।

জঙ্গলের একঘেয়ে জীবন। গোলপাতার ঘরে অন্য আর পাঁচজনের মতো আয়েঙ্গার সাহেবের শৈশবও অতিবাহিত হয়েছে। প্রাণধারণের জন্য পিতার দুঃসহ খাটুনির কথা আয়েঙ্গার সাহেবের অল্প অল্প মনে পড়ে।

কিছুমাত্র জানান না দিয়ে কালবৈশাখী যেমন কোথা থেকে ভেসে এসে সব তছনছ করে দিয়ে যায়, ঠিক তেমনি কখনো কখনো সবুজ ঘন জঙ্গলের মধ্যে কতগুলো প্রাণীর নীরব একঘেয়ে জীবন প্রচণ্ড একটা নাড়া খেয়ে যায়। এক বীট থেকে আর-এক বীটে সাইকেল চেপে ফরেস্টারবাবু খবর পৌঁছে বেড়ান—সাহেব ট্যুরে আসছেন জঙ্গল দেখতে। রেঞ্জ-অফিসার তাঁর দপ্তর ঠিক করতে আদাজল খেয়ে লেগে যান। খাকী পোশাক আর পেতলের বোতাম চক্‌চকে করবার তাগিদ পড়ে তখন। একহাঁটু ধুলো

সরিয়ে রেস্ট-হাউস ঝকঝকে করে তোলে কুলীরা। দুধ, ডিম আর মুরগী মুহূর্তে জোগাড় হয়ে যায়।

সেবার যেন কিছু বাড়াবাড়ি হল। রেঞ্জ-অফিসার সবাইকে ডেকে বললেন: দাপুটে সাহেব, সামান্য একটু বেতালা হলে একেবারে সাপের মাথায় পা পড়বে। কুলী-কাপাটির মতো জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে শুনেছি বড় কড়া ধাতের সাহেব। মুখে চটাচটি বড় করেন না, কিন্তু হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে গিয়ে এক কলমে দিনকে রাত করে দেন।

নিলাম্বুর ডিভিসন সাহেবের কাছে নতুন। চার্জ নিয়ে প্রথম জঙ্গল দেখতে আসছেন এ অঞ্চলে। সবার চোখে মুখে তাই কৌতূহলের চেয়ে ভয়ের মাত্রাই বেশী।

নতুন সাহেব অশোক মুখার্জি এলেন। একা নয়—সঙ্গে এলেন স্ত্রী।

রেঞ্জ-অফিসার নিজেই একটু বেশী বেসামাল হন। তার আগের মনিব ছিলেন খাঁটি ইংরেজ। সাহেবের গরম জল, হুইস্কির বোতল আর ডিনার-টেবিলে মুরগী ঠিকমতো জোগান দিতেই তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। খাতাপত্তর দেখার বালাই ছিল না সে সময়ে। বন্দুক আর ক্যামেরা সঙ্গে করে মেমসাহেব বগলে নিয়ে সাহেব শুধু সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। বিকেলে রেস্ট-হাউসে ফিরে রেঞ্জ-অফিসারকে সকালে মাছ ধরবার সব ব্যবস্থা পাকা করে রাখতে বলতেন।

তাই নতুন সাহেব সবাইকে একটু বিব্রত করে তোলেন। একেবারে জানান না দিয়ে রেঞ্জ-অফিসারের 'পনি' দেখতে চাইলেন। যদিও দীর্ঘ পাঁচবছর সরকারের কাছ থেকে 'পনি অ্যালাউন্স' আদায় করে যাচ্ছেন রেঞ্জ-অফিসার, কিন্তু পনি কেন, সামান্য একটি চতুষ্পদ জীবকেও সারাদিনের মধ্যে জোগাড় করা গেল না।

করজোড়ে রেঞ্জ-অফিসার পরদিন সকালে এসে জানালেন, তাঁর 'পনি' দড়ি ছিঁড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

একটু হাসলেন মুখার্জি সাহেব। অর্থপূর্ণ হাসি। একটা চারাগাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন: এটা কি?

কয়েক মুহূর্ত চারাগাছটা নাড়াচাড়া করলেন। পেটে আসছে কিন্তু মুখে আসছে না এইরকম ভঙ্গীতে কপালে আঙুল ঠুকে চিন্তা করতে লাগলেন।

ঠিক এই সময়েই জবাব এলো পেছন থেকে : টেরোকার্পাস মারসুপিয়াম্।

ঘুরে দাঁড়ালেন মুখার্জি সাহেব। বৃদ্ধ গার্ড আয়েঙ্গার সেলাম ঠুকে এগিয়ে এলো। সামান্য এক গার্ডের কাছে এরকম নির্ভুল জবাব আশা করেননি মুখার্জি সাহেব। দু'একটা কথা বললেন আয়েঙ্গারের সঙ্গে। তারপর ফিরে তাকালেন রেঞ্জ-অফিসারের দিকে। একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন : সামান্য একজন গার্ড যে গাছ চেনে তুমি তার কোনো হদিশ রাখো না? তোমাকে রেঞ্জ-অফিসার করেছেন কে? এইভাবে কাজ করবে মনে করেছো?

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত রেঞ্জ-অফিসারের খাতাপত্তর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। নিজের নোট-বইতে কিছু নোট করলেন। খাতা-পত্তরে যে-ধরণের মন্তব্য লিখলেন সেগুলো পাঁচজনের কাছে খুব হেঁকে বলবার মতো নয়। রেস্ট-হাউসে ফেরবার পথে রেঞ্জ-অফিসারকে বললেন : নতুন প্ল্যাণ্টেশান দেখতে যাবো। রাস্তাঘাট ভালো? কত দূর হবে?

বিস্মিত হলেন রেঞ্জার। বললেন : পথ খুব ভালো নয়। অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়, কিন্তু 'নাইট হল্ট্' করবার মতো জায়গা নেই সেখানে।

—কেন? একটা ইন্‌স্পেক্‌শন-বাংলো আছে শুনেছি।

—আজ্ঞে, সেখানে কি আপনি থাকতে পারবেন? মেমসাহেবের বড় অসুবিধে হবে।

—তা হোক।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়েন মুখার্জি সাহেব। সঙ্গে স্ত্রী। মুখার্জি সাহেব রেঞ্জ-অফিসারকে ডেকে বললেন : কালকের সেই গার্ডটি কোথায় গেল? তাকেও সঙ্গে নাও। বুড়ো খুব ভালো গাছ চেনে। তার অসুবিধা হবে?

অসুবিধে কিসের? সাহেব ডাকলে সুবিধে-অসুবিধের কথা ওঠে কিসে! রেঞ্জ-অফিসার বুঝতে পারেন না। খাওয়া ফেলে দৌড়ে এলো আয়েঙ্গার। হাঁটু ভেঙে কুর্নিশ জানালে।

চেনা মুখ

সারাদিন ঘুরে ঘুরে চারা দেখে বেড়ালেন মুখার্জি সাহেব। বাড়ন্ত সেগুন-গাছের চারা দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আরও প্রচুর পরিমাণে সেগুন লাগাতে নির্দেশ দিলেন। হিমসিম খেয়ে গেল সবাই।

দিনের শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন ইন্‌স্‌পেকশন-বাংলোয়। খড়ের চাল, বাঁশের ফ্রেমের ওপর মাটির আস্তর লাগানো দেওয়াল। নতুন চারাবাগান দেখা-শোনা ক'রতে এসে রেঞ্জ-অফিসার বা ফরেস্টার রাত কাটান এখানে। এ বাংলো সাহেবদের জন্য নয়।

মুখার্জি সাহেব নিঃসন্তান। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ট্যুরে যেতেই তিনি অভ্যস্ত। কিন্তু এবার যেন স্ত্রীকে সঙ্গে এনে ভুল করেছেন। ভয়ানক বেশী অনিয়ম সহ্য করতে হচ্ছে একজনকে, এইরকম ভাবছিলেন মুখার্জি সাহেব।

অবশ্য নেহাত-ই যে নতুন জায়গা দেখবার জন্য বা ঘুরে বেড়ানোর খাতিরেই মিসেস মুখার্জি স্বামীর সঙ্গে থাকেন, এটা ঠিক পুরোপুরি সত্যি নয়। সুযোগ পেলেই খাওয়ার অনিয়ম করবেন মুখার্জি সাহেব। এ-সম্পর্কে সংশয় ছিল না মিসেস মুখার্জির। জেনে-শুনেই তিনি ঝাল খাবেন, যে খাদ্য ডাক্তারের নির্দেশে অখাদ্য বলে বাতিল হয়েছে, তাকেই তিনি সুখাদ্য মনে করে অনিয়ম করবেন। প্রবল যুক্তিবাদী মন এইখানেই বেহিসাবী। শিশুর মতো অবুঝ হয়ে পড়েন মুখার্জি সাহেব। বিশবছর ঘর করছেন, স্বামীকে তাঁর ভালো করেই জানা আছে।

সারাদিন খাটুনি গেছে। হাতের কাজটুকু পরদিনের জন্য তুলে রেখে দিলেন মুখার্জি সাহেব। সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিদায় নিল সবাই। কাল ভোরেই সাহেব এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবেন। এখন নির্বিঘ্নে রাতটা কাটলেই রক্ষা।

কিছুটা দূরে কুলী-শেড। সারিবদ্ধ লম্বাটে ধরনের। মেয়ে-মরদে চারা-বাড়ীতে কাজ করে। সন্ধ্যের পর মেয়েরা চুলে তেল দিয়ে পাতা কাটে। খোঁপায় গোঁজে ফুল, রঙীন শাড়ী পরে। হাড়িয়া খেয়ে চুলোচুলি বাঁধিয়ে

দেয় নিজেদের মধ্যে। রেঞ্জার সেইজন্যই চৌকিদার পাঠিয়ে সাবধান করে দিলেন সবাইকে।

রাত তখন গভীর। বাইরে ছিল গুমোট ভাব। কালো অন্ধকারের ডানায় ভর করে মৌনতা নেমে আসে দিগ্‌দিগন্তে। নীরব অবসন্ন এই অন্ধকার থেকে দাবানল জ্বলে উঠল হঠাৎ। কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। চীৎকার উঠল নীরবতার মধ্যে থেকে। পুব থেকে পশ্চিমে সে আর্তকণ্ঠ খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ল। সবাই ছুটে এল বাংলোর দিকে। খড়ের চালা দাউদাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। মুখার্জি সাহেব দরজা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো। বিছানাতেই মিসেস মুখার্জি জ্ঞান হারিয়েছেন।

ইঁদারার জলে আগুন শাসনে এল না। চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আগুন। শাবল, গাঁইতি হাতেই রয়ে গেল। আগুনের হল্‌কায় ঝল্‌সে দিয়ে যাচ্ছে চারদিক।

লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। একটা শক্ত পাঞ্জা ধরে ফেলল তাঁকে পেছন থেকে। ফিরে তাকান মুখার্জি সাহেব—একটা ছায়ামূর্তি। আগুনের মধ্যে দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল তাঁকে। খোলা জায়গায় তাঁকে ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আবার সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঢুকে গেল।

ভয়ে ও ত্রাসে কারও মুখে কথা নেই। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলেন মুখার্জি সাহেব। ডান দিকের চাল ভেঙে প'ড়ে আগুন নীচের দিকটা গ্রাস করে ফেলল। সকলের দৃষ্টি তখন একদিকে। কিন্তু যে গেল সে বুঝি আর ফিরে এল না। এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা যুগ। বাতাসে ভর করে আগুন পাগলের মতো ছুবলে চলেছে চারদিকে। হঠাৎ জ্বলন্ত জানালার কপাট খুলে ভেঙে পড়ল। চীৎকার আসছে ভেতর থেকে। মুখার্জি সাহেব ছুটে এলেন কিছুটা। মৃতপ্রায় মিসেস মুখার্জির দেহটা জানালা দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে একজন। চীৎকার করে চলেছে সে একটানা।

মিসেস মুখার্জির জ্ঞানহীন দেহ আগুনের হল্‌কা বাঁচিয়ে বাইরে নিয়ে আসা হল। ঠিক এমন সময় খোলা জানালা দিয়ে একটা জ্বলন্ত মাংসপিণ্ড গলে এল। মাথার ওপরের জ্বলন্ত চালটা ভেঙে পড়ল তারপর। সকলে

ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল সেই অপরিচিত দেহ। ঝুঁকে পড়েন মুখার্জি সাহেব। চিনতে পারেন এবার—কালকের সেই গার্ড। জঙ্গলের গাছ-গাছালি যার নখদর্পণে—সেই আয়েঙ্গার।

মাথার ক'গাছি চুল আগুনে জ্বলে গিয়েছিল মিসেস মুখার্জির। জ্ঞান হারিয়েছিলেন ভয়েই। খানিক বাদেই চোখ খুললেন। মুখার্জি সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন বাহুবন্ধনে। চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

ওদিকে আয়েঙ্গার বড় বড় চোখ দুটো তুলে চারপাশে কার যেন খোঁজ করে চলেছে। একটানা কাতরোক্তি নীরব হয়ে এল। আবার মাঝে মাঝে অসহ্য কাঁপুনির সঙ্গে কুঁকড়ে উঠল সারাটা দেহ।

সাত মাইল দূরে ডাক্তার। হাতের কাছে কোনো কিছু নেই। মুখার্জি সাহেব ঝুঁকে পড়েন আয়েঙ্গারের মুখের উপর। অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন চারদিকে। রেঞ্জ-অফিসারকে বললেন : যে ডাক্তারকে পাও ধরে নিয়ে এসো।

রেল-স্টেশন এই জঙ্গল থেকে বাইশ মাইল তফাতে। থানা এগারো মাইল। পোস্ট-অফিস ছ'মাইল। শুধু চিঠি বিলি হয়, জরুরী তার সেখানে যায়-আসে না।

ডাক্তারের প্রয়োজন হল না। দরকার হলনা ওষুধের। দাপুটে মুখার্জি সাহেব নিজের কাছেই যেন অপরাধী হয়ে পড়েন।

সুন্দর মুখটা ঝলসে গেছে পুরোপুরি। আয়েঙ্গার ধীরে চোখদুটি খোলে। মুখার্জি সাহেবের হাতটা চেপে ধরে এক প্রচণ্ড উত্তেজনায়। থরথর করে কাঁপতে থাকে তার সারা দেহ। তারপর যেন স্থির হয়ে এল। শুকনো পাতার মতো বিবর্ণ ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠে। অতিকষ্টে ডানহাতটা কপালের কাছে তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে : সেলাম সাহেব, সেলাম!

হাতটা খসে পড়ল মাটিতে—আয়েঙ্গারের দেহটা স্থির হয়ে গেল তারপর।

মুখার্জি সাহেব ফিরে এলেন সদরে। সহকর্মী বন্ধুরা ছুটে এলেন। ফরেস্ট-ফায়ার কি করে রোধ করা যায় সে সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে গেলেন। আয়েঙ্গারের মতো সামান্য একজন গার্ডের অপমৃত্যুতে হয়তো দুঃখপ্রকাশ করা যায়, বড় জোর 'অন্ ডিউটি' দেখিয়ে নাবালক পুত্রের জন্য

কিছু সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু মুখার্জি সাহেবের অত মুষড়ে পড়ার পেছনে কোনো যথার্থ কারণ খুজে পেলেন না কেউ। আয়েঙ্গারের জন্য মিসেস মুখার্জি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি দেখে অনেকেই বললেন: বাড়াবাড়ি।

কিন্তু স্থির থাকতে পারেন না মুখার্জি সাহেব। আয়েঙ্গারের নাবালক পুত্রকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন জঙ্গল থেকে। মাতৃপিতৃহীন এই শিশুটিকে আপনার করে নিলেন। মিসেস মুখার্জির সুপ্ত মাতৃত্ব শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ওঠে।

কিছুদিন পরে মিঃ মুখার্জি ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলেন কন্‌ভেণ্ট স্কুলে। তার পর কলেজ। পড়া শেষ হলে পাঠিয়ে দিলেন অক্সফোর্ড।

আয়েঙ্গার ফিরে আসেন চারবছর পর। ইম্পীরিয়াল ফরেস্ট-সার্ভিস পাস করে সরকারী চাকরি নিয়ে গেলেন কুর্নুল। সংসার পাতেন সেখানে। চার বছর পর স্ত্রী লিফট্-দুর্ঘটনায় মারা যান।

মিঃ মুখার্জি আজ মৃত। আয়েঙ্গার সাহেব দিল্লী চলে গেলেন আবার নতুন কাজ নিয়ে। সঙ্গে গেলেন মিসেস মুখার্জি।

দীর্ঘজীবন এইভাবে কেটে গেল। আয়েঙ্গার সাহেব আজ প্রৌঢ়। মিসেস মুখার্জি আজ বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেচেন। আয়েঙ্গার সাহেবের সঙ্গে কখনও দিল্লী, কখনও তাঁর ছেলের সঙ্গে বজবজে—এইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে তাঁর।

কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। নাটকীয় আত্মকাহিনী শেষ হল। আয়েঙ্গার সাহেব বললেন: বাস্তব জীবন নাটককেও হার মানায়, সেন সাহেব।

আয়েঙ্গার সাহেবের সঙ্গে নেমে এসেছি। দেখলাম বাগানে নাতির সঙ্গে বসে কথা কইছেন মিসেস মুখার্জি। আয়েঙ্গারকে বললেন: তুমিও চললে নাকি?

আমার দিকে চেয়ে হাসলেন আয়েঙ্গার। বললেন: না, মা। সেন সাহেবকে তুলে দিতে নেমেছি।—মা এখনো আমার সাবালকত্ব স্বীকার করেননা সেন সাহেব, জানলেন?

তারপর মা আর ছেলেকে দু'পাশে নিয়ে হাসিমুখে হাত নাড়লেন আয়েঙ্গার সাহেব।

মিসেস মুখার্জির স্নেহভরা হাসিটি আমার চোখে লেগে রইলো অনেকক্ষণ।

কারণ সামান্যই।

তবু, শুধু অসন্তুষ্ট নয়, যেন কিছুটা চটেই গেল মোহিনী। মোহিনীর অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি।

অতি সাধারণ কথা। এ ধরণের অনুরোধ নিয়ে হামেশাই আমি গিয়ে থাকি অন্যের কাছে। তবু মোহিনীর কথা আমি আজ রাখতে পারিনি। কিছুটা বিব্রতই হয়েছি আমি। মোহিনীকে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টে প্রমোশান দেবার অনুরোধ নিয়ে এলি দত্তর কাছে সামান্য একটি ফোন করাও আজ আমার পক্ষে অসম্ভব।

মোহিনী আমার পুরাতন বন্ধু! শুধু অনুরোধ কেন, বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে সে আপদে-বিপদে আমার কাছে নিশ্চয়ই আসবে। তবু এই মুহূর্তে আমি নিরুপায়।

মোহিনী প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল। অনেক আশা নিয়েই এসেছিল সে। আমার সব কথা বলতে পারিনি। যুক্তি দিয়ে আমি কি বোঝাব মোহিনীকে?

জীবনের প্রবহমান একটানা গতিপথে এমন কতগুলি মুহূর্ত আসে, যখন সামান্য কোন কিছু গরমিল কোথাও দেখা দিলে সে গতিতে বাধা পড়ে। ছেদ হয়ত পড়ে না, তবে আচমকা এক আলোড়ন দেখা দেয়।

আমি পুরাতনকে ভুলতে চাই। অতি সহজে ভুলেও যাই। নিত্য নূতন লোক। নূতন কাজের বেসাতি। এক হাট থেকে বোঝাই করে নিয়ে আবার শূন্য করে দিয়ে চলেছি অন্য হাটে।

আমি পরের মন নিয়ে অহরহ ফাটকা খেলে থাকি। ভরসা এই যে, তাতে কপর্দকও ক্যাপিটালের দরকার হয় না। নিজের আসল মনটি চলতি রঙ্গমঞ্চের বাইরে থাকে। সাজান পৃথিবীর নানান কোলাহলে নেপথ্যের আসল মানুষের গলা চাপা পড়ে যায়। যেমন করে ঢাকা পড়ে যায়

প্রম্পটারের কণ্ঠ। তবু এই নীরব মনের ক্ষমতা অসাধারণ। দৈবাৎ সামান্য অসতর্কতায় বেতালা করে দেয় সব। তাড়াতাড়ি ফরোয়ার্ড ডায়রী টেনে নিই। ফোন করি এখানে সেখানে। সিনেমায় চলে যাই। এমন কি পলিটিক্যাল এজিটেটরের ড্রয়িং রুমে-ও জায়গা হাতড়াই। তবু ভবি ভোলবার নয়। মাতৃস্তনে শিশুকে ভোলানো চলে। খুকু হয়ত ভোলে পুতুল খেলায়। কিন্তু আমার মন মানবে কিসে ?

মোহিনী আজ ভোরবেলা এসে আমার মনটাকে এলোমেলো করে দিয়ে গেল। যে সব কথা আমি আজ মনে করতেও চাইনা, যাদের নির্বাসন দিয়েছি বিস্মৃতির গহীনে ; মোহিনীর কথায় আবার তারাই দেখি বেরিয়ে এসেছে। বাতাসে ভেসে আসা শুকনো পাতার মত আমার মনটাকে বিস্রস্ত করে উড়ে বেড়াচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও শৃঙ্খলা আনতে পারি না। টুকরো টুকরো কথার সূত্র ধরে শুধু স্মৃতির তুফান উঠে আসে। সে তুফানে জোয়ারের জোর। আমার বাধা মানে না।

এলি দত্তর সংগে পরিচয় হবার পেছনে সামান্য একটু নাটক ছিল। তবে রঙ্গমঞ্চের নাটকে প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের সঙ্গে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের যে সামঞ্জস্য থাকে—ইংরিজিতে যাকে বলে কণ্টিনিউটি, আমাদের পরিচয়ের পেছনে সে রকম কোন যোগসূত্রের ঠাস বুনোন নেই।

আমি চলেছিলাম ধানবাদ। আমার প্রয়োজনীয় কাজের তাগিদে। কাজের কথা অবশ্য শেষ হয়েছে। কাগজপত্রে নির্বিঘ্নে ডজনখানেক সই নিয়ে ফিরতে পারলে পুরো কাজটি সমাধা হয়।

জি. টি. রোডের ধারে, বোধ হয় মেমারীর কাছাকাছি, দেখলাম একটা কালো বড় গাড়ী অজগরের মত মুখ হা করে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম গাড়ী বিগড়েছে কারও। আকাশে সন্ধ্যে নামছে। তবুও থামতে হল।

এলি দত্তর সঙ্গে পরিচয় এইখানেই। একা চলেছেন। সারথি একজন নেপালী। আর বৃহদাকার দুটো অ্যালসেশিয়ান পেছনের উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে আমাকে দেখছিল।

নেপালী ড্রাইভার জানালে : গাড়ী চলবে না।

আমি নিজে পরীক্ষা করি। মোটর গাড়ীর কল কব্জায় আমার জ্ঞান স্বল্পই। তবে সামান্য টালবেটাল সামলাতে পারি সহজেই।

ড্রাইভারের অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। জোড়াতালি দেবার উপায় নেই। পাশ করা না হলেও দ্বারকানাথ রোডের গেঞ্জীপরা হাতুড়ে ডাক্তার ডাকতে হবে।

দিশেহারা এলি দত্ত আমার মুখে চোখ তুলে বলেন : সো রিডিকুলাস্।

—যাবেন কোথায় ?

—বার্ণপুর।

—আপত্তি না থাকলে আমার গাড়ীতে আসতে পারেন।

হাতে যেন স্বর্গ পাবার নজীর দেখলাম। নির্বিঘ্নে দুটি বিলিতি দিব্যি গেলে এলি দত্ত উঠে এলেন আমার গাড়ীতে। কুকুর দুটো পেছনের সীটে রেখে আমার পাশে এসে বসলেন। গাড়ী লক্‌আপ করে ড্রাইভার এল।

—বর্ধমানে ড্রাইভারকে ছেড়ে দেব। আমার গাড়ীটার একটা হিল্লে করতে হবে। আপনি এসে না পড়লে কি বিপদেই যে পড়তাম!—অতি সহজ কণ্ঠে বলেন এলি দত্ত।

পথে হল পরিচয়ের আদান প্রদান। অতি সাধারণ কথা। বর্ধমানে পৌঁছে আমার কাছ থেকে কলম নিয়ে খসখস করে খানিকটা কি যেন লিখলেন। কাগজটা মুড়ে ড্রাইভারের হাতে তুলে দিয়ে চোস্ত নেপালীতে বললেন : ম্যাজিষ্ট্রেট সাবকো কোঠি তো তিমি জান্দা ছউঃ, ইয়ো চিট্‌ঠি উনি লাই দিনু—মো পরশি ফরকিন্দু।

ড্রাইভার নেবে গেল গাড়ী থেকে। সেলাম ঠুকে পুব মুখো হাঁটা দিল। কলমটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন এলি দত্ত : গাড়ীর একটা ব্যবস্থা হল। আপনাকে কিন্তু খুবই বিরক্ত করছি।

আর কোন কিস্তু নেই। এবার সোজা বার্ণপুর। মিউনিসিপ্যালিটির আলো ফুরিয়ে গেল। দুপাশে নেবে এল কালো অন্ধকার।

একটানা গাড়ীর যান্ত্রিক আওয়াজ। উইণ্ড স্ক্রীনের হাওয়ায় পাতলা শাড়ীর আঁচল আমার কোটের আস্তিনের কাছে এসে মৃদু ঝাপটা মারছে।

চেনা মুখ

সিগারেট ধরাতে আমি নাজেহাল হচ্ছি দেখে হাত থেকে লাইটারটা তুলে নিয়ে আমার মুখাগ্নি করবার জন্য কিছুটা এগিয়ে এলেন এলি দত্ত। পিছনের সীটের কুকুর দুটো অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

বুঝতে হয় বেতালা কিছু একটা হয়েছে। তাদের প্রভুর সঙ্গে আমার এতটা দৈহিক নৈকট্য তারা বরদাস্ত করবে না। তাই নড়েচড়ে গাঁইগুঁই শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

আত্মীয় সন্দর্শনে চলেছেন এলি দত্ত। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'-এ আছে পতিগৃহে যাবার তাগিদে অতি নিকটের তপোবন ছেড়েছিলেন শকুন্তলা। অতি স্নেহের মৃগশিশুকে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সামান্য দু'দিনের জন্যেও এই সারমেয় দুটিকে রেখে আসতে ভরসা পাননি এলি দত্ত।

অবশ্য বলেন তিনিঃ তাঁর কুকুরগুলোর মধ্যে এই দুটোই বড় বেশী অ্যাডামাণ্ট। তাই নাকি সঙ্গে রাখতে হয়।

কালো অন্ধকার নেমেছে চারদিকে। প্রচণ্ড বেগে উল্টো দিক থেকে তীব্র আলো ফেলে প্রচুর বোঝা মাথায় নিয়ে ছুটে আসছে উদ্ধত লরী। একটা লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে আটকা পড়ে কিছুক্ষণ থর্‌থর্‌ করে কেঁপে বন্ধ করে দিই গাড়ী।

—আপনি খুব সংযমী লোক।

—একথা কেন বলছেন?

—কথা কম বলেন, চল্লিশের ওপরে গাড়ী চালান না।

—আপনার তাড়া আছে?

—কিছুমাত্র নয়। বাইশ মাইল বেগে গেলেও আমার খারাপ লাগবে না। আপনার সঙ্গে যাওয়াটাই একট প্লেজার।

—স্নাব করছেন।

—একদম না।

গাদাগাদি মানুষঠাসা দীর্ঘ একটা ট্রেন মাথা ঝোঁকে ঝোঁকে সামনে দিয়ে চলে গেল। এখানে সেখানে আলোর রঙের পরিবর্তন হল। পথ গেল খুলে।

সামনের ধোঁয়াটে কালচে পরিবেশ দ্রুত দু'পাশে সরে যাচ্ছে। চুরচুরে বৃষ্টি বাইরে। ক্লান্ত দেহ। ওয়াইপারের একঘেয়ে শব্দ। নরম মেয়েলি গন্ধ ম ম করছে সারা সীট জুড়ে।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটে গেল। একটা বাঁকের মুখে চমকে উঠলাম। সামনের কাঁচের ওপর ভারি কিছু পতনের আওয়াজ হল। অন্ধকার হয়ে গেল কাঁচটা। ওয়াইপার গেল থেমে। একটা বিস্ময়োক্তি করলেন এলি দত্ত। রুখে দিতে হয় গাড়ী।

দেখি, সারা কাঁচ বেয়ে রক্ত ঝরছে। গাড়ীর আলোতে দিশেহারা হয়ে কোন পাখী ছুটে এসেছিল। জমাট রক্তে দুটো পালক আছে এঁটে। আলো জ্বালি। রক্তটুকু মুছে নিই।

মৃদু হাসি এলি দত্তর ঠোঁটে। আল্‌তো করে আমার মুখের ওপর চোখদুটো তুলে বলেন: নাইট বার্ড। আলো দেখে ছুটে এসেছিল।

কানে বাজে কথাটা। ভাবি মনে মনে। আলো দেখে হয়ত পাখী একটা এসেছিল ছুটে, কিন্তু আমি ছুটে চলেছি কি দেখে? ঘটনাটা 'সিম্বলিক' নয় তো?

বার্ণপুরে গিয়ে গাড়ী থেকে নামতে যেটুকু সময় লাগে, তার চেয়ে বেশী দেরী আমাকে করাবেন না—এ ভরসা পথেই আমি আদায় করে নিয়েছিলাম। তবু এলি দত্ত-র আত্মীয়ের কুটীরে নুড়িতে বাঁধানো পোর্টিকোর তলায় যখন গাড়ীটা কাত করে এনে ফেলি, হাতল ঘুরিয়ে নামতে গিয়ে স্বচ্ছ হেসে তিনি বলেন: সত্যি আপনি নামবেন না? অবশ্য আমি জোর করব না। সামনে আপনার অনেকটা পথ। কই, মিঃ সেন, আপনার কার্ডখানা দিন। কলকাতার হট্টগোলের মধ্যে আপনার নাগাল পাব কোথায়? আমাকে আবার গাড়ীবিভ্রাটের কাহিনী থেকে স্বরু করতে হবে; বলতে হবে সবাইকে।

কার্ডখানা হাতে তুলে দেই। হেসে আস্তে বলি: আপনি দেখছি কিচ্ছু শেখেননি। পুরো কাহিনী বলবেন কাকে? তাহলে দুনিয়া শুদ্ধ লোক আপনার গাড়ীর ইঞ্জিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। চৌরঙ্গীর ট্রাফিক বার্ণপুরে ধাওয়া করবে। জি. টি. রোডকে করে তুলতে চান হ্যারিসন রোড?

চেনা মুখ

—সো লাভলি। আপনি কি অপূর্ব কথা বলেন মিঃ সেন। নামবেন না? ত্ব'হাত জোড় করে হেসে বলি: ঘড়ির চেহারাটা দেখেছেন? অবশ্য আপনি জোর করলে আমি নাচার।

এলি দত্ত নেবে গেলেন। নাবিয়ে দিলুম কুকুর হুটো।

কোণের বারান্দা থেকে এক প্রৌঢ়ার গলা পেলাম: এলি এলি?

—এলুম।

কলকাতায় এসে এলি দত্তর পরিচয় পেলাম। বাসস্থান ক্যামাক্ ষ্ট্রীট। বি. এল্ দত্তর স্ত্রী। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নানা স্থানে বিদ্যুত সরবরাহ করে থাকেন। কোডার্মায় অভ্রের খনি আর ডুয়ার্সে আছে চা বাগান।

ওশকে দেখলাম অনেক খবর রাখে। ওশকে আমার বন্ধু। পুরো নাম অশোক চৌধুরী। আইন ব্যবসায় স্থবিধে করতে পারেনি। বার লাইব্রেরীতে বসে দাবা খেলে। আইনের চালে বেচাল হলেও দাবার চাল মন্দ জানা নেই।

গতবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। আমি জানি, বামে হেলবে না ডাইনে যাবে এই ধাঁধাঁয় ছিল সে। শেষ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লেকচার দিতে স্থরু করলে। 'চাষী ধান ঝাড়ছে' প্রতীক চিহ্ন নিয়ে মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়ালো। সেই সঙ্গে বেশ কিছু টাকার খয়রাতি করে যথারীতি বহু ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ। কিছুদিন ম্রিয়মান ছিল। এখন আবার পুরো দমে লেগে গেছে দাবা খেলায়।

বি. এল. দত্তর প্রসঙ্গ তুলে ওশকে বলে: রোজ বিকেলে আমরা ঘড়ি মেলাতাম। হিটলার বোমা ছুঁড়তে আসতো তখন। বি. বি. সি থেকে চীৎকার করে জানান দিতাম ভবানীপুরে আশু বিশ্বাস রোডে। বেঁচে আছি, স্বস্থ আছি। এমনি এক দিনে দত্ত সাহেবের সঙ্গে পরিচয়। বড় লোকের ব্যাপার। কিছু না করবার জন্যই হয়তো বিলেত গিয়েছিলেন। ওনার মিসেসের সঙ্গে দেখাও আমার ওখানে। তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি?

আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করেই আবার স্থরু করে ওশকে: ক'বার দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে এখানে। স্বামীটা একটা সাইফার। এলি দত্তর থুতনীর কালো তিলটা কিন্তু সত্যি অপূর্ব। তবে নাক উঁচু ব্যাপার

আর কি ? তুমি তো জান বড়লোকদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। অতি কষ্টে চিনে আমাকে ধন্য করবেন।

অনেক কথা বলে গেল ওশকে। বুঝলাম উচ্চ মঞ্চের মানুষ এরা। সমাজের মগডালে এদের গতিবিধি। প্রচুর ইচ্ছে থাকা সত্বেও নিজেকে শাসনে রেখেছি। দুবার ফোনের রিসিভার তুলেও নামিয়ে রেখেছি যথাস্থানে। মনে হয়েছে আমার নাম ঠিকানাও তো জানা আছে এলি দত্তর।

মাস দুই পর। জানান না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম দার্জিলিং। উদ্দেশ্য বিহীন যাত্রা। কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলে নিরুদ্দেশ যাত্রা বললেও চলে। ক্লান্তি নেবেছে দেহে ও মনে। পলিসি আর প্রপোজালের নানা বর্ণের কাগজের স্তুপ থেকে কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চাই।

শেষ হয়েছে মরশুম। লোকের ভীড় নেই। কম্বল আর বাঁদুরে টুপিতে মাথা ঢেকে ধুতির নীচে ড্রয়ার পরে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখবার মত দৃশ্যপিপাসু রসিক লোকের একান্তই অভাব। খচ্চরের পিঠে বসে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ী তুলে থল্‌থলে দেহভার নিয়ে ম্যালকে আবর্তন করে না কোনো মাড়োয়ারী বধূ। বেয়াড়া স্যুটপরা ক্যামেরাধারী অতি স্মার্ট ছেলের সাক্ষাৎ পাওয়াও দুষ্কর। পাকাপাকি বাসিন্দেরাও নাকি অধঃপাতে নামেন এ সময়ে। প্রবল শীত। বাইরে কুয়াশার সঙ্গে উড়ো বৃষ্টি। মিটার ডাউনকরা ট্যাক্সির মত কাঁপছি। সিগারেট ঠোঁটে লাগাতে গিয়ে স্থানভ্রষ্ট হয়ে আঘাত করছে নাকের ডগায়। তবু উসখুস করে মন। হোটেল ছেড়ে পথে নেবে আসি।

পথে লোকজন সামান্যই। ফাঁকা পড়ে আছে ম্যাল। জাগ্রত প্রহরীর মত ঝুপি গাছগুলো মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাণ্ড রোভারের কোনো ড্রাইভার সিঞ্চল লেক বা টাইগার হীলে নিয়ে যাবার অনুরোধ নিয়ে পিছু নেবে না ল্যাডেনলা রোডের বাঁক পর্যন্ত। পরিপূর্ণ নীরবতা চারদিকে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘরমুখো চলেছে মানুষ।

কি একটা ছিল যেন সে দিন জিমখানা ক্লাবে। পরিচিত দুএকটি মুখ চোখে পড়ল। নীচের উঠোন পেরিয়ে বিলিয়ার্ডের আসরে পৌঁছে যাই।

খেলা দেখতে দেখতে নিজেই যে কখন খেলায় মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম খেয়ালই ছিল না খুব সুন্দর একটা কেনন্‌ করলাম।

চেনা মুখ

—সুপার্ব!

টেবিল থেকে চোখ তুলে যাকে দেখলাম তিনি আর কেউ নন—এলি দত্ত। হাতের কিউ আলগা হয়ে এল। খুশীর পাতলা হাসি ভেঙ্গে পড়েছে এলি দত্তর সারা চোখেমুখে। মাথা হেঁট করে বলি: গুড্ ঈভ্নিং।

রক্তিম ওষ্ঠাধর থেকে কথা ঝরে পড়ে: গুড্ ঈভ্নিং—ভাল আছেন?

বিলিয়ার্ডের লাঠিসোটা ফেলে এগিয়ে আসি। হেসে বলি: চিনেছেন দেখছি?

—উঠেছেন কোথায়?

—মাউণ্ট এভারেষ্টে।

—কি কারণে দার্জিলিং ধাওয়া করেছেন এই শীতের মধ্যে? বেশ লোক তো আপনি! আমি আপনাকে আমার কলকাতার বাড়ীতে কত আশা করেছিলাম!

এ আশা আমিও তো করতে পারি।

ঠিক এই সময় এক ভদ্রলোক এসে আমাদের সামনে হাজির। এলি দত্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন। দত্ত সাহেবের সঙ্গে পরিচয় এই প্রথম। দোহারা চেহারা। মাথায় টাক। চোখের পাতা বাভ্রু বলে কোনো পদার্থ নেই। বাঁদিকের ঠোঁট দেখে মনে হয় যেন একটা ধাক্কা গেছে ষ্ট্রোকের। আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন মিঃ দত্ত: সো ইউ আর মিঃ সেন! —দি মোষ্ট হ্যান্সাম্ ম্যান এলি এভার মেট।

টী প্ল্যাণ্টার্স কলাবের জরুরী মীটিংয়ে মিঃ দত্তর দার্জিলিং আসা। ভিক্টোরিয়া পার্কের নীচে মিউজিয়ামের কাছেই তাঁদের বাড়ী। তিন পাত্র বিয়ার নিয়ে বসি। বেশ কিছুক্ষণ দায়িত্বহীন বাক্যালাপ। পাশ থেকে ভেসে আসছিল জ্যাজের কাঁপুনি। আমার মুখের ওপর চোখ রেখে এলি দত্ত পাতলা হাসির সঙ্গে মাথা দুলিয়ে তাল রাখছিলেন: ব্যা···ব্যা···ব্যা··· মা······মা······!

নতুন করে চিনছি যেন এলি দত্তকে। কথাবার্তা ঠাটঠমকে অতি স্বচ্ছ সাবলীল গতি। সুন্দর বাচনভঙ্গী।

এলি দত্ত বড়ে গোলাম আলির নাম শুনেছেন বলে মনে হয় না। দেড় যুগ ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঠুংরি—'আয়ে না বালম'। হয়তো নামটাই তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু বুডি নামে কোনো অখ্যাত এক নিগ্রো নাপিত কবে নিউ অর্লিন্‌সে তোতোঙ্করা জ্যাজ শুনিয়ে আমেরিকার কয়েক শতাব্দীর সঙ্গীতের ট্র্যাডিশনে বিপ্লব এনেছিলেন, এবং সেই সঙ্গীতের মাধ্যমে মাত্র বিশ বছরে কালোয়ঙ্গনায় যে মিলন ঘটে, পঁচাত্তরের কনষ্টিটিউশানের তিনটি মারাত্মক সংশোধনীতেও তা সম্ভব হয়নি, একথা অতি সচ্ছন্দে বলে গেলেন এলি দত্ত।

নিলডাউন হবার ভঙ্গীতে চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনবার ছোট্ট করে হাত তালি দিয়ে বলি: অপূর্ব, তুলনাহীন।

স্মিত হাসেন এলি দত্ত: না মিঃ সেন, প্রত্যেক জিনিষের অরিজিন-টা জানা দরকার। আনন্দও তাতে প্রচুর। বিলেতে গিয়ে অতি আধুনিক স্যুট আপনি বানাতে পারেন সচ্ছন্দে, বাহবা দেবেন দর্জিকে। কিন্তু সেই বিলিতি দর্জি যে পিরামিডের দেশের কোন ম্যমির হাত থেকে ছুঁচটা নিয়ে গেছে সে খবর রাখেন? এই সেদিন পর্যন্ত জুলিয়াস সীজার দোলাই কাঁধে দিয়ে ঘুরেছেন ইউরোপের পথে পথে; তখন এই দার্জিলিংয়ের ডাণ্ডিওয়ালা স্যুরুমাল পরত কিনা কে জানে? অরিজিন জানার মধ্যে আছে অরিজিনালিটি কিন্তু উপায় নেই—আমি আপনি চেঁচালে কি হবে? অ্যাডভোকেট জেনারেল থেকে সুরু করে ঘুসকরার বিনয় জোয়ারদার পর্যন্ত হাওয়াই সার্ট বলতে অজ্ঞান। ডিকেন্‌সের বই ক' কপি বিক্রী হয় আজ?

হঠাৎ ঘড়ি দেখে 'ও গড্' বলে চমকে লাফিয়ে উঠলেন এলি দত্ত। দত্ত সাহেবের মুখের ওপর চোখ তুলে বলেন: তুমি ভেবেছ আমি ভুলে গেছি, না? চল, শেষ পর্যন্ত সেন সাহেব আর আমাকে যে তুমি দোষ দেবে, তা আমি হতে দেব না। মিঃ পরিমু ভয়ানক পাংচুয়াল। ডিনার এ্যট এইট—ফোনেই আমাকে বলেছিলেন।

ডিনার সামলাতে উঠে পড়েন ওঁরা। আমিও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি। হাত জোড় করে মিঃ দত্ত বলেন: সামান্য পরিচয় হল আপনার সঙ্গে। কাল সন্ধ্যেতে আসুন আমার বাড়ীতে। নতুন জিনিষের ব্যবস্থা থাকবে।

টিবেটিয়ান ছ্যাং খাওয়াব, আসুন কাল। অন্য কোথাও খেয়ে থাকলেও মিঃ লামার প্রিপারেশানের তুলনা হয় না। এ সঙ্গে দু' মুঠো আমার ওখানেই মুখে দেবেন।

হাত জোড় করে এলি দত্ত হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছেন। চেয়ারের হাতলে রাখা রেণ্‌কোটটি হাতে তুলে নি।

এলি দত্ত বলেন : আসছেন কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

জ্যাজ্‌-এর একটানা তোতলামো চলেছে। আমিও জিমখানা ছেড়ে চলে আসি। শূন্য ম্যাল। ফিরে চলি হোটেলে।

* * * * * * *

সুন্দর ডিনার ছিল তার পরদিন। সেই সঙ্গে ছ্যাং। মিঃ ও মিসেস দত্তর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম। বিপুল সমারোহ। বিচিত্র ডিশের ছড়াছড়ি।

মিঃ দত্ত পুরো মাত্রায় সাহেব। তবু অল্প কথাবার্তায় সামান্য পরিচয়ের মধ্যেই ধুতি-পাঞ্জাবীপরা একটি দুর্বল বাঙালী চরিত্রের সন্ধান পেলাম। ব্যবসা খুব ভালো বোঝেন সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে যে সব সময় খুশী রাখতে হবে, এটা যেন আরও বোঝেন ভালো। ছ্যাংয়ের তাড়নাতেই বোধ হয় কিছু বাড়াবাড়ি হল শেষের দিকে। স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন মিঃ দত্ত। চেষ্টাকৃত সঙ্কোচের ভাণ মিসেস দত্তর। চোরা চাউনির সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন।

আমি বলি, দেখুন, আপনাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। ইজেলে-রাখা ছবিটা কিন্তু অপূর্ব। অবশ্য ছবির এমন কিছু বুঝি না! শেষ করুন।

—আপনার ভালো লাগছে?

—ডেপথ্‌টা এসেছে চমৎকার।

ছবির বিষয় বস্তু অতি সাধারণ। পাহাড়ের কোলে চাপাতি তুলছে নেপালী মেয়েরা। উঁচু নীচু খাড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা শেড ট্রি। পিছনে ঘন সবুজ বন।

ছবির গভীরতার জের টেনে উঠে পড়ে প্রথম রেণেসাঁ। এলি দত্তর কথাবার্তায় মুগ্ধ হতে হয়। আমার যেটুকু পুঁজি, তাকে সম্বল করে তাঁর

সঙ্গে চিত্রকলার আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু হাঁ করে বসে থাকা যায়। সুর কিন্তু কাটতে দিইনি। বেফাঁস কিছু বলে বসিনি। তবু আমার গুপীর কথা মনে পড়ে গেল। নিজেকে কেন যেন গুপী গুপী মনে হতে লাগল। খুলে বলতে হয়।

অনেক দিন আগেকার কথা। কার যেন বিয়েতে বরযাত্রীদের মধ্যে এক ওস্তাদজী এসেছিলেন। আমিও ছিলাম সে দলে। সবাই ধরে বসলেন, গান শোনাতে হবে। বহু সমঝদার দেখে ওস্তাদজীর মুড এসে গেল। হারমোনিয়াম একটা জুটল বটে কিন্তু তবলা? অতি উৎসাহী একজন সেটিও জোগাড় করলেন কিন্তু বাজায় কে? খোঁজ পড়ে গেল চতুর্দিকে। আধ ঘণ্টা পরে এক রকম জোর করে ধরে আনা হল একজনকে। তার নাম গুপী। গুপী হাত জোড় করে বললে, সে নতুন শিখেছে। ওস্তাদজীর সঙ্গে সঙ্গত করার কথা সে কল্পনাও করতে পারেনা। ধ্বনিত হল চতুর্দিক থেকে—ঠেকা দাও। ওস্তাদজী বাঙালী। গুপীকে বলেন: ঘাবড়াও মত্ বেটা। বাজাও।

গান সুরু হল। সুরের ল্যাজ ধরে সাপ খেলানো চলল। ষোল মাত্রাকে গুণভাগ করে হৈচৈ বাঁধিয়ে তুললেন ওস্তাদজী। কিন্তু তাজ্জব হয়ে গেলাম গুপীকে দেখে। বাঁ কাঁধে থুতনি ঠেকিয়ে—চোখ বন্ধ করে দৃক্‌পাতহীন একটানা ধা ধিন্ ধিন্ ধা বাজিয়ে গেল। সম্ ঠিক রইল। লয় বেসামাল হল না। তেহাইও ঠেকিয়ে রাখল আঙুল একটু অদল বদল করে। গানশেষে ওস্তাদজী গুপীকে বললেন: সাবাস্।

আমারও অনেকটা গুপীর অবস্থা। এলি দত্তর রেণেসাঁ, 'বেনেজ্জো', 'লিপ্পি', আর 'পরিপ্রেক্ষিত' সামলাতে আমি অস্থির হয়ে উঠলেও সঙ্গত করে গেছি সমানে। ঠেকা দেওয়াই তো আমার কাজ!

খানিকটা দূরে সামনের দুই থাবার উপর থুতনি রেখে যে অ্যালসেশিয়ানটা এতক্ষণ আমাকে দেখছিল, হঠাৎ বেয়াড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেল ঘরের বাইরে। পরিবেশ বেসুরো হয়ে গেল। বেতালা হয়ে গেল এলি দত্ত-র 'মাজাচ্চোর পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্'।

মিঃ দত্ত বলেন: এখানে আছেন তাহলে ক'দিন।

টিবেটিয়ান ছ্যাং খাওয়াব, আসুন কাল। অন্য কোথাও খেয়ে থাকলেও মিঃ লামার প্রিপারেশানের তুলনা হয় না। এ সঙ্গে দু' মুঠো আমার ওখানেই মুখে দেবেন।

হাত জোড় করে এলি দত্ত হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছেন। চেয়ারের হাতলে রাখা রেণ্‌কোটটি হাতে তুলে নি।

এলি দত্ত বলেন: আসছেন কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

জ্যাজ্‌-এর একটানা তোতলামো চলেছে। আমিও জিমখানা ছেড়ে চলে আসি। শূন্য ম্যাল। ফিরে চলি হোটেলে।

* * * * * * *

সুন্দর ডিনার ছিল তার পরদিন। সেই সঙ্গে ছ্যাং। মিঃ ও মিসেস দত্তর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম। বিপুল সমারোহ। বিচিত্র ডিশের ছড়াছড়ি।

মিঃ দত্ত পুরো মাত্রায় সাহেব। তবু অল্প কথাবার্তায় সামান্য পরিচয়ের মধ্যেই ধুতি-পাঞ্জাবীপরা একটি দুর্বল বাঙালী চরিত্রের সন্ধান পেলাম। ব্যবসা খুব ভালো বোঝেন সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে যে সব সময় খুশী রাখতে হবে, এটা যেন আরও বোঝেন ভালো। ছ্যাংয়ের তাড়নাতেই বোধ হয় কিছু বাড়াবাড়ি হল শেষের দিকে। স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন মিঃ দত্ত। চেষ্টাকৃত সঙ্কোচের ভাণ মিসেস দত্তর। চোরা চাউনির সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন।

আমি বলি, দেখুন, আপনাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। ইজেলে-রাখা ছবিটা কিন্তু অপূর্ব। অবশ্য ছবির এমন কিছু বুঝি না! শেষ করুন।

—আপনার ভালো লাগছে?

—ডেপথ্‌টা এসেছে চমৎকার।

ছবির বিষয় বস্তু অতি সাধারণ। পাহাড়ের কোলে চাপাতি তুলছে নেপালী মেয়েরা। উঁচু নীচু খাড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা শেড ট্রি। পিছনে ঘন সবুজ বন।

ছবির গভীরতার জের টেনে উঠে পড়ে প্রথম রেণেসাঁ। এলি দত্তর কথাবার্তায় মুগ্ধ হতে হয়। আমার যেটুকু পুঁজি, তাকে সম্বল করে তাঁর

সঙ্গে চিত্রকলার আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু হাঁ করে বসে থাকা যায়। সুর কিন্তু কাটতে দিইনি। বেফাঁস কিছু বলে বসিনি। তবু আমার গুপীর কথা মনে পড়ে গেল। নিজেকে কেন যেন গুপী গুপী মনে হতে লাগল। খুলে বলতে হয়।

অনেক দিন আগেকার কথা। কার যেন বিয়েতে বরযাত্রীদের মধ্যে এক ওস্তাদজী এসেছিলেন। আমিও ছিলাম সে দলে। সবাই ধরে বসলেন, গান শোনাতে হবে। বহু সমঝদার দেখে ওস্তাদজীর মুড এসে গেল। হারমোনিয়াম একটা জুটল বটে কিন্তু তবলা? অতি উৎসাহী একজন সেটিও জোগাড় করলেন কিন্তু বাজায় কে? খোঁজ পড়ে গেল চতুর্দিকে। আধ ঘণ্টা পরে এক রকম জোর করে ধরে আনা হল একজনকে। তার নাম গুপী। গুপী হাত জোড় করে বললে, সে নতুন শিখেছে। ওস্তাদজীর সঙ্গে সঙ্গত করার কথা সে কল্পনাও করতে পারেনা। ধ্বনিত হল চতুর্দিক থেকে—ঠেকা দাও। ওস্তাদজী বাঙালী। গুপীকে বলেন: ঘাবড়াও মত্ বেটা। বাজাও।

গান সুরু হল। সুরের ল্যাজ ধরে সাপ খেলানো চলল। ষোল মাত্রাকে গুণভাগ করে হৈচৈ বাঁধিয়ে তুললেন ওস্তাদজী। কিন্তু তাজ্জব হয়ে গেলাম গুপীকে দেখে। বাঁ কাঁধে থুতনি ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে দৃক্‌পাতহীন একটানা ধা ধিন্ ধিন্ ধা বাজিয়ে গেল। সম্ ঠিক রইল। লয় বেসামাল হল না। তেহাইও ঠেকিয়ে রাখল আঙুল একটু অদল বদল করে। গানশেষে ওস্তাদজী গুপীকে বললেন: সাবাস্।

আমারও অনেকটা গুপীর অবস্থা। এলি দত্তর রেণেসাঁ, 'বেনেজ্জো', 'লিপ্পি', আর 'পরিপ্রেক্ষিত' সামলাতে আমি অস্থির হয়ে উঠলেও সঙ্গত করে গেছি সমানে। ঠেকা দেওয়াই তো আমার কাজ!

খানিকটা দূরে সামনের দুই থাবার উপর থুতনি রেখে যে অ্যালসেশিয়ানটা এতক্ষণ আমাকে দেখছিল, হঠাৎ বেয়াড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেল ঘরের বাইরে। পরিবেশ বেসুরো হয়ে গেল। বেতালা হয়ে গেল এলি দত্ত-র 'মাজাচ্চোর পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্'।

মিঃ দত্ত বলেন: এখানে আছেন তাহলে ক'দিন।

—বিশ্রী ওয়েদার। থাকবার বড় ইচ্ছে নেই। তবে আরও দু'একদিন তো আছিই।

—হ্যাঁ, আমরাও যাব যাব করছি। দেখি……।

ঘড়িতে দেখি রাত নটা। উঠে পড়ি। মিঃ দত্তর হিক্কা উঠছে। পোর্টিকো পর্যন্ত এগিয়ে এলেন দু'জনে।

—বলবাহাদুর!

—মেমসাব!

—সাবলাই মাউণ্ট এভারেষ্ট মা ছড়নু পরছ।

ওভার কোটের কাণ দুটো টেনে দিয়ে বিদায় নিয়ে উঠে এলাম গাড়ীতে।

মিঃ দত্ত একটা হিক্কা সামলে নিয়ে বলেন, বাইটিং কোল্ড!

ইচেডাঙায় একেই আমরা বলি-কাইল্যা ঠাণ্ডা।

ব্যস, ঠিক এই পর্যন্তই। অসঙ্গতি কিছু চোখে পড়বে না। নাটকপ্রিয় লোক বলবেন, বেশতো 'মেলো' 'মেলো' গন্ধ পাচ্ছি। এলোমেলো ঠেকছে না তো। শীতকাল, জিমখানা, ডিনার, কুকুরের ডাক। কণ্টিনিউটি নেই কোথায় মশাই?

আমিও সে কথায় সায় দিতে পারতাম যদি না পরদিন এলি দত্ত একা এসে আমার হোটেলে হাজির হতেন।

খবর পেলাম? মিঃ দত্ত গেছেন মানীভঞ্জন। দিন দুয়ের আগে ফিরবেন না।

বেশতো! বুঝলাম। তাই বলে কি আমাকে সণ্ট হিলে ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে নাকি?…বেহিসেবি আমাকেও হতে হল। নির্জন ক্যালকাটা রোডে আমাদের ইম্প্রেশনিজম্-আলোচনা অন্য কারও মনে কি ইম্প্রেশন দিতে পারে, সেটি ভেবে দেখবার সামান্য ফুরসুত হ'লনা।

মেয়েদের ব্যাপারে আমি ভয়ানক আনাড়ি। দেহাতি লোককে চৌরঙ্গী ক্রশ্ করতেও এতটা বেসামাল হতে হয় না। এলি দত্ত সুন্দরী। অঙ্কের খাতায় যৌবন গেছে দীর্ঘকাল। কিন্তু কি অটুট স্বাস্থ্য! সস্তা সেণ্টের ঝাঁঝালো আবেদন নেই। তবু থমকে দাঁড়াতে হয়।

'মেটিরিয়ালিষ্ট' দালাল আমি। আমিও থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে মহার্ঘ্য শীতবস্ত্রের তলায় পাতলা শাড়ীতে ঘেরা নিটোল এলি দত্ত কতটা আমার চোখে পড়েছিল, সুন্দর ঠোঁটের হাসি কতটা আমি লক্ষ্য

করেছিলাম জানি না। হয়তো চোখই থাকত আমার তাকিয়ে, আমি যেতাম তলিয়ে। চোখে আমার ভেসে উঠত চা-বাগান, অভ্রের খনি, জাহাজভর্তি মাল। লক্ষ লক্ষ কিলোওয়াটের বিদ্যুৎ প্রবাহ।

দুদিন, শুধু ব্রেকফাষ্ট নয়, দুপুরে লাঞ্চ, রাত্রে খেয়েছি ডিনার। এলোমেলো বহু কথার হিজিবিজি। সেই সঙ্গে দুর্মূল্য পানীয়। শতসহস্র দ্রাক্ষার রুধিরবিন্দু।

কাজের মানুষ এলি দত্ত। বহু দিকে বহু পথে তাঁর কাজ ছড়ান। ঘোড়দৌড় থেকে মোটরদৌড় পর্যন্ত তাঁর দৌড়। প্রচণ্ড কুকুরবাই। কেনেল শো-তে তার অ্যালসেশিয়ান বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবি আঁকাতে যদি ইচ্ছে থাকে, দেখাতে আছে আগ্রহ। বহু ক্লেশ তিনি অক্লেশে মাথা পেতে নিতে পারেন কিন্তু পশুক্লেশ তাঁর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছু ন্যাশন্যাল পার্ক ও গেম স্যাংচুয়ারি গড়ে তোলবার ইঙ্গিত থাকায় আশ্বস্ত হয়েছেন অনেকটা।

একবার সার্কুলার রোডে ঠেলা গাড়ীতে দুপুর রৌদ্রে চিৎকরা কচ্ছপ দেখে লালবাজারে ডি-সিকে ফোন করে হুলুস্থূল করেছিলেন এলি দত্ত। ইংরেজী কাগজে প্রতিবাদপত্র লিখেছিলেন দেড় কলম। প্রচার দপ্তর থেকে সেই পত্রের পেপার কাটিং কয়েক হাত ঘুরে কর্পোরেশনের বিভাগীয় দপ্তরে এসেছিল: টু এন্‌কোয়ার ফোর্থ উইথ। ঠেলা গাড়ীওয়ালাকে লাইসেন্স খোয়াতে হল, জরিমানা হল কচ্ছপওয়ালার।

আমি ভেবেছি অন্য কথা। 'কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স' থিওরীর পেছনে কি পরিমাণ সারমেয় নিধন করা হয়েছিল, সে সংবাদ প্যাভ্‌লোভ দিতে পারতেন। কিন্তু এলি দত্তর ডিনার টেবিলের গড়ন দিতে যে পরিমাণ কুক্কুটের জীবনহানি হয় রসুইখানায়, তার সঠিক হিসাব রাখতে গেলে কেরানী রাখতে হবে। বার্ণার্ড শ আফ্রিকার বুনো কালো মেয়ের মুখ দিয়ে ঝাল ঝেড়েছেন। পাভ্‌লোভকে এক হাত দেখে নিয়েই হয়তো রচনা করেছেন 'অ্যাডভেঞ্চারস্ অফ্ দি ব্ল্যাক্ গার্ল ইন হার সার্চ ফর গড'। হায় রে কপাল, শ'য়ের সাক্ষাত হয়নি এলি দত্তের সঙ্গে। সারা পৃথিবী হয়তো এক নতুন জিনিসের সন্ধান পেত। সে নাটক বিরস হলেও ক্ষতি ছিল না।

তবু আমি আমাকে সংযত করেছি। কুক্কুটের প্রসঙ্গ ভেবে হেসে কুটিকুটি হয়েছি মনে মনে। বরং এলি দত্তর কথায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি। ঠোঁটে প্রফেশন্যাল হাসি টেনে বলেছিঃ আপনার কাছে বসে দু'দণ্ড কথা শুনলে শুকনো এস্থেটিক্ সেন্সের ওপর একটা ইলেকট্রো ওয়েভ্ খেলে যায়। বেশ ঝর্ঝরে লাগে নিজেকে।

খুশীতে ভেঙ্গে পড়েন এলি দত্তঃ আপনি সুন্দর করে কথা বলতে পারেন। আপনাকে আমার বেশ লাগে।

ম্যানিকিওর করা বাম হাতের তর্জনী আমার নিঃশেষিত স্ফটিকের পাত্রাধারের দিকে তুলে ধরে বলেনঃ একটু দি।

মাথা নেড়ে আপত্তি জানাই।

—শুধু গাড়ী চালানোতেই নয়, এ সবেতেও আপনার সংযম কম নয় দেখছি। যোগী পুরুষ; বিয়ে করেননি কেন?

—শক্ত প্রশ্ন। এক কথায় কি উত্তর দেব আপনাকে? বিয়ে আমাকে কেউ করতে চায়নি মিসেস দত্ত।

—এটি আপনার বিনয়। কোন কিছুরই তো অকুলান দেখছি না। আপনার সামান্য ইঙ্গিত পেলে, কিছুমাত্র ইচ্ছে দেখালে......

বাকী কথাগুলো উহ্য রাখলেন। অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন একটু।

—অনেষ্টলি বলুন না মিঃ সেন, বিয়ে করবেন না? অবশ্য এ আলোচনায় আপনার আপত্তি থাক্লে.........!

প্রসঙ্গটা আমার ভাল লাগেনি। এড়াতে পারিনি তবু। বলেছিঃ দেখুন মিসেস দত্ত, আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেচি যে সহজ সরল কিছু আর ধাতে সইবে না। বয়স খতিয়ে দেখে লাভ নেই। পুরো দশকর্ম ভাণ্ডার মাথায় নিয়ে আজ আর জামাই সাজা চলবে না। অপরের জীবন নিয়ে হারজিতের ফ্ল্যাশ খেলব আজ কি করে?

—এ আপনার অভিমান মিঃ সেন। চোট খেয়েছেন নাকি?

—হাসালেন আপনি।

দেওয়ালে গর্তের আগুন উস্কে দিয়ে আবার ফিরে আসবার মুখে এলি দত্ত বলেনঃ পার্সোনাল ব্যাপার! আমি কিছু বলতে চাই না।

—ও প্রসঙ্গ থাক। রাতও হয়েছে।

—আস্থন আমরা খেয়ে নিই।

বেশ কিছু দেরি করেই হোটেলে ফিরি সে রাত্রে। ক'টা দিন স্থন্দর কেটে গেল। এলি দত্তর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি।

ব্যবসায়ী লোক মিঃ দত্ত। গ্যাংটক্ থেকে কে এক স্থব্বার আসবার কথা দার্জিলিং। তাঁর জন্য আরও দু'চার দিন অপেক্ষা করতে হবে। আমাকে কিন্তু ফিরতে হল। মিঃ দত্ত গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন আমার হোটেলে। ড্রাইভার আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল বাগডোগরা।

প্রথম যেদিন এলি দত্ত-র বাড়ী গিয়েছিলাম, সে দিন সাক্ষাৎ পেলাম নেলির। বাড়ীতে কেউ নেই। শুনলাম ঘাসকাটা কল কিনতে গেছেন রাসেল ষ্ট্রীটে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে প্রশ্ন করে মেয়েটি: ইক্স্কিউজ মি! ইউ আর মিঃ সেন আই প্রিজিউম?

বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। সাদা ফ্রকের কাপড়ে অসম্ভব মিতব্যয়িতা। দেহ বেয়ে উরুর কাছে এসে আর নাগাল পাচ্ছে না। মিলিয়ে পরা পশমের একটা ছোট জ্যাকেট। নিয়মের রাজত্বে তার দেহ পূর্ণতা পেয়েছে কি না বলা কঠিন। তবে আজ বাঙলা দেশের বহু পিতা এরূপ মেয়ে ঘরে থাকলে যুগান্তরের একটি বিশেষ শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের উত্তরে অহরহ জবাব লেখেন লোকাল কার্ডে।

সত্যি রুচি আছে এলি দত্ত-র। ঘর সাজানো নিখুঁত। আসবাবপত্র নয়নাভিরাম। বিখ্যাত ছবির বিপুল সমারোহ। বালুচরে এত বড় তাহিতি মেয়ে আমার চোখে পড়েনি কখনও।

মেয়েটি তার নাম বললে নেলি। আমার সামনে বসে দুচার কথা বলছিল। একটা ফোন এল এই সময়ে। স্থন্দর ইংরিজিতে কথা বললে। মায়ের উপযুক্ত মেয়ে।

কিছুক্ষণ পরে ওঁরা এলেন। মিঃ দত্তর প্রাণস্ফূর্তি যেন এবার কিছুটা বেশী দেখলাম। নারকেল তেলের মত শীতে যেন জমেছিলেন দার্জিলিংএ। কি পানীয় আমার মুখে রুচবে প্রশ্ন করলেন। তার পর উত্তরের অপেক্ষা

না করেই নিজের মাথায় একটা যেন কিছু এসে গেছে এই রকম ভাব দেখিয়ে টাইয়ের জোড়ে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। সাড়া পেয়ে একটা পিকীনিজ ভেতর থেকে লাফ দিয়ে এলি দত্তর সোফার উপর এসে পড়ল। সাপের খোলশের মত শাড়ীর উপর বিচিত্রিত একটি শীত বস্ত্র। ব্লাউজের গলার ঘের সামনে ও পিছনে অনেকটা বাড়ানো। লম্বায়ও বেশ খাটো। দুই হাতার উপর শীত বস্ত্রের ইতস্তত: আন্দোলনে শাড়ী আর ব্লাউজের মাঝখানে ফর্সা চব্বিশ ইঞ্চি কটির আভাস পেলাম।

—কি ভাবছেন ?

—আমি ?

—হ্যাঁ, কিছু ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে।

—ভাবছি আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের ঘটনাটা।

—ভাবনার কি আছে। অঘটন তো কিছু ঘটেনি। অনেকক্ষণ বসে আছেন ?

—না, এই কিছুক্ষণ।

—আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার ?

—হয়েছে। আমাকে ঠিক চিনেছে দেখলাম।

—তাই নাকি ? আপনাকে কিন্তু খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে মিঃ সেন।

—কিন্তু তোমাদের ক্লান্তি দূর করবার জন্য আমার কি অক্লান্ত আয়োজন দেখে যাও। আসুন মিঃ সেন। মিঃ দত্ত নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠেন। কক্ষান্তরে আহ্বান করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কুকুরটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এলি দত্ত। —আসুন, সেন সাহেব !

বহুবিধ ব্যবস্থা দেখলাম। আরও দেখলাম এলিই সব। মিঃ দত্ত এলির যতটা পতি, তার চেয়ে অনেক বেশী পি-এ। এলির কোন কথাতেই তাঁর না নেই। মনে হয় যেন কোন দুরন্ত ইম্পীরিয়াল অফিসারের প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের আর একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হাফ শার্ট আর শস্তা

টাইপরা কোন ফুড ডিপার্টমেণ্টের অফিসার একটানা কাঁধ ঝাঁকিয়ে যাচ্ছেন : ইয়েস্ স্যার, ইয়েস্ স্যার।

এলির সঙ্গে তাল দেওয়া কিছুটা শক্ত বৈকি। হাজার সাহেব হলেও মিঃ দত্ত এলির মত কৃত্রিম রোষের সঙ্গে তর্জনী উঁচিয়ে খেঁক শেয়ালের মত কুকুরটাকে বলতে পারেন না : ষ্ট্যাণ্ড প্রপারলি। একটা ডিনার শেষ করতে মিঃ দত্তর কোলের কাঁথা যেখানে তিনবার মাটিতে পড়ে। এলি সেখানে ঠোঁট বাঁচিয়ে সচ্ছন্দে পুরো ডিনার শেষ করতে পারেন; তির্যক চাউনি মেলে রোষ প্রকাশ করেন : বোয়, ফিঙ্গার বোউল্ !

শুধু কথায় বার্তায় চলনে বলনেই নয়, খাতাপত্তরেও এলি তার জায়গা করে নিয়েছেন। নিজের ইচ্ছে মত। কয়েক দিনের আলাপেই এটা আমার চোখে পড়ল। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম : ফরেন মেল আপনার কাছে এত আসে ?

—তা আসে, তা আসে। এর জবাব লিখতেই আমার দিন যায়। কাঠের মুগুরের বাড়িখাওয়া বরফের টুকরোর মত খুশীর হাসি এলির ঠোঁটে ভেঙ্গে পড়ে।

এলি দত্ত বাড়ীতেই কাজ করে থাকেন। একতলার বড় হলের পাশেই সন্ধ্যের পর টাইপের টক্ টক্ আমার কানে এসেছে। তিন আনা করে ট্যাক্স যখন গুণতেই হবে তখন 'সুইপিংস' থাক না পড়ে আর কিছু কাল—ফোনে এরকম নির্দেশ এলিকে দিতে দেখেছি।

এই থেকেই আমি আমার ব্যবসার কথা সুরু করি। সাবধানে, অতি সন্তর্পণে। তবে থ্রোট পেইন্ট লাগাবার সতর্কতা নয়, খোঁচা খাওয়া চোখে কোঁচার খুঁট দিয়ে আলগোছে ভাপ দেওয়ার মত করে।

মিঃ দত্ত একদিন বললেন : সামনের মাসে জানুয়ারীতে আমার অনেকগুলি রিনিউয়াল আছে। ওগুলো ভাই আপনিই দেখে শুনে দেবেন। এলি ব'লছিল

আমাকে আপনার কথা। আপনার কোম্পানীর সঙ্গে আমি এর আগে অবশ্য কোনো কাজ করিনি। তবে আপনি যেখানে আছেন সেখানে কোনো গোলমাল হবে না কিছুতেই। আপনার কোম্পানী বিলিতী তো?

—পুরোমাত্রায়। নামে ধামে কাজে কর্মে কোথাও কোনো স্বদেশী গন্ধ নেই।

—পিনাকী রায় চৌধুরী আপনার খুব সুখ্যাত করছিলেন সেদিন।

—চেম্বার অফ কমার্স……।

চিনলাম।

ওঁর সব কাজ তো আপনিই করে থাকেন। আমি আর আপনাকে কি কাজ দেব……সামান্য লোক।

—চৌধুরী সাহেব আমার কি সুখ্যাত করলেন?

—বললেন অনেক কথা, তবে আপনি যে ইন্‌সিওরেন্স লাইনে একটা অস্ট্রেলিয়ান হর্স, সে কথা আমি কি জানতাম ছাই?

এলি দত্ত হেসে বললেনঃ তবে তুমি কি মরুভূমিতে উটের কথা ভাবছিলে? 'ব্যাক এণ্ড বেলি, আনকুথ এণ্ড ক্লামজি'!

তারপর এক নতুন অধ্যায়।

এলির বাড়ীতে আমি খুব সহজ হয়ে এলাম। নিমন্ত্রণের অপেক্ষা নয়। ব্যাবহারিক ভদ্রতার শাণ দেওয়া বুলির প্রয়োজন রইল না মোটেই। জীবন আরও গতি পেয়ে ছুটে চলল।

এলির তাড়নায় ছবির প্রদর্শনীতে গেছি। এলির মাধ্যমে নতুন পরিচিত পরিবেশে ডিনার খেয়েছি। মেট্রোতে গ্রেটা গার্বো আর রবার্ট টেলরের পুরোন ছবি দেখে রাত্রে বাড়ী ফিরেছি। গল্পে সল্পে বহু রাত হয়ে গেছে অনেক দিন। কোনো এক শ্রীমতীর হাড় কাঁপানো চারিত্রিক উচ্ছ্বৃত্তির ক্লান্তিকর আখ্যান লোভনীয় পানীয়ের সঙ্গে গভীর রাত অবধি 'রেলিশ' করতে হয়েছে। সে কাহিনীর মারাত্মক এক সাস্‌পেন্সের জায়গায় 'জাস্‌ত্‌ এ মিনিত্‌' বলে উঠে গিয়ে এলি দু'এক পাত্র রাম্‌ গিলে আসতো। মিঃ দত্ত সঙ্গে থাকতেন। আবার থাকতেনও না কখনো কখনো।

কিসে যেন পেয়ে বসল এলিকে। আমাকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুই ভাবতে পারে না। দ্বিধাহীন চিত্তে আমি যে কথা বলেছি, অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন তাতে এলি। মুঠো মুঠো কাজ আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। শুধু নিজের নয়, অপরেরও। আমার খাতিরেই বীরেন ভৌমিকের নিমন্ত্রণে মুগ্ধ হয়েছেন। দুর্ধর্ষ কার্লেকারকে বাড়ীতে ডিনার দিয়ে আমার কাজের সিচুয়েশান তৈরী করেছেন। এরকম শুধু একদিন নয়—বহু দিন। একজন নয়, বহুজনকে।

যেখানে দুজনের সই দরকার হয়েছে, তখন দেখেছি মিঃ দত্ত সে সই আগে থাকতেই সমাধা করে রেখেছেন। এলি সবুজ কালিতে আঁচড় কেটে বলেছেন: লাইফ্ ও করেন, জেনারেল ও করেন, আপনার তল পাইনে।

—বাধা কিসের? যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? স্বনামে বেনামে বহু ছাড়পত্র আমার সঙ্গে আছে।

—পারুল সেনের নামে আপনি লাইফ বিজনেস করেন? সিলি প্রশ্ন করব আপনাকে।—এই পারুল সেনটি কে?

—পারুল সেন আমার দিদি।

—দিদি? গুড লর্ড। দিদি বিজনেস ইজ নো বিজনেস।

পারুল সেন বিধবা বোন। জেনারেল বিজনেস করে থাকি নিজের নামে, আর দিদির এজেন্সিতে করি লাইফ ইন্সিওরেন্স।

এলি তার ইমোশনাল কথাগুলোকে যে এত তাড়াতাড়ি কাজে রূপ দেবে ভাবিনি। মুখের অতি সাধারণ সম্মতি যে খাতাপত্তরে পাঁচখানা থেকে সাতখানা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে অনায়াসে, অতটা আশা সত্যিই আমি করিনি।

শুধু মুখরোচক আলোচনার মধ্যে নয়, কবে তার কোন অ্যালসেশিয়ান ডগ্ শো'তে রিংয়ের উপর কোন বিচারকের হাত কামড়ে দিয়েছিল, অপমানে

চেনা মুখ

সঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, ধরণী দ্বিধা হও বলে মাটিতে তাঁর মাথা ঝুঁকে পড়েছিল সে কাহিনীর সূত্রপাতে নয়। নিতান্তই প্রিমিয়ামের অঙ্ক আর নিয়মাবলী শুনতে শুনতে যদি ফোন বাজতো, বিরক্তির সঙ্গে রিসিভারটি নাবিয়ে রেখে আমার মুখে চোখ তুলে বলতেনঃ সবই বুঝলাম। আচ্ছা মিঃ সেন, কোথায় কোথায় সই করতে হবে ?

হুলুস্থুল পড়ে গেল ডিরেক্টার্স মহলে। লোভনীয় চেয়ারে আকর্ষণীয় মাস মাইনেতে চাকুরীর প্রস্তাব এলো। নানা কাজের নানা ভাবের কাগজের স্তুপ জমা হতে লাগল। মাত্র ছ' মাসে যে পরিমাণ কাজ আমার হাত দিয়ে গেছে গত চার বছরে সে পরিমাণ কাজ দিতে পেরেছি কিনা সন্দেহ।

ড্যানিয়েল সাহেবের বাড়ীতে ডিনার। লবষ্টারের হর্ডো আর এস্পে-রেগাস্ সুপ থেকে সুরু করে টার্কি রোষ্ট হয়ে পুডিংয়ে শেষ। নাগপুরের ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার পাই সাহেবের ভয়ানক বদনাম রটেছে। সেখানে কাকে পাঠাবেন, এই সব আলোচনা করলেন আমার সঙ্গে ড্যানিয়েল সাহেব। ডিনার শেষে সোফায় বসে কফির মুখে জানালেন যে তাঁর নিজের নতুন গাড়ীটি আমি ব্যবহার করলে তিনি বিশেষ প্রীত হবেন।

এই সেই ড্যানিয়েল সাহেব। খাস কামরায় কি সূত্রে একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম। অসতর্ক মুহূর্তে টেবিলে হাত দিয়েছিলাম বলে অগ্নিশর্মা হয়ে ফেটে পড়েছিলেনঃ ষ্ট্যাণ্ড প্রপার্লি, ম্যানার্স শেখনি দেখছি।

ড্যানিয়েল সাহেবের গাড়ীটা নিয়েছিলাম বটে কিন্তু চাকুরী নিতে রাজী হইনি। যে রসের সন্ধান পেয়েছি তাতে অন্য সব রসই বিস্বাদ লাগে। ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো আমার কাজের লাইসেন্স রিনিউ করে দ্রুত লয়ে ঝড় বাদলে ছুটে চলতেই আমি অভ্যস্ত। এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘরের কুর্সিতে আমায় শানাবে আজ ?

রামদাস পোদ্দারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ঠিক এই সময়েই। প্রচুর অর্থ। প্রতাপ প্রচুরতর। চটকল পাটকল থেকে সুরু করে ভারী যন্ত্রপাতি, সর্ষের তেলের কারখানা, মায় বাংলা ছবিতেও তাঁর আনাগোনা অবাধ। হাওড়ার গঙ্গার পার থেকে বম্বের সমুদ্রতট পর্যন্ত তাঁর ব্যবসার চলাচল। ভ্যাট ৬৯-এর বোতল উল্টে দেখেছেন কখন? পোদ্দারের চেহারার সঙ্গে যেন তার তুলনা মেলে। ওজন নিঃসন্দেহে মন তিনেক। উগ্র একটা তেলের গন্ধ মাথায়। কথা বলতে বলতে পাঞ্জাবী তুলে ধুতির তলা দিয়ে কোমরে হাত বুলোন! পোড়া ঘায়ের মত তামাটে মেদে রিভলবার একটা গোঁজা থাকে কাত করে।

চেহারায় ভিতরের মানুষের সন্ধান মেলে, এমতে যাঁরা বিশ্বাসী, পোদ্দার মশাইকে দেখলে তাঁরা সে ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হবেন। প্রখর বুদ্ধি। সাপের মত সতর্ক। মুখে হাসির একটা আস্তর।

এখানেই সৌভাগ্যের ভরা কোটাল উঠে এল। সামান্য একটা কাজের জন্য কি পরিমাণ প্রাণপাত করেছি এক কালে। আজ বাড়ীতে এসে সই করা প্রপোজাল ফর্ম পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে পোদ্দারের সেক্রেটারী। পোদ্দার যেন আমার কাছে কাজ করাচ্ছেন না, এলিকে খুশী করছেন।

কাজেই গিয়েছিলাম সেদিন পোদ্দারের বাড়ী। না আঁচালে বিশ্বাস কি খেয়েছি? প্রিমিয়ারের টাকা জমা না দিলে ভরসা কোথায়?

দেশলাইয়ের বাক্সের মত ছ' তলা বাড়ী। বারান্দাগুলো কাঠের ফ্রেমে লাল নীল কাঁচের অবগুণ্ঠনে ঢাকা। সিঁড়ি থেকে ছাত পর্যন্ত মোজেইক্ করা। এক তলার চাতালে বিরাট বিরাট ভাগলপুরী গাই। সারা বাড়ীতে একটা টক টক গন্ধ। দেয়ালে মহাত্মা গান্ধীর অতি পরিচিত লাঠি হাতে নেওয়া ছবির পাশে কোন এক চীনা নটীর দীর্ঘ দেহ কাঁচের ফ্রেমে সাঁটা। গোমাতার দেহ ঘিরে ছত্রিশ কোটি দেবতার সমারোহ।

চেনা মুখ

বসবার ঘরে সুন্দর সোফাসেটা। মাথার কাছে তেলচিটে দাগ পড়ে গেছে চওড়া হয়ে। ঘরের মেঝেতে শাল পাতার টুকরো পাখার হাওয়ায় ঘুরছে।

বসে আছি এমন সময় একজন ঢুকলেন। তবে পায়ে হেঁটে নয়, হামা টেনে। অনেকটা মাকড়শার মত। আমার মতো যে ক'জন অপেক্ষা করছিলেন, সবাই হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও দাঁড়ালুম।

অতি বৃদ্ধ। ক্ষীণ স্বাস্থ্য। ডান অঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। অর্ধউলঙ্গ দেহ। প্রথম শীতের ছোট আলুর মত সারা গায়ে গোল গোল মাংসের গুলি। নিকেলের একটা চশমা। বাইরে থেকে চোখদুটো চারগুণ বড় মনে হয়। শুকনো দড়ির মত পায়ে মলিন ব্যাণ্ডেজ।

দান্তের ইন্‌ফার্ণো-র ইংরেজী তর্জমায় নরকের বর্ণনা আছে। মনে হল তারই কোন বিচ্ছিন্ন চরিত্রের সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ মিলল।

কিন্তু আমার গণনায় ভুল ছিল। ইনিই পোদ্দারের পিতা—ইনিই হচ্ছেন আসল পোদ্দার। সূতো পরাতে সূচের ছিদ্রপথে যেভাবে লোকে চেয়ে থাকে, আমার মুখে চোখ তুলে ইনি থর থর করে কাঁপছিলেন।

কৃতাঞ্জলিপুটে বুকের উপর মাথা নামিয়ে বলি: রাম রাম।

ঘরে ঢুকে এক গাল হেসে পোদ্দার উচ্ছ্বসিত হন। নেহাৎই এই পথে চলেছিলাম, তাই দেখা করে যাবার লোভ সামলাতে পারলাম না, এই রকম জানালাম। ঘাঘু লোক পোদ্দার। সবই বুঝতে পারেন। বললেন: শনিবার বিকেলে আমি চেক দিয়েছি অফিসে। আজ নিশ্চয়ই আপনার কোম্পানীতে জমা পড়বে।

কিছুক্ষণ বসতে হল। আমেরিকা গিয়ে ঘাসপাতা থেকে ঘি তৈরীর মারপ্যাচ শিখে এসেছেন এক ভদ্রলোক। তার সঙ্গে কি সব কথা বললেন। একজন চিত্র পরিচালকের বাছাই করা গল্প নাকচ করে দিয়ে বললেন: রবীন্দ্রনাথ হিট হবে না ভাই, পানু বাবুর কাছ থেকে একটা গল্প নিন না, পানুবাবু খুব

ভাল লেখেন। লোকে আজকাল ভাল গল্প চাইছে। আমাকে বললেন: পান্নুবাবুর গল্প পড়েছেন?

পড়াশোনা আমার সামান্য। পান্নুবাবুর লেখা আমার পড়া হয়নি। আমাকে নীরব দেখে বললেন: পান্নুবাবুর লেখা পড়বেন।

গল্প বাছাইয়ের গল্প চলে। আমি উঠে আসি। দুপুরে ফোন করে জানি কোম্পানীতে পোদ্দারের চেক জমা পড়েছে।

সেদিন এলিকে বাড়ীতে পেলাম না। মিঃ দত্ত একটু নীচু গলায় বললেন: আসুন স্যর।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। একটা সস্তা সচিত্র ইংরিজী পত্রিকা পড়ছিলেন উনি। এলির কথা জিজ্ঞেস করতে মুখ না তুলেই বললেন: স্বয়ং ভগবান তার মতিগতির খবর রাখেন না, আমি আপনি বলব কি করে?

বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। আরও কিছুক্ষণ গেল চুপচাপ। পত্রিকাটা টেবিলে রেখে বললেন: দোষের মধ্যে আমি নেলির পড়াশোনার কথা বলেছি। অতি মাত্রায় আদর পেয়ে সে যে নষ্ট হচ্ছে—হ্যাঁ, এ কথা বলেছি। ব্যস, দু ডজন কাচের গেলাশ ভাঙল, বাবুর্চির চাকরী গেল, আমাকে বলে গেল মীন্। আপনি আমার ঘরের লোক, আপনাকে আর বলতে আপত্তি কি? আই অ্যাম টায়ার্ড মিঃ সেন। জীবনটা আমার সাস্‌পেন্স-য়েই কেটে গেল। ব্যাচিলার মানুষ, খুব ভাল আছেন। এত কমপ্লেক্স নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে?

আমি বুঝি মিঃ দত্ত সহজে এসব কথা ভাঙ্গার লোক নন। কিছু একটা ঘটেছে। তবু সহজ করে নিয়ে বলি: এ সব হয়েই থাকে। অনেক কিছুই চোখে পড়ে কিন্তু দেখতে নেই।

—আপনাকে আমি কি বলব মিঃ সেন, বলে লাভও কিছু নেই। দেখতে নেই বলছেন, তাই বলে আমি তো অন্ধ হয়ে যেতে পারি না।

পরিচিত গাড়ীর হর্ণ বাজল বাইরে। মিঃ দত্ত বলেন: যাকগে, মরুকগে যাক। ঐ বোধ হয় এলো।

আমি একটু অবাকই হলাম মিঃ দত্তর ব্যবহারে। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন এলিকে দেখে। হেসে বললেন: মিসেস গ্যায়গে ফোন করছিলেন এক্ষুনি।

খুশীতে ভেঙ্গে পড়ল এলি: উনি তাহলে কোলকাতায় ফিরেছেন—সো লাভলি। আমাকে দেখে বললেন: দু'দিন ছিলেন কোথায়? বসুন আসছি।

নেলির গাল দুটো টিপে দিয়ে মিঃ দত্ত বলেন: নটি গার্ল। মুখটা কাঠবেড়ালীর মত কিচমিচ ক'রেছে কেন রে? আখরোট খাচ্ছিস বুঝি?

ধূসর বর্ণের জিভ বার করে নেলি চকোলেটের লেই দেখালে। তারপর বললে: ডার্টি! আমার গালটা কি করলে বল তো?

মিঃ দত্ত নেলিকে কৃত্রিম ভয় দেখাতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেললেন। বলতে থাকেন তারপর: আমার বুলবুলিটা কিট্‌মিট্‌ করছে, কুট্‌কুট্‌ করছে কেন রে?

কি দুরন্ত জোড়াতালি।

কিছুদিন পরেই বোধ হয় মোহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এলির কিছু কাগজপত্র পেঁছুতে এসেছিল আমার কাছে। উচ্ছ্বাসের মাথায় সেদিন চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, আরে মোহিনী, তুমি?

—চিনতে পারছ দেখছি।

—কিন্তু তুমি মোহিনী.........। আমার যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব।

—আমি চিনেছি ঠিকই। দত্ত সাহেবের বাড়ীতেও দেখেছি কবার।

—কি অদ্ভুত যোগাযোগ। অনেক দিনের ব্যাপার। আছো কেমন?

মোহিনী আমার কলেজের সহপাঠি। দিনের পর দিন মোহিনীর বাড়ীর চিলেকোঠায় পরীক্ষার পড়া করেছি। এই মোহিনীই প্রথম আমাকে বিড়ি খাওয়াতে শেখায়। কলাই করা থালায় তেল নূন দিয়ে মুড়ি খাওয়া ভোলা মুস্কিল।

মোহিনী বি-এ পাশ করলে। আমি ফেল করলাম। ইতিমধ্যে সাংসারিক বিপর্যয়ের জোয়ারের মুখে কুটোর মত ভেসে গেলাম। অনেককে ছাড়তে হল। মোহিনীর সাক্ষাৎ মেলেনি সেই থেকেই। এই সেই মোহিনী।

শুনলাম পাশ করেই চাকরীতে ঢোকে মোহিনী। দত্ত সাহেবের অফিসে আর ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়ীতে দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছে। বাবা অন্ধ। মা নেই। বিয়ে করেছে। বোনের বিয়ে বাকি।

কিন্তু মোহিনী স্বাভাবিক হতে পারলে না। আমি যতই এগুতে চাই, সমান দূরত্ব রেখে সে পেছনে হাঁটে। বাড়ীতে গিয়ে দেখা করবার আগ্রহ প্রকাশ করি। খুব একটা সাড়া পেলাম না দেখলাম।

যে কাজে এসেছিল মোহিনী সে কাজ সমাধা হলো। চা খেয়ে মোহিনী চলে গেল।

মোহিনীকে এর পরেও আমি দেখেছি। ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়ীতে। দৈবাৎ কখনো দেখা হলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসত।

একদিন পথে কুড়িয়ে পেলাম মোহিনীকে। বাসের অপেক্ষায় ছিল। গাড়ীতে তুলে নিলাম। শুধু বন্ধুত্বের দাবিতে নয়, মোহিনীকে আমার হাতে রাখাও দরকার। ফাইলের গুহ্য রহস্য। দরকার হওয়া বিচিত্র কি?

মোহিনীর বাড়ীতে গেলাম। বিব্রত মোহিনী ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি স্বরু করলে। খাকি হাফ্ প্যাণ্ট পরা যে ছেলেটা এতক্ষণ আলেকজাণ্ডারকে সামনে রেখে শতদ্রু ও বিপাশার তীরে হানা দিচ্ছিল, এক রকম দৌড়েই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এই সেই মোহিনীর বাড়ী। পুবদিকের সামনের বাড়ীর একটি মেয়ে কাপড় শুকোতে আসত ছাতে। আলশে ধরে দাঁড়িয়ে আমাদের পড়া দেখত। তখন পা ফাঁক করে ভ্রূ উঁচিয়ে বুক টান করে বিড়ি খেত মোহিনী। টুকরো ইঁটের সাহায্যে চিঠি চালাচালিও করেছিল ওর সঙ্গে। 'মিড্ সামার নাইট্‌স্ ড্রিম' মুখস্থ করছি তখন। ক'ষে প্রেমপত্র লিখে দিয়েছিলাম মোহিনীকে।

ঘরে কেউ ছিল না। তবু বুঝলাম আমি একা নই। দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে কয়েক জোড়া চোখের ইশারা পাচ্ছিলাম। নড়বড়ে একটা টেবিলের ওপর শাড়ীর পাড় জোড়া দেওয়া একটা ঢাকনা দেওয়া। হংস

মিথুনের সূচীকর্ম। দেয়ালে তুলোর বক। বহু পরিচিত পিতৃবন্দনা শাদা লংক্লথের ওপর লাল ডি এম্ সি সুতোয় তোলা। দৈনিক বসুমতীর স্তুপ একদিকে। টেবিলের ওপর পড়ার বই, সিনেমা নটীর মুখ সামনে করে মলাট দেওয়া। শ্বেত পাথরের একটা পেপার ওয়েট। তাতে খোদাই করা-'নো পেইন, নো গেইন'। উল্টোমুখো ইঁটের ওপর চৌকিতে শতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা গোল করে পাকানো। দেয়ালে ফ্রেমে আঁটা একটা ফ'টোকে ঘিরে ডজন খানেক ক্যালেণ্ডার।

হাফ্‌প্যাণ্ট পরা ছেলেটা মাটির খুরি আর শালপাতার ঠোঙ্গা আমার চোখ এড়িয়ে ভিতরে নিয়ে গেল।

মোহিনী এল। কাঁসার থালায় এল জল খাবার। থালার ধারে ছু অক্ষরে নাম খোদাই করা 'চারু'।

মোহিনী খানিকটা সহজ হয়ে এল। অনেক কথা বলল। আমার সম্পর্কে প্রচুর চাপা কৌতূহল দেখলাম।

আমার অনেক কাজে লেগেছে মোহিনী। প্রতিদানে আমি কিছুই করতে পারিনি তার জন্য। ভুলেও কোনোদিন সে ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়ীতে আমার সঙ্গে কথা বলেনি। মোহিনীর আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

বছর ঘুরে এল। এলি দত্ত আর এলি দত্ত। বহু কাজের মধ্যে হাজার তাড়াহুড়ো সত্বেও যেতে হয়েছে ক্যামাক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল এদের সঙ্গে। এলির শক্ত খুঁটি ধরে কত লোককে জেনেছি! আমার নিজের দম যেখানে ফুরিয়ে গেছে, সেখানে এলি দত্ত-র অক্সিজেন সিলিণ্ডার কাজে লাগিয়েছি। রথী মহারথী ঘায়েল করেছি অক্লেশে।

সেদিন বাড়ী ফিরে শুনি এলির ফোন এসেছিল দুবার। কাজে অকাজে এলির ফোন। পরদিন তাই ছুটতে হল।

মুখ ছড়ানো ধামার নীচে চার খানা পা জুড়লে যে চেহারা হয়, সেই রকমের একটা বেতের চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিলেন। আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠে এলি বলেন: কোথায় কোথায় ঘুরে মরছিলেন? সেই যে গেলেন আপনি……!

—ঘুরে মরাই তো আমার কাজ। পরমাণুর মাঝে থাকে একটা প্রোটন, তাকে কেন্দ্র করে পাক খেতে খেতে অদ্ভুত দ্রুত বেগে ঘোরে ইলেকট্রনের দল। ইলেকট্রন ঘোরে নিয়মের রাজত্বে, আর আমি ঘুরে মরি এর ওর তার হুকুম সামলাতে। বলুন মেমসাব, কোন বার্তা রটাতে হবে কার দ্বারে দ্বারে।

—মহাশয়ের পারদর্শিতা শিল্পসাহিত্যেই শুধু নয়, বিজ্ঞানেও।

—ভয় পাচ্ছেন নাকি ?

—আলবাত। আমার হাতের এই সুন্দর প্রেমের কবিতার বইটিকে যদি আপনি বলেন, এ বই বই নয়, কোটি কোটি বিদ্যুৎ মণ্ডলীর সমষ্টি, ভেতরের তেজে সর্বদাই হাঁটাচলা করছে, তাহলে তো বিপদ। আমার কানের সোনা খুলে ফেলে রূপো বা সীসের দুল পরাতে আসবেন শেষ কালে। বলবেন, সোনা সীসেতে বিশেষ কোনো ফারাক নেই মিসেস দত্ত। প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রনের সংখ্যার কম বেশী আর দূরত্বের ফেরে পড়ে সোনা সীসের হাল হয়েছে। সীসের দুলই পরুন, মানাবে ভাল। তাহলে আমি ভয় পাবো না বলতে চান ?

মিঃ দত্ত পর্দা সরিয়ে এগিয়ে এলেন। কে তোমাকে সীসের দুল পরাতে চাইছে, এলি ? না, মিঃ সেন, এ আপনি ঠিক করছেন না। তুমি কি বলছ এলি ? আমি তো সোনা রুপোর কথা শুনে আমার রিভলবার বার করতে চলেছিলাম।

উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠি সকলে। বারান্দা থেকে পর্দা সরিয়ে ভেতরে আসি। চায়ের টেবিলে এলি বলেন : তাহলে কি ঠিক করলেন, মিঃ সেন ?

—ঠিক ? কিসের ঠিক ?

—অবাক করলেন দেখছি। সব কিছু আপনার হাতে তুলে দিতে হবে ?

—বললেই হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিতে পারি।

—হেঁয়ালি রাখুন মিঃ সেন। দিল্লী যাচ্ছেন কবে ?

—কাল। অবশ্য আপনি বললে সেটা স্থগিতও রাখতে পারি।

—আজকে আপনি ভয়ানক বাজে বকছেন।

মিঃ দত্ত বলেন : আসছেন আপনি কসৌলিতে ?

—ইচ্ছে আছে।

এলির জবাব এল : ইচ্ছে-টিচ্ছে বুঝি না। আমাদের কটেজ রেডি। আপনার অপেক্ষায় থাকবো আমরা।

কসৌলির প্রসঙ্গ শেষ হল। চা শেষ করে বলি : আপনাকে কিন্তু একটা খবর এখনও দিতে পারিনি। ভয় হচ্ছে, সেটা হয়তো বাসী হয়ে গেছে আপনার কাছে।

—হেঁয়ালি রাখুন।

—আপনার আঁকা 'রিফ্যুজি' ছবিটার প্রচুর প্রশংসা করেছেন প্রফেসর জীদ্। পকেট থেকে খুলে ধরলাম পত্রিকাটা। হাত থেকে সেটা তুলে নিয়ে এলি বলেন : ইউ আর গ্রেট। আপনি ছাড়া এ সংবাদ কে পৌছাবে আমাকে বলুন! এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন পুরো প্রবন্ধটা। আমি বলি : ডাষ্টবীন,কুকুর আর ঠেলা-গাড়ীটা থাকাতে ছবিটা রিয়ালিষ্টিক হয়েছে। জীদ্ সেটাও উল্লেখ করেছেন।

অসম্ভব খুশী হলেন। খুশীর আতিশয্যে কথা সরছিল না তার মুখে। মিঃ দত্তর চোখের পাতা ঘন ঘন পড়ছে।

দিল্লীর কাজ শেষ হতে কিছু সময় লাগল। কসৌলি পৌছুতে তাই দেরি হয়ে গেল। কোন্ কটেজে ওদের পাব, কোথায় খুঁজলে সন্ধান মিলবে ভাবছিলাম। ডাকবাংলোর চৌকিদারের মুখে শুনলাম, কয়েকবার খোঁজ হয়েছে আমার। সচ্ছন্দে সে নিয়ে যেতে পারে আমাকে সেখানে। ওদের কটেজ তার চেনা আছে।

নিরিবিলি পাহাড়ে আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ। পাইন অরণ্যের অপূর্ব শোভা। মিঃ দত্ত পথেই আমাকে গ্রেপ্তার করলেন। ডাকবাংলোয় হানা দিতে তিনি আসছিলেন নিচ থেকে।

পরদিন সিমলে। আমি, ওঁরা দুজনে। আর সঙ্গে নেলি। দেহাতি লোক কলকাতায় প্রথম এসে দেখে মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া। তারপর কালীঘাটে সিঁদুর মেখে আলিপুর চিড়িয়াখানায় করে দিন শেষ।

আমাদেরও অনেকটা সেই অবস্থা। ভোরবেলায় জাখু পাহাড়ে সূর্যোদয়। স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে চক্কর। শতদ্রুর কোলে 'তপ্ত পানি' দেখে ফরেষ্ট রেষ্ট হাউসে রাত্রি যাপন।

দুদিন এলোপাথারি ঘোরাঘুরিতে মিঃ দত্ত কিছুটা কাহিল হয়ে পড়লেন। রক্তের চাপ বেশী দেখে বিশ্রাম নিতে বললেন ডাক্তার। সকাল থেকে এলিও আবার বিছানা নিলেন। একমাত্র সাইনাসই নাকি তাঁকে কাতর করে মাঝে মাঝে। ওষুধ দেখলাম ওঁর সঙ্গেই থাকে। হেসে বললেন: আমার জন্য ভাববেন না মিঃ সেন, কালই আমি ঠিক হয়ে যাব। আপনারা কেন আটকে থাকবেন ঘরে? নেলিকে বরং ঘোড়দৌড়টা দেখিয়ে আনুন অ্যানানডেলে।

সবটাই আপেক্ষিক। যে গুণে গুণান্বিত হয়ে আজ আমি এলির কাছে হয়েছি ইন্‌ডিস্পেন্সেবল্, অন্য কোনো কিছুতে মিঃ দত্তর কাছে হয়েছি ইণ্টারেষ্টিং। আমি যে একটা নেমিছেমি লোক নই, এ বিশ্বাস নেলির বদ্ধমূল হয়েছে পুরোনো ডাক টিকিট আমি সহজেই মুঠো মুঠো জোগাড় করতে পারি দেখে। আমার সঙ্গে একা বেরুনোর আগ্রহও বোধ হয় সেই কারণেই।

লোকজনের ভীড় বেশ। ঘোড়ার সঙ্গে আমরাও কিছুটা ঘুরপাক খেয়ে ফিরে যাব এই রকম ঠিক ছিল। নেলিও তাতে রাজি। তবে শর্ত ছিল একটা। বাড়ী ফিরে তার ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌লস্ ঠিক আছে কিনা দেখে দিতে হবে। কালকেই নাকি সেগুলো পাঠানোর শেষ দিন।

সিগারেট ধরিয়ে লাইটার পকেটে পুরে পাশে তাকিয়ে হঠাৎ দেখি নেলি নেই। পেছনে তাকাই, পেলাম না নেলিকে। পা চালিয়ে পেছনে ফিরে আসি। ডান দিকে তাকাতেই নজরে পড়ে, নেলি এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। তাঁর পাশে মোটা চুরুট মুখে আর একজন। এগিয়ে আসি। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, দীর্ঘকায় ভদ্রলোক আর কেউ নন, ডাঃ সরকার।

ভারতে যে কজন প্রথম শ্রেণীর সার্জ্‌ন্ আছেন ডাঃ সরকার তাঁদের একজন। আমার সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে। এই অতিবিনয়ী দীর্ঘকায় লোকটির সঙ্গে কয়েক জায়গায় কয়েকবার সাক্ষাতও হয়েছে। রেঙ্গুন থেকে ফেরবার পথে প্লেনেই আমাদের শেষ দেখা।

ঘোড়দৌড়ের শখ আমার নেই। নেলিরও দেখলাম ডাঃ সরকারকে দেখেই তার সে সব ইচ্ছে উবে গেছে। আমার সঙ্গে ডাঃ সরকারের পরিচয় আছে দেখে নেলি যতটা বিস্মিত হল তার চেয়ে খুশীই হল বেশী।

চেনা মুখ

আমি ডাঃ সরকারকে ভয়ানক কম কথার লোক বলে জানতাম। আমাদের পরিচয়ের দাবি নিয়ে বড়জোর স্যাণ্ডাল পয়েন্টে কফি খাওয়ানোর অনুরোধ আসতে পারে। ডাঃ সরকার আমাকে কিছুটা অবাক করলেন। একটা হাত নেলির কাঁধে। কেমন যেন একটা অসহায় অনুরোধ: পথে পথে ঘুরে কি হবে স্যার, আমার ওখানে চলুন, আড্ডা দেওয়া যাবে।

আমি বলি: আপত্তি কিসের, আপনার সঙ্গে যে এখানে এভাবে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি! সৌভাগ্য!

—আপনি ভুল করলেন মিঃ সেন! দেখা আমাদের হতেই হবে। আমি আপনি তা ঠেকাব কি ক'রে?

ডাঃ সরকারের সঙ্গে চুরুট মুখো ভদ্রলোক একটু বেশী কথা বলেন। এক দমে অনেক কথা ব'লে গেলেন: তখন থেকেই চেনা চেনা মনে হচ্ছে! ঠিক ধ'রেছি, গ্রাণ্ডে উঠেছেন তো, আমরাও, ওয়েদার বেশ ভালই যাচ্ছে! গত বছর কি অসম্ভব দুর্দিন গেছে এসময়ে। এবার আমরা খুব লাকি। তাহলে ঐ কথাই রইল ডাক্তার, আমার স্ত্রীকে আপনার কথা বলবো! নমস্কার, এক হোটেলেই আছি, দেখা আমাদের হবেই!

ভদ্রলোক চ'লে গেলেন। শুনলাম ভদ্রলোক এটর্নী। কলকাতার একজন সাক্সেসফুল রাজনৈতিক নেতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

অ্যানানডেল থেকে ডাঃ সরকারের হোটেল। পথে ডাঃ সরকার নেলির সঙ্গেই কথা বললেন বেশী। ডাঃ সরকার যে নেলিদের সঙ্গে এত পরিচিত তা আমার জানা ছিল না। সুন্দর ব্যবহার ডাঃ সরকারের। তাঁর অস্ত্রোপচারের নিপুণতার বহু কাহিনী চালু আছে বাজারে। সে সব গল্পের মত।

আমাকে লোকে লম্বা বলে জানে। তবু ডাঃ সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে মুভি ক্যামেরার মত আমার মুখটাকে টিল্ট্ করবার দরকার হয়। ডাঃ সরকার নিঃসন্দেহে ছয়-পাঁচ বা ছয়-ছয়। কলকাতা শহরে সোম, বুধ, শুক্রবার—নানা হাসপাতাল আর নার্সিংহোমে মানুষ কেটে বেড়ান।

ত্রিদিবেশের মুখেই শুনেছিলাম সেদিন। শারীরিক দুর্বলতা দেখে সব সার্জ্ন্ ফেরত দিয়েছেন যে রোগিণীকে, দীর্ঘ সময় অজ্ঞান করে রাখলে জ্ঞান আর নাও ফিরে আসতে পারে এই ভয়ে—সেখানে রোগিণীর উদ্ভ্রান্ত পিতাকে ভরসা দিয়েছেন ডাঃ সরকার। ত্রিদিবেশ ছিল সেখানে। সে এক্সরে এঞ্জিনীয়ার। তাকে বলেছিলেন ডাঃ সরকার: ভালই হল, দেখা যাক আপনার 'রেডিওটোমে'র দৌড়।

রোমহর্ষক ঘটনা। ক্লোরোফর্ম করলেন না; অ্যানাস্থেশিয়া দিয়েই বিপদের ঝুঁকি নিলেন। পোর্সেলিনের পেন্সিলের মত যন্ত্রটা হাতে নিয়ে রোগিণীকে হেসে বললেন: আপনি খুব সিনেমা দেখেন, না?

সোয়া দু ঘণ্টায় অপারেশন শেষ হল। কয়েক ফোঁটা রক্তে ভেজা শাদা তুলো ত্রিদিবেশের চোখের ওপর তুলে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ডাঃ সরকার বলেন: 'রেডিওটোম' আমায় একটা আপনি না দিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।

মাত্রা কিছু ছাড়িয়ে গেল। নেলি কখনও আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে না। এত ঘনিষ্ঠ হয়ে, এত কাছে আসতে দেখিনি কখনও। আমার দেওয়া বহু দুষ্প্রাপ্য ডাক টিকিটে তার অ্যালবাম ভরে উঠেছে। সুতরাং আমার যে কোন অসাধ্য কাজ থাকতে পারে না, সেই কথাই সে হেসে হেসে ডাঃ সরকারকে বলছিল। নেলিকে নিয়ে ডাঃ সরকারের অতি সাধারণ হাস্যকৌতুকে আমি খুশীও হচ্ছিলাম, হেসেও উঠছিলাম মাঝে মাঝে।

ফেরবার পথে নেলি আমাকে তাজ্জব করে দিলে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল আমার সে ধাক্কা সামলাতে। অদ্ভুত অনুরোধ নেলির, করুণ আবেদন মেশানো।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে ডাঃ সরকারের সঙ্গে দেখা আমাদের, দীর্ঘ সময় যে কাটিয়ে এলাম তাঁর হোটেলে—এ সবই সে তার মায়ের কাছে চেপে যেতে চায়। আমাকেও তাই করতে বলে। পরের কাজে আমার বিনা কারণে কৌতূহল হয় না। তবু সবটা গিলতে সময় লাগল আমার।

নেলির অনুরোধ রাখলাম। মিঃ দত্তর প্রেসার আর নেলির সাইনাসের জন্য উদ্‌বিগ্ন হয়ে আমাদের বিলম্বের প্রসংগটা এড়িয়েই গেলাম সম্পূর্ণ।

দূর থেকে নেলি শুধু শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে সন্ধ্যেতে। কি অপরাধ করেছে নেলি?

পরদিন সকালে নেলিকে চায়ের টেবিলে না পেয়ে এলি বলেঃ অচেনা জায়গা, নেলিকে একটু দেখুন-তো মিঃ সেন। এত দুষ্টু মেয়ে। বেড়ানোর শখ আর মেটে না।

নেলির দেখা পেলাম মল রোডে। তবে নেলি একা নয়, ডাঃ সরকারকেও দেখলাম সঙ্গে। কৌতূহল কেমন যেন বিস্ময়ে গিয়ে পৌঁছয়। একটু যেন লজ্জিত মনে হল ডাঃ সরকারকে। হাবভাবে মনে হল যেন ধরা পড়ে গেছেন। আমতা আমতা করে কি যেন বললেন। এই কি সেই ডাঃ সরকার, দিনে ডজনখানেক মানুষ না চিরলে যাঁর হাত নিশপিশ করে। নেলিকে আমার হাতে তুলে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিলেন।

হোটেলে ঢুকতে গিয়ে দেখি সামনেই এলি। কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করলেন নেলির ওপরে। আমি না থাকলে কি যে একটা অঘটন ঘটত, এই সব কথা বললেন।

হ্যালো! হ্যালো!

পাশে তাকাই। নিখুঁত পুরো স্যুট। আধ ফুট একটা চুরুট দাঁতের মধ্যে গোঁজা। কালকের সেই অ্যাটর্ণী।

—আবার বেরুবেন বেরুবেন বলে মনে হচ্ছে। কাল ডাঃ সরকারের ওখান থেকে ফিরলেন কটায়? বাই দি বাই, আপনি হয়ত বলতে পারবেন ক্যারিগনানোয় উঠতে ওয়াটার ওয়ার্কসের ইঞ্জিনীয়ারের পারমিশান লাগে নাকি? মল রোডে কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম আপনাদের, ভাবলাম ডাঃ সরকারকেও পাব আপনাদের এখানেই। উনি ফিরে গেলেন বুঝি ওঁর হোটেলে? দেখি আবার উনি উঠলেন কিনা!

...আটটার আগে ঘুম ভাঙ্গে না, বেড়াবেন কখন? কি বিদ্‌ঘুটে জায়গা মশাই, এ যেন ঘাটশিলায় এসেছি। সারা সিমলেতে অষ্ট্রেলিয়ান কর্ণ ফ্লেক্ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার স্ত্রীর আবার......দেখি......দুপুরে যাচ্ছেন নাকি নালদেরায়?

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে প্রচুর ধোঁয়া ছড়িয়ে একগাল হেসে বললেন এলির দিকে ফিরেঃ নমস্কার! পরে আলাপ হবে। উনি তো কাল থেকেই আমাকে খোঁচাচ্ছেন!

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

এলিকে বলি, আজ আপনাকে অনেক হাল্কা দেখছি। কিছুটা ভাল আছেন আজ?

পলকহীন চাউনি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। ভাষা নেই যেন এলির ঠোঁটে। ধীরে ঘরে গেলেন। আমি পেছনে। সিগারেট হাতাই পকেটে।

ঘরেও একটা গুমোট ভাব ভরে উঠল। আকাশ পাতাল ভাবতে থাকি। কোণের চেয়ারে এসে বই খুলে বসি।

বহুক্ষণ পরে মিঃ দত্তর গলা পেলাম: পড়ছেন বুঝি। সামনের চেয়ারে এসে বসলেন।

—এলি আজ কসৌলি ফিরে যাচ্ছে……শরীরটা আমার আজও খুব ভাল নেই……কার্লেকারের সঙ্গে দুপুরে আমার কিছু কাজ আছে…… আমি আসছি হাতের কাজটি সেরেই। এলির কি হয়েছে বলুন তো?

আজ থিয়েটার দেখবার কথা ছিল…টিকিট আমার সঙ্গেই আছে… হঠাৎ রুটীন পালটে গেল কেন বুঝলাম না। মিঃ দত্তকে বলি: আমি তো কিছু জানি না মিঃ দত্ত।

—আপনাকে আবার দিল্লী যেতে হবে, না?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—হপ্তা খানেক পর, পনরই।

ভালই হল। আপনি এলির সঙ্গে নেলিকে নিয়ে কসৌলি ফিরে যান। আপনি সঙ্গে থাকলে আমার ভাল লাগবে।

অবাক আমি এলির ব্যবহারেও কম হইনি। কথাবার্তায় মনে হল আমাদের আজ কসৌলি যেতে হবে, এ যেন আমাদের আগে থেকেই জানা থাকা উচিত ছিল।

চেনা মুখ

মুখের ওপর চোখ তুলে নয়, ম্লান হেসে চায়ের পটের পশমের জামা খুলতে খুলতে বলেন: আপনার তো কিছুই মনে থাকে না। উটমার্কা সিগারেট আমি আনিয়ে রেখেছি। ওখানে বোধ হয় আপনি ওসব কিছুই পাবেন না।

সিমলে থেকে কসৌলি। পথে অতি সাধারণ বাক্যালাপ। উচ্চলয়ে নয়, নিচু পর্দায়।

গুমোট ভাব কসৌলিতে এসেও কাটল না। কটেজটা শাসনে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এলি। কাউকে কিছু না বলে পথে বেরিয়ে পড়ি। পথ গোলমাল হয়ে গেল। তাই একই জায়গা তিনবার ঘুরে এলাম। লোকজন কম। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে কাবার হয়ে গেল।

—এভাবে কষ্ট দিয়ে আপনি কি মজা পান বলুন তো? অজানা অচেনা জায়গা, আমি ভেবে ভেবে সারা। কোথায় কোথায় ঘুরছিলেন?

—পথ ভুল হয়েছিল। আঁকাবাঁকা পথে ঘুরে ঘুরে মরছিলাম। দোষ আমার নয়, পথের।

—ঠাণ্ডা লাগিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেন দেখছি।

হুইস্কির ঝাঁঝালো গন্ধ এলির ঠোঁটে। ভেতরের ঘরে আলো নেভানো। নেলি বিছানায়। চেয়ারে এসে সিগারেটের টুকরো ডুবিয়ে দিই ছাইদানে। এলির পরণে লাল নাইট গাউন। সোনালি রঙের সুন্দর কাজ তাতে। মাথার চুলগুলো আঁট করে পেছনের ক্লিপে আটকানো। টসটসে মুখটা আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। বর্ণনা আমার ভাল আসে না। তবে দীর্ঘাঙ্গিনী এলির সব কিছু সোজা সোজা। খাড়া আর লম্বাটে, গোল বা তরঙ্গ রেখা নয়, বোত্তিচেল্লীর টান-টোনের মত। সহজ কায়দায় অবিমিশ্র নির্লিপ্ততার সঙ্গে এক পাত্র এগিয়ে দিয়ে আর নিজেরটা কোলে তুলে বলেন: ডাঃ সরকারের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি?

কেমন যেন থতমত খেয়ে যাই আমি।

—আপনি ফাম্বল্ করছেন।

আমার জবাব তবু বার বার বাধা পেল।

আমার বহু পরিচিতের মধ্যে ডাঃ সরকারও একজন, এই কথাই আমি জানাই।

স্ফটিকের পাত্র টেবিলে নামিয়ে রেখে ছোট্ট করে তাকান এলি: আপনার উইট্ আছে জানি, ক্লেভার ম্যান।

—বুঝতে পারছি না।

—বুঝবেন কি করে? সব না শুনলে কি বোঝা যায়?

—দেখুন, অপরের সম্পর্কে আমার আগ্রহ কম। ওটাকে আমি জানি ডাল্লার।

—সেই তো, সাবলাইম টু রিডিক্‌ল্—জাষ্ট এ ষ্টেপ্। সেই কারণেই পুরোটা আপনার শোনা দরকার।

এলির নিঃশেষিত পাত্র আবার ভরে উঠল। পা গুটিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসলেন। বাইরে পাইনের মাথায় ঝোড়ো হাওয়া। কাটা পর্দা দুলছে। দিগন্তে ঘোলাটে চাঁদ। মেঘের ছানি পড়েছে তাতে। আমার সারা দেহ তিরতির করছে।

এলির মুখে পুরোনো এক বিস্মৃত কাহিনীর গ্রন্থিমোচন হল :—

এলি দত্তর পিতা করুণাকেতন মুখার্জী ছিলেন বীর পুরুষ। ভাস্কর যেমন হাতুড়ি আর ছেনির সাহায্যে কঠিন পাথরের মধ্যে থেকে মানুষ কুঁদে বার করে, করুণাকেতনও তাঁর সংগ্রামী জীবন গড়ে তুলেছিলেন সেই নিপুণতায়। ধাপে ধাপে উন্নতির সোপানের শেষে যেখানে তিনি উঠেছিলেন, শুধু বাঙ্গালী কেন, কম ভারতীয়ই সেখানে পৌঁছুতে পেরেছেন সে সময়ে।

যুদ্ধ আর মারণাস্ত্রের অতি আধুনিক কলাকৌশলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে এলিকে পাঠিয়েছিলেন ইওরোপে রঙ আর তুলির ব্যবহার শিখতে। এলি শৈশবেই মাতৃহারা।

ডাঃ সরকার তখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পড়া শেষ করে গেছেন এডিনবরা কাটাছেঁড়ায় হাত পাকাতে। বারবার ছুটে ছুটে আসতেন লণ্ডনে। এলির কাছে। পড়ে থাকত রঙ আর তুলি, থাকত পড়ে ছুরি কাঁচি। ব্ল্যাকপুলে

চেনা মুখ

বেড়াতে গিয়ে শান্ত এক পরিবেশে এলির আঙুলে আংটি পরিয়ে বুকে তুলে নিয়েছিলেন ডাঃ সরকার।

সারা ইউরোপে তখন সাজোসাজো রব। দিগ্‌ দিগন্তে ঘনঘটা। এলির তুলির রঙ শুকিয়ে গেল। কলমের নিবে মনের কত কথা কাগজে নেবে আসতে লাগল। প্রেমের কবিতা পাতি পাতি করে খুঁজে চলেছে তখন এলি।

এলির অনুরোধে তার বেইস্-ওয়াটারের ফ্ল্যাটে ডাঃ সরকার মাঝে মাঝে করতেন রাত্রি যাপন। নির্জনতার আনাচে কানাচে ভরে উঠল ওরা দুজনে।

বেশ কিছুদিন পরে ডাঃ সরকার ফিরে চলেছেন এডিনবরায়। গলায় টাই বেঁধে দিল এলি। বাটন্‌ হোলে শাদা গোলাপ গুঁজে দিয়ে নিচু গলায় জানালো নতুনের পদধ্বনি শুনছি আমার দেহে। আমার যেন কেমন কেমন লাগে ডার্লিং।

ডান হাতের বুড়ো আঙুল দাঁতে কামড়ে খুশীতে ভেঙ্গে পড়লেন ডাঃ সরকার। এলিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন: দুষ্টু কোথাকার, সারাদিন বলনি কেন? কলাগাছ নাই বা থাকলো, নাই বা রইলো বাসর ঘর, সরস্বতী পুজোয় কলকাতার বকুলবাগানের এক ফাজিল ছোকরা এখানে শাঁখ জোগাড় করেছে দেখলাম। আমাদের বিয়ে যে কায়দাতেই হোক, শাঁখ বাজানোয় বাধা দিতে পারবে না তুমি।

সেই দিনই ফেরবার পথে বাজনা বেজে উঠলো চারিদিকে। তবে শাঁখের নয়, সাইরেণের। ক্যালে বা নরওয়ের ডাঙ্গা থেকে হুলো বাড়াতে আসছে জর্মন বোমারু। ছেলে বুড়ো সব চলেছে এক দিকে। কাছাকাছি শেল্টারে।

শূয়োরের চামড়ার মত অন্ধকার ঝুলছে সারা লণ্ডন শহরে। কোথাও আলো নেই। উদ্‌ভ্রান্তের মত কুইন্স রোড টিউব স্টেশনের শেল্টারে আশ্রয় নেয় এলি। চূড়ান্ত অগোছাল মানুষ। ভয়ে দিশেহারা লোকগুলো নিজের নিজের সংসার ঘিরে বসেছে। এলি নিজেকে কিছুটা পেছনে চালান করে দিতে চেষ্টা করলে।

—আপনি এইখানে আসুন।

বাংলা কথা। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপুনি ধরেছে সারা দেহে। ফিরে তাকাতে অপরিচিত ভদ্রলোক হেসে বলেন: এখানে আমরা নিরাপদ, আমাদের কোনো ভয় নেই।

ভয়ঙ্কর সে রাত। অচেনা জায়গা। অজানা লোক। মিঃ দত্তকে মনে হল যেন কতকালের পরিচিত।

পরিচয় ঘটল দু জনের।

তারপর এক দিন নয়, দু দিন নয়, হামেশাই। এলি আর মিঃ দত্ত বিকেল চারটে থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য লাইনে দাঁড়াতেন টিউব স্টেশনে। মিঃ দত্ত সঙ্গে আনতেন দুজনার মতে স্যাণ্ড্উয়িচ আর ফ্লাস্কে চা। এলির সঙ্গে থাকত চকোলেট।

সারা রাত লোকগুলোকে বোবায় পায়। দিনের বেলায় শহরের প্রাণ-প্রাচুর্য দেখে মনেই হয় না রাতটা কত দুর্ভাবনার। সিনেমার বিরাম নেই, থিয়েটার চলেছে জোর কদমে। মিঃ দত্তকে এ সব জায়গাতেও দেখা যেতে লাগল এলির সঙ্গে।

প্রাচুর্যের মধ্যেই মানুষ এলি। অনেক কিছুই দেখেছেন। কিন্তু মিঃ দত্তকে দেখে তাজ্জব বনে যেতে হল। টাকাওয়ালা লোকের অভাব কি দেশে, কিন্তু এভাবে খরচা করে মানুষে? দৈনিক যে পরিমাণ মুদ্রা কারণে অকারণে মিঃ দত্ত ব্যয় করে যেতে লাগলেন, তার সামান্য অংশ পেলে যে কোন ছেলে এ দেশের একটা ভাল সার্টিফিকেট নিয়ে সচ্ছন্দে নিজের দেশে ফিরে ভবিষ্যত উজ্জ্বল করতে পারত। ছুতোনাতায় এলির হাতে অনেক কিছু তুলে দিতে চান মিঃ দত্ত। এলির বান্ধবীকে উপহার দিয়ে বসলেন হাতির দাঁতের যীশুখ্রীষ্ট।

এলির জীবনে ডাঃ সরকার যে দোলা তুলেছিলেন, মিঃ দত্তের হিল্লোলে তা মিলিয়ে গেল নিঃশেষ হয়ে।

এডিনবরা থেকে দুশ্চিন্তা নিয়ে বেসওয়াটারে এলির কুটিরে এসেছেন ডাঃ সরকার। এলি সাইনাসে কষ্ট পাচ্ছে দেখে বলেছেন: গরম জলে এই ওষুধটা ফেলে নাক দিয়ে ভাপ নাও। শক্ থেরাপি এখন বন্ধ হয়েছে এখানে। দুদিনেই সেরে উঠবে তুমি।

এমনি সময়ে মিঃ দত্ত গাড়ী থামিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসেছেন সেখানে। বলেছেন: অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি, শীগ্‌গীর চল। সট্‌ ওয়েভের ব্যবস্থা হয়েছে। টাকায় কি না হয়।

এলির সাইনাসের কষ্ট দূর হল। কিন্তু ডাঃ সরকার চিন্তায় তছনছ হতে হতে ফিরে গেলেন এডিনবরায়।

লোকের ত্রাস কমে এল। ভয় নেমে এল কৌতূহলে। সাইরেণের বুক কাঁপানো আওয়াজে এখন আর ডরায় না কেউ। টিউব স্টেশনের শেলটারে ভীড় কম। বাড়ীর বেসমেণ্টের আশ্রয়ই লোকে যথেষ্ট বলে মেনে নিল। দুটো ব্যারাজ বেলুনের মাঝখানের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মিঃ দত্ত একদিন একটা জর্মন বোমারুকে পালাতে দেখালেন এলিকে।

মিঃ দত্ত বলেন: বোমা খেতে খেতে প্রাণ যাচ্ছে; একটু নিরিবিলি জায়গায় হাঁফ ছাড়লে হত না এলি?

—কোথায় যাবে?

—ব্ল্যাকপুল বা স্কারবারা।

—ভয়ানক বেশী 'কমন'।

—চলো তাহলে লেন্‌ডুডনো।

—খ্লেন্‌ডুড নো বলো।

—ভুল ধরো না এলি। আমি তো আর ওয়েল্‌সের জেলেনী নই।

তারপর খ্লেন্‌ডুড্‌নো। সমুদ্রতটে সুন্দর হোটেল। সমুদ্রস্নান। রম্ভা নাচ। দেখতে দেখতে কেটে গেল পনর দিন।

এদিকে ডাঃ সরকার পাতি পাতি করে খুঁজে চলেছেন গোটা লণ্ডন শহর। টিউব স্টেশনে সাক্ষাৎ মিলবে মনে করে আশায় থেকেছেন সাইরেণের। ফোনে এলির কিউবিষ্ট বান্ধবীর কাছে দুর্বল ফরাসীতে সংবাদ চেয়ে হতাশ হয়েছেন। ফিরে গেছেন নিজের জায়গায়। তিন পাতার চিঠিতে জানতে চাইলেন, তিনি যা ভাবছেন তা সত্যি কিনা?

সমুদ্রের নোনা স্বাদ এলির দেহে। খ্লেন্‌ডুড্‌নো থেকে ফিরে এলেন লণ্ডনে। ডাঃ সরকারের চিঠির জবাব গেল ছোট্ট দু কথায়—হ্যাঁ সত্যি, অনিবার্যভাবেই সত্যি।

ডাঃ সরকার এলেন মিঃ দত্তর কাছে। এলির জন্মদিনে কি উপহার দিলে মানাবে তাই তিনি তখন ভাবছিলেন। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলেন: বলুন, ডাঃ সরকার। আপনার কোন উপকারে লাগলে আমি খুশী হব। বলুন, আমাকে কি করতে হবে?

ছুচার কথা বিনিময়ের পর ডাঃ সরকার নিজেই বুঝে পেলেন না কি বলতে এখানে এসেছেন তিনি। তবু বলেন: এলির মুখে খবর পেলাম আপনি সব কিছুই জানেন।.........দেখুন......... !

বাধা দিলেন মিঃ দত্ত। হেসে একেবারে উড়িয়েই দিলেন সব। প্রেম আর যুদ্ধে বেআইনী বলে কোনো পদার্থ নেই। তারপর শরীরতত্ত্ব, নারী আর তার ধর্মের আলোচনার আস্তর লাগিয়ে বার্ণাড শ'য়ের প্রসঙ্গ তোলেন। সহজভাবে নিতে বলেন সব কিছু। বেহিসেবী যদি কিছু হয়ে থাকে, সে দোষ কারো নয়। সব দায়িত্বই ডন্ জুয়ানের।

বিয়ের পর এলিকে নিয়ে দেশে ফেরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন মিঃ দত্ত। কিছু প্রতিকূল আবহাওয়ার ঝুঁকিও তাই নিতে হল। সুয়েজ তখন বন্ধ। উত্তর স্কটল্যাণ্ডের এক মেছো ভেড়ীর কাছে যে অঞ্চলে ভুলেও কখনও কোনো সমুদ্রগামী জাহাজ পা মাড়ায়নি, গোপন যাত্রা সুরু হল সেখান থেকে। মাইল চারেক মোটর লঞ্চের পথ পেরিয়ে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে হল।

কোনখান দিয়ে পথ জানবার উপায় নেই। কোন পথে যাত্রা সুরু, কোথায় হবে শেষ, তারও কোন ঠিকানা নেই। গুরু নাম জপতে জপতে আটলান্টিকে ভেসে চলা। পুরো সাত সপ্তাহ পরে সকালে চোখ খুলে দেখা গেল কেপটাউন। ক্যাপ্টেনের মুখে খবর পাওয়া গেল, নাজী ইউ-বোটের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে অনেক ঘুর পথে আসতে হয়েছে। কেপটাউনের পর ডারবান। ভারত মহাসাগর দিয়ে বোম্বেতে পৌছনো তারপর।

মাসখানেক পরেই নেলির জন্ম। মিঃ দত্ত তখন বোম্বেতে, থাকতেন মেরীন ড্রাইভে।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহ এলির। কথা জড়ানো। পাত্রাধার নিঃশেষ। চোখদুটো ভিজে ভিজে, ঠাণ্ডা।

—তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো, আমি হুইস্কির মুখে অত কথা বলে গেলাম না? একদম নয়। তোমাকে আমার বড়ো ভালো লাগে সেন। তাকিয়ে আছো যে অমন করে? আমাকে একটু নতুন চোখে দেখছো না? ডাঃ সরকারকে আমার ভয় হয় সেন, কেন জানিনা আজ তার নাম শুনলেই আমি শিউরে উঠি। নেলিকে তার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আমি রাজি হইনি। ভয় পেয়েছি। নিজের ইচ্ছে মত গড়েছি নেলিকে। সে হয়তো তার খেয়াল খুশী মত কেটেকুটে ফেলবে।

—অনেক রাত, চলুন আপনাকে বিছানায় পৌঁছে দিই।

—খাবেনা কিছু?

—না।

—তোমাকে আমার এত ভালো লাগে কেন সেন? এমন করে কাউকে আমার নিজের কথা বলিনি। কি ভাবছো?

—কিছু না।

—অমন করো না সেন। আজকের এই রাতটা বড় সুন্দর। তুমি কি দেখছো আমার দিকে অমন করে? আমাকে তুমি বিছানায় নিয়ে চলো সেন।

একটা গাড়ী শব্দ করে থামল একটু দূরে। তারপর জুতোর আওয়াজ শোনা গেল কাছে।

মিঃ দত্ত এসে ঘরে ঢুকলেন। একটু থমকে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ের সঙ্গে একটু বিরক্তি ছিল মিঃ দত্তর কণ্ঠেঃ আপনারা কি করছেন? এলি তুমি শুতে যাওনি এখনও?

পায়ের ওপর দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ল এলি। চট করে ধরে ফেললাম। আস্তে করে নিয়ে গেলাম বিছানায়। পর্দা টেনে দিয়ে ফিরে এলাম এ ঘরে। সোফায় বসে মিঃ দত্ত নখ পরীক্ষা করছেন। সিগারেট ধরিয়ে বসলাম একটা সোফায়। কাটা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম চাঁদ বেঁকে গেছে দূরে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ। জুতোর ফিতে আলগা করে ভেতরে চলে গেলেন মিঃ দত্ত। আলোটা নিবিয়ে দিই। সিগারেট টেনে বার করি আর একটা। আবার ফিরে আসি সোফায়।

সে-রাত্রে ঘুম হয়নি একদম। এপাশ ওপাশ করেছি খালি। এলির মুখে যে পুরোনো কাহিনী উদ্‌ঘাটন হল তাই ভাবতে থাকি। ডাঃ সরকার যেন আমাকে পেয়ে বসলেন।

সকাল হল। সব কি রকম যেন চুপচাপ। চায়ের টেবিলে আসবার পথে পর্দার আড়াল থেকে এলির গলা পেলাম: মিঃ সেন ইজ অ্যান ইন্‌টারেষ্টিং ম্যান কিন্তু নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। কাছে ডাকলেই একেবারে ঘাড়ে এসে পড়তে চান।............আমার কিন্তু তোমার মতো রাগ হয় না। পীটি, ইউ মাষ্ট হ্যাভ্‌ পীটি ফর মিঃ সেন।

কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াই। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। তার পরে এসে বসি চায়ের টেবিলে। সামান্য বাক্যালাপ, সবই যেন ভেবে ভেবে বলা।

পথে বেরিয়ে পড়ি। এলির কথাগুলো বার বার মনে উঁকি মারতে থাকে। পথ ছিল সর্পিল। ঘোরানো, আঁকাবাঁকা। চিন্তা আমার তারই সঙ্গে তাল রেখে ঘুরপাক খেয়ে মরে। যে সত্য কাল রাত্রে প্রকাশ পেয়েছে, ভাবের ঘোরে এলি যে পুরোনো অতি আপনার কাহিনী উদ্‌ঘাটন করেছেন আমার কাছে, দুর্বল মুহূর্তের সামান্য অসতর্কতায় নিজেকে আমার কাছে সম্পূর্ণ হয়ে ধরা দিয়েছেন। কিছু দিয়েই আর গোপন করা যাবেনা। এলির রিক্ততা ঢাকা পড়বে না কোন কিছুতেই।

একমাত্র নিজের জীবনেই হয়ত কোন গোঁজামিল চলে না। ফেনা থিতিয়ে আসতেই পানীয় হ'য়েছে বিস্বাদ। ডাঃ সরকারকে ছেড়ে এসে দত্তকেও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি এলি দত্ত। দুই বিপরীত মুখী জীবনকে সেতু হ'য়ে বাঁধতে পারলো না নেলী। সহজ সম্বন্ধের মধ্যেও তাই বাধা।

ভেতরে এতবড় ফাঁকি ছিল বলেই হয়তো একটা থেকে অন্য আর একটা উত্তেজনার মধ্যে এলির ঝাঁপিয়ে পড়া। জীবনের গতি হ'য়েছে দ্রুতলয়ে। নেলিই কি তার সত্যিকারের পরিচয় পেয়েছে? কে সে? কী বা তার পরিচয়?

মিঃ দত্তের অবস্থাই সবচেয়ে অদ্ভুত। স্ত্রী ও মেয়ে, কারো ওপরেই তাঁর কোনো মালিকানা নেই। ফাঁক হয়ত ভরাট হ'য়েছে, কিন্তু ফাঁকি ঢাকবেন কি দিয়ে?

আসক্তি কমেনি শুধু এলির। মরীচিকার সন্ধানে সে আজও একটা ধরছে, একটা ছাড়ছে। নিজের সঙ্গে নিজের রেস তার ফুরোয়নি।

বাইরের এলি দত্তকে দেখে মানুষ। কিন্তু যবনিকা তুলে এত ঐশ্বর্য্যের ফাঁকে এলির রিক্ততা দেখেনি কেউ।

কটেজে ফিরে এসে পরিবেশটাকে একটু স্বাভাবিক করে নিতে চাইছিলাম। কিন্তু সম্ভব হল না। এলির ভ্রুক্ষেপও নেই আমার প্রতি। শেষে আমার নিজের কথায় আমি নিজেই যেন অবাক হয়ে গেলাম: আজকেই আমাকে দিল্লী যেতে হবে।

মিঃ দত্ত বললেন: সেকি মিঃ সেন, আপনার তো এখনও সপ্তাহখানেক থাকবার কথা।

পেছন থেকে এলির গলা পেলাম। স্থির গম্ভীর নিচু পর্দায়: সেনসাহেব কাজের মানুষ, খেটে খেতে হয় ওঁকে। আটকে রাখলে ওঁর ক্ষতি হবে।

আমি অবাক হয়নি। বেসুরো লাগেনি মোটেই। পথের লোক আমি। উঠে এসেছিলাম ঘরে। সব কিছু জেনে গেলাম নিঃশেষ করে। এলির হাতে কিছুই রইল না। বেশ বুঝি, ভোরের সোনালি আলোয় আমার কাছে এলি আজ বড় অপ্রস্তুত।

যাত্রার সময় হল। বিদায় নিয়ে নেমে পড়ি পথে। পাইনের মাথায় মুঠো মুঠো রোদ। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া হেসে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে। বাঁকের মুখে পাইনের মাথা ডিঙ্গিয়ে চোখে পড়ে অনেক নিচে ফেলে এসেছি এলির কটেজ।

আজ দীপুকে দেখতে আসবে।

সকাল সকাল হাতের কাজ সেরে সন্ধ্যের অনেক আগেই বাড়ী পৌঁছোতে হল। রূপোর কথা শেষ হয়েছে, রূপ যাচাই হবে আজ। ফটো দেখে মুখের আদল, দেহের গড়ন পছন্দ হয়েছে। পাত্রটিকে আমি দেখেছি। বেশ ছেলে। আজ পাত্রের পিতা দেখতে আসবেন দীপুকে।

অবশ্য আমার খুব একটা কিছু করবার ছিল না। আপ্যায়নের ভারটি তেজুর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম। ভয় পাত্রের পিতাকে নয়—দীপুকেই।

দীপু আমার ভাগ্নী। ভাল করেই জানি তাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ছাত্রী। আমি যেমন হিন্দীতে কথা বলতে পারি তার চেয়ে ফরাসীতে ওর ভাল দখল। অতিমাত্রায় অস্থির। আমার দিদি প্রায়ই অভিযোগ করেন, আমি নাকি বড় বেশী মাথায় তুলছি মেয়েটাকে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ভয়ানক আপত্তি। নেহাতই একগুঁয়েমি নয়। যুক্তিও তার খাড়া করা আছে তর্কের ভঙ্গীতে। দীপু বলে থাকে নিজেকে তুচ্ছ, হীন প্রতিপন্ন করবার ওটা নাকি অতি সহজ একটা 'জেশ্চার'।

তাই আমার দীপুকে ভয়। রঙচঙ মেখে তেজালো শাড়ী জড়িয়ে পা ভাঁজ করে মাটির দিকে তাকিয়ে, "আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে বঁধু আমার" গাইবার মেয়ে সে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী দীপু একথা জেনেও পাত্রের পিতা যদি তার ইংরেজী বাংলা হস্তাক্ষর চেয়ে কলম এগিয়ে ধরেন, আমার ভয় হয় দীপু বেফাঁস কিছু বলে ফেলতে পারে। শুক্তো রাঁধার অতি ইণ্টেলিজেণ্ট প্রশ্নের উত্তরে প্রচুর পরিমাণ পেঁয়াজ আর লঙ্কাবাটা লেগে থাকে—এরূপ জবাব দিয়ে দুমদাম পা ফেলে উঠে আসাও তার পক্ষে বিচিত্র নয়।

আমি অবশ্য দুদিন ধরে তালিম দিয়েছি। কৃত্রিম ধমক দিয়ে তার মায়ের কথা শুনতে বলেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চাইলে গান না জানার অতি সহজ

উত্তর দিলেই চলবে। আমি তো গায়িকা নই এরূপ জবাব যেন ঠোঁটে না আসে।

শেষে আদর করেই বলেছি দীপুকে: পাত্রটি বড় খাসা দীপু, তাই চুল মাগতে বসলে মাথা টান করিসনে। অলক্ষ্ণে আঙুলগুলো সংযত রেখে দরকার হলে চলনে লক্ষ্মীশ্রী ফোটাস।

জবাব দিয়েছে দীপু: তোমার মুখে এ ওকালতি শোভা পায় না। তোমার কাছেই এ সব কিছুকে আমি জেনেছিলাম ভাল্‌গার। কথায় ও কাজে কি ভয়ঙ্কর অসঙ্গতি। দিন দিন প্রফেশনাল্ চরিত্র তোমার বাড়ীর বিছানা দখল করছে। এটাকেও কি তুমি বলবে এড্‌জাষ্টমেণ্ট?

—ঠিক তাই। ছেলের পিতাকে দেখে নিয়ে বাগিয়ে কলম ধরতে পারো। কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লিখে গায়ের ঝাল মেটানো যায়। কিন্তু তাতে তোমার বিয়ে এগুবে কতটা? বুঝেছি, এ রকম এড্‌জাষ্টমেণ্ট তোমার পছন্দ নয় কিন্তু আজকে এই নিয়ে এজিটেশন তুললে সেটা কম অপছন্দের হবে না।

মৌন থেকেছে দীপু। দুষ্টু হাসি হেসেছে। যেন বলতে চেয়েছে আমাকে, তুমি শুধু ইন্সিওরেন্স এজেণ্ট নও—স্টেটাস্ ক্যুয়োর দালাল।

অনেকে আমাকে ধুরন্ধর লোক বলে থাকেন। কিন্তু ধুরন্ধর না হলেও অনেক অসাধ্য সাধন করেছি আমার বৃত্তির চলতি পথে। নিতান্ত অভদ্র ধনী লোকের সঙ্গে বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরেছি। অবশ্য পর্বতমালা বা সিন্ধু দেখবার তাগিদে নয়, নিতান্তই আমার সেলস্ টক্‌কে খাতায়পত্তরে পাকাপাকি রূপ দেবার খাতিরে।

কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে কাজের কথার ভূমিকা হয়েছে কলকাতার ঘোড়দৌড়ের ময়দানে। শহরের হোটেল রেঁস্তোরাঁ বেয়ে তার বাড়ীতেও সে কথার সহজ সাবলীল গতি—প্রপোজল ফর্ম সই হয়েছে কিন্তু অনেক দূরে। কলকাতায় নয়—রেঙ্গুনে।

এই তো সেদিন আসামের কাজিরাঙ্গায় গণ্ডার দেখতে গিয়েছিলাম। একই রেষ্ট হাউসে দেখা হয়ে যাওয়াটা নিতান্তই একটা ক-য়েন্সিডেন্স। শান্তিলাল

প্যাটেল আজও তাই মনে করেন। কিন্তু আসল ঘটনাটা ভেবে আমি নিজেই হেসে খুন হই।

কাজিরাঙ্গার গণ্ডার আমি দেখেছি বটে কিন্তু দমদম থেকে জোড়হাট হয়ে কাজিরাঙ্গার রেষ্ট হাউসে আমি সেবার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতেই গিয়েছিলাম। গণ্ডার ভারতের একটা ভ্যানিশিং ওয়াইল্ড্ স্পিসিস্। কিন্তু প্যাটেল যে নিতান্তই আর এক রেয়ার স্পিসিস্ তাতে আর সন্দেহ কি?

কাল ডাক্তার নিয়ে আপনার কাছে আসছি—ফেরবার পথে দমদম বিমান ঘাঁটিতে এই কথাটি বলতে আমায় যতটা ক্লেশ পেতে হয়েছিল, তার চেয়ে গাছগাছালি আর জলাখানার মধ্যে সেই বিরাট দানবটিকে রোলিফ্লেক্স ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে খুঁজে পেতে প্যাটেল অনেক বেশী নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে অতি শক্তিশালী লেন্স থাকা সত্ত্বেও দরজা সমস্তটা খুলে দিয়ে এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক টুকরো দিয়ে সেই সরণশীল জীবের ছবি তোলেন প্যাটেল। ক্যামেরার কৌশল আমার জানা নেই। তবু কেমন যেন গোলমেলে মনে হল। মুখে অবশ্য হাসি টেনেই বলেছিলাম: ওয়া! আপকি ফটোগ্রাফি তো কাফি উঁচে দরজে কি হ্যায়!

বলেছিলেন: কুছ মাত্ কহিয়ে। ক্যামেরা কা তো মুঝে বহত শখ হ্যায়। মুভি ক্যামেরা ভি হ্যায়, মুভি ক্যামেরা মে জাদা স্থবিস্তা—নিশানে পর আঁখ, শাটার দাবাও ধড়াধ্বড়…।

ধড়ফড় করে উঠেছিল বুকটা। তবু প্রতিবাদ করিনি কিছু। আপনারা বলবেন, লোকে ধুরন্ধর যে বলে আপনাকে ঠিকই বলে।

কিন্তু এ হেন ধুরন্ধর সৌরীন সেন শর্মার কালঘাম ছুটে গিয়েছিল তার বোনের বিয়ে দিতে।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না হয়তো, কিন্তু টাকা খরচ করলেই যে ভাল পাত্র পাওয়া যাবে—এ দুরাশা আমার গেছে। অপির বিয়েতে সে শিক্ষা আমার হয়েছে। সমস্ত ঠিকঠাক, এমন কি দেনাপাওনাও। শেষ মুহূর্তে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক চেয়ে বসলেন জন্মতারিখ। দিতে হল। পরদিনই পত্র এল—মান্যবরেষু, অনিবার্য কারণে আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মাপ করিবেন। ইত্যাদি।

পাত্রটি ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র। ইলেকট্রন প্রোটন নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আমি নিজে হাওড়া ব্রীজের মাথার ওপর কিসের তাগিদে এত লোহালক্কড় রাখা হয়েছে পাঁচ জন লোকের সামনে হেঁকে বলতে পারব না। তবু পাত্রটির সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে সাপেক্ষবাদের অতি সহজ ব্যাখ্যা শুনে এইটুকুই বুঝেছি, ছেলেটির গলার ওপর মুণ্ডুটি শুধু টেরি কাটবার জন্য নয়।

অপির বিয়ে আমাকে দিতেই হবে। তাই পত্রটি সঙ্গে নিয়ে পাত্রের সঙ্গে দেখা করি। তার নিজের মতামতটা আমার জানা দরকার। অফিসে গেলাম, ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। জীবনে কতবার এরূপ আশ্চর্য হয়েছি স্মরণ নেই। পাত্রটি আমাকে হতবাক করে দিল। জানালে যে দেবগণ আর রাক্ষসগণে ভয়ানক মারামারি হবে। সংসার ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাওয়া ঠেকানো যাবে না কিছুতেই। ফিরে এসেছিলাম। কেমন যেন গোলমাল ঠেকেছিল। এই পাত্রের মুখেই আমি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ব্যাখ্যা শুনেছি যে!

টাটার টেস্কোর পাত্রটি আমার হাতে আসে ঠিক তার পর। ছেলের ছিল টাক, বাপের ছিল টাকা। জন্মতারিখের ধার দিয়েও গেলেন না তারা। আমার বোন অপিকে দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেলেন। কিন্তু বিয়ে তবুও আটকালো। শেষ মুহূর্তে আমার পরিচিত দূতের মুখে জানালেন, রেডিওগ্রাম একটা না দিলে চলবে না।

অপির বিয়ের খাতিরে আমার কাছে আজ একটা রেডিওগ্রামের দাম সামান্যই। তবু চেঁচিয়ে ফাটিয়ে একটা সীন্ করেছিলাম সেদিন। চিঠির কার্ড পছন্দ করছি, এখন এ সব কি প্রস্তাব! আমার ভাই তেজু বলল: যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন-ম্যাটারস্ লিট্‌ল।

আমি বলেছিলাম: এখানে আমি বোনের বিয়ে দেব না। রেডিওগ্রামের কথা ফেরত্ নিয়ে গেলেও নয়।

একটা রেডিওগ্রামের ফেরে পড়ে বিয়ে ভেঙ্গে গেল এবারও।

ক'দিন পরই বোধহয় কুণাল সেনের পত্র পেলাম। ভদ্রলোককে আমার দুরন্ত ভাল লেগে গেল। সারা জীবন চাকুরীর খাতিরে বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন। দেশ-বিদেশে সামরিক হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অপির মত একটি মেয়ের সন্ধানই করছেন—এ কথা আমার সামনেই তিনি স্বীকার করে গেলেন। পাত্রটিকে দেখে মুগ্ধ হলাম। সুন্দর স্বাস্থ্য। দীর্ঘ একহারা চেহারা। ডালহৌসীর এক শ্বেতাঙ্গ সওদাগরি অফিসে অতি লোভনীয় চাকুরীতে বহাল আছে। এমন পাত্র আর হাতছাড়া করা নয়।

সমস্ত কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। কুণাল সেন ক'দিনের জন্য বাইরে গেলেন। ফিরে এসেই দিন স্থির হবে এই রকম মোটামুটি ঠিক রইল।

এই সময়েই ভোর বেলাতে একদিন কাজের খাতিরে বেরুবো বেরুবো করছি, এমন সময় খবর পেলাম এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। নীচের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

ভদ্রলোক আর কেউ নন। কুণাল সেনের পুত্র। এই ছেলেটির সঙ্গেই অপির বিয়ে ঠিক হয়েছে।

কিছুটা যেন বিস্মিত হলাম। ছেলেটিকে আমি ঠিক আমার এখানে এ অবস্থায় আশা করিনি। তবু অতি সহজ আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি।

কথার খেই খুঁজে না পেয়ে কুণাল সেনের কথা জিজ্ঞাসা করি। সিগারেট ধরিয়ে ছেলেটি জানালেঃ বাবা কাল আসবেন। তাই আজই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। কিছুটা জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে।

—কি কথা?

—আমি যে কথা বলব আপনাকে, দয়া করে সে কথা বাবাকে জানাবেন না। তিনি কষ্ট পাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় এ কথা আপনার জানা দরকার। বাবা সম্ভবতঃ এ প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ চেপে গেছেন।

কেমন যেন খটকা লাগল মনে। মুখে হাসি টেনে বলিঃ কি কথা?

সোফার হাতায় আঙুল ঘসতে ঘসতে কিছুটা নীচু গলায় জবাব আসেঃ আমার একটা রোগের কথা বাবা হয়তো আপনাকে জানাননি।

বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। দমে গেলাম কিছুটা। তবু বলিঃ আপনার শরীরে রোগ। ব্যাপার কি বলুন তো?

টেবিল থেকে সিগারেট তুলে সোফায় ফিরে আসবার পথে দেখলাম ডান পায়ের জুতো খোলা ছেলেটির, মোজাও ফেলেছে খুলে। মুখে কোনো

কথা নয়, ডানপায়ের গোড়ালির কাছে আঙুল দেখিয়ে সে দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

পোড়া ঘায়ের মত আফ্রিকার মানচিত্রের ঢংয়ে বেশ খানিকটা দাগ। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম। অস্ফুট একটা বিস্ময়োক্তি করি মাত্র। মুখ তুলে ম্লান হেসে ছেলেটি বলে: বহু চিকিৎসা করেও এ দাগ মিলিয়ে যায়নি—একভাবেই আছে আজ বছর চারেক।

সন্ধ্যেতে কথাটা অপির কাছে পেড়েছি। চতুর মেয়ে সে। বলেছে: তোমার যা ভাল মনে হয় তাতেই আমি খুশী হবো।

কঠিন দায়িত্ব। কি সুন্দর স্বাস্থ্য। চমৎকার ব্যবহার ছেলেটির। এরূপ ছেলে কদাচিৎ চোখে পড়ে। তবু ছেলেটির পায়ের ছোট দাগটি আমার তছনছ করে দিল সব। কে জানে কোন্ দিন এই গোপন দাগটা মাথা চাড়া দিয়ে এগুতে সুরু করবে না। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির দুরন্ত লাভা স্রোতের মত সুন্দর দেহটি গ্রাস করে ফেলবে না এই কলঙ্ক। ভাবতে পারিনি আর।

চিঠিতে অতি হাস্যকর অজুহাত দিয়ে কুণাল সেনকে পত্র দিয়েছি। একটা বেলা লেগে গেল আমার চিঠি ড্রাফট্ করতে। কি মনে করেছিলেন কুণাল সেন কে জানে।

একদিন দেখা হয়েছিল ছেলেটির সঙ্গে। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে। বিয়ে করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ভয় পেয়েছি। আমাকে দেখে এক রকম ছুটে এসে বসলে একটা চেয়ার দখল করে। এক পাত্র বীয়ার চলবে কিনা প্রশ্ন করি। ম্লান হেসে মাথা নাড়লে। বললে: জর্মণীতেই গেলাম না স্যর, কি বীয়ার খাব!

আমার বন্ধু রণেন, অর্ণবের খোঁজ নিয়ে এল একদিন। রণেনকে আমি জানি। অতি সংযত চরিত্রের রণেনও দেখলাম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আমি বলি: দেখতে হয়। রণেনই ব্যবস্থা করলে।

অর্ণবের বাবা এলেন অপিকে দেখতে। মেয়ে দেখার অতি পরিচিত ঢঙের সমালোচনা করে নিজেও যে খানিকটা সেই পথই ধরতে বাধ্য হয়েছেন তার জন্য সঙ্কুচিত হলেন। জন্ম-মৃত্যুর হিসেব চাইলেন না। কি পরিমাণ খরচ

আমি করবো বলে মনে মনে ঠিক করেছি, তাতে কিছুমাত্র ছিল না ঔৎসুক্য। সেলাইয়ের কলে চিরে যাওয়া ডান হাতের মধ্যমাটি অপি শাড়ীর আঁচলে লুকোচ্ছে দেখে হেসে বললেন : আমি কিন্তু আগেই দেখে ফেলেছি।

চিঠিতে মতামত আশা করব কিনা জিজ্ঞাসা করায় ঘুরে দাঁড়ালেন ভদ্র লোক : চিঠিতে আবার কি লিখব ? কি জানাবো আপনাকে ? আমার তাড়া একটু বেশী। নভেম্বরের শেষে অর্ণব বোধ হয় বাইরে যাবে। তবে পুরো দায়িত্বটা আমাদের কারো নেওয়া ঠিক হবে না। অর্ণবকে আমি একবার দেখতে বলব।

অর্ণব দেখলে অপিকে রণেনের বাড়ীতে নিতান্ত সাধারণ পরিবেশে। সামান্য গল্প করলে আমার সঙ্গে। অপিকেও দেখলাম সহজভাবে কথা বলছে অর্ণবের সঙ্গে।

শেষকালে কিন্তু মুস্কিলে পড়লাম এবারেও। দর্জি জুতোওয়ালা সবাই ফিরে এল। অর্ণবের বাবা আমাকে ফোনে জানালেন : অপিকে আপনারা ইচ্ছে মত সাজান। অন্য কোনো কিছুতে অর্ণবের আপত্তি। আমার স্ত্রীরও পছন্দ নয়। অর্ণব বাড়ী নেই, থাকলে তাকেই ফোনে ডেকে দিতাম।

কি ঘড়ি পছন্দ করবে অর্ণব জিজ্ঞাসা করি। উত্তর পেলাম : কেন ? অর্ণবের তো একটা ঘড়ি আছে। যতদূর জানি সময়ও ঠিক দিচ্ছে। আপনি আবার ঘড়ি দেবেন কেন ?

অপ্রস্তুত হয়ে ফোন নামিয়ে রাখি। নিজের কাছেই যেন কিছুটা লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

অপির বিয়েতে কালঘাম আমার ছুটেছিল সন্দেহ নেই। এই সাফল্যে খুবই আনন্দ পেয়েছি।

এইবার আমার ভাগ্নীর পালা। এখন নির্বিঘ্নে এটি সমাধা হলেই হয়। সিঁড়ির বাঁকে দিদির সঙ্গে দেখা। নিতান্তই হাসিখুশী দেখলাম তাকে। আমাকে দেখে যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হল দেখলাম। বললে : দীপু তার ঘরে সাজগোজ করছে। এই নিয়ে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। এখন ভদ্রলোকের সামনে বেফাঁস কিছু না করে ফেললেই রক্ষে।

চেনা মুখ

দোতলায় উঠে পা টিপে টিপে দীপুর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াই। জানালার একটা কাচ ভাঙ্গা ছিল। সেখানে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াতে হল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিফলিত দীপুকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কি প্রচণ্ড সাজগোজ করেছে নিজে নিজেই। হাসি সামলে দাঁড়িয়ে পড়ি।

তারপর যা ঘটল নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। দীপুর কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব বনে যেতে হল। সামনের চেয়ারের দুই পায়াকে বোধ হয় ভাবী শ্বশুরের ঠ্যাং কল্পনা করে হেঁট হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলে।

নিজেকে আর সংযত করতে পারিনি। চীৎকার করে উঠি: দীপু।

ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে যাই। অপ্রস্তুতের একশেষ দীপু। সরু হয়ে গেছে লজ্জাতে। ছুটে এসে আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকোলো। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল তারপর। তাকে সংযত করতে চেষ্টা করি। বলি: তোমার প্রসাধন নষ্ট হচ্ছে। ছেলে মানুষী করোনা দীপু।

কান্না চাপতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে ওর শরীরটা।

ভুল করেছিলাম হয়ত আমিই। ভুল বুঝেছিলাম দীপুকে। খেয়াল হল আজ দীপু শুধু আমার ভাগ্নী নয়। ইউনিভারসিটির ছাত্রী সে—এ পরিচয়ও তুচ্ছ। দীপু আজ পরিপূর্ণ নারী।

এ কান্না কিসের? লজ্জা! ভয়! না পরাজয়ের? মনোবিজ্ঞানী কি ব্যাখ্যা করেছেন? আমার কিন্তু হিসেবে আসে না। হয়ত কোনো ভাষা মেলে না কম্পারেটিভ ফিললজির ক্লাশে।

কিছুক্ষণ ঝিম ধরে রইলাম।

ভোরবেলাতেই মিসেস দস্তিদার কোন কাজের তাগিদে বাড়ী বয়ে দেখা করতে এসেছেন বুঝতে পারলাম না। নতুন করে কি কথা আর তিনি শোনাবেন আমাকে? হয়তো কিছুটা সকারণেই এসেছেন কিন্তু আমার কাছে যে তা বহুলাংশেই অকারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই সকালে মিসেস দস্তিদারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ মোটেই প্রীতিকর নয়।

কিছু দিন থেকেই এই ভদ্রমহিলা আমার কাছে ঘুর ঘুর করছেন। আভাসে ইঙ্গিতে সুবিধে হয়নি তাই লজ্জার মাথা খেয়ে সোজা প্রশ্নই করেছেন আমাকে। অতি সামান্য প্রশ্ন, উত্তরও তার যৎসামান্য। তবু কিছুটা বেকায়দায় পড়েছি আমি। উত্তর কিছু খুঁজে পাইনি। অপ্রস্তুতই করেছেন আমাকে।

দস্তিদার সাহেব কবে ফেয়ার্লি প্লেসের রেলওয়ে বুকিং অফিসের কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একটি নির্ঝঞ্ঝাটে 'ক্যুপের' জন্য বেকায়দায় পড়েছিলেন, সেদিন ভেতর থেকে মিলিটারি রিকুইজিশান বাতিল করে কিভাবে একটা 'ক্যুপ' আমি সংগ্রহ করেছিলাম, সে যাত্রায় বিদুষী মিসেস সরকার দস্তিদার সাহেবের সঙ্গে মোট কতদিন কোন দেশে কাটিয়ে এসেছিলেন, সে দিনগুলোর ইতিহাস আমার কিছুটা জানা আছে। পানাগড় থেকে ফেরবার পথে ভয়ংকর দুর্যোগের রাতে রাজবাঁধ ডাকবাংলোতে এই মহিলা কবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, ডাকবাংলোতে দস্তিদার সাহেব বৎসহারা গাভীর মত পোর্টিকোতে পায়চারি করছিলেন। শেষে অনিবার্য এই সাক্ষাৎকার (পিউরিটান সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার যশোদাদুলাল রক্ষিতকে ম্যানেজ করবার জন্য) নেহাৎই উত্তর দক্ষিণে ঈষৎ চাপা গোলাকার পৃথিবীর একটা প্রামাণ্য উদাহরণ বলে অর্থপূর্ণ হাসাহাসি হয়েছিল কিনা সে তথ্য আমার অজানা নয়। এরূপ কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমার খুব একটা বেকায়দায় পড়তে হয় না। কিন্তু দস্তিদার সাহেবের

বেয়াড়া সইতে মিসেস দস্তিদারের নাম নির্বাসিত হয়েছে ইন্সিওরেন্স পলিসি থেকে, মিসেস সরকারকে নমিনি করেছেন কিনা, এরূপ প্রশ্নের সিধে জবাব আমার মুখে আসেনি। মুখের অপ্রস্তুত ভাবটাতে চেষ্টাকৃত বিস্ময় টেনে মিসেস দস্তিদারের প্রশ্ন আমি এড়িয়েছি। জবাবে শুধু বলেছি : এরূপ সংবাদ আমার জানবার কথা নয়। এটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। তবে অনুসন্ধান করে জানতে চেষ্টা করব। সত্যিমিথ্যে যাচাই করেই জানাব।

শ্রী এ. আর. দস্তিদার, আই সি এস। নিঃসন্দেহে জিনিয়স্। দোহারা গড়নের অতিশয় ধারালো চেহারা। জনশ্রুতি আছে মুখের দিকে তাকিয়ে নাকি মিথ্যে কথা বলা যায় না। দাপুটে চরিত্রের বহু কাহিনী শুধু কলকাতায় নয়, বাঙ্গলাদেশের জেলাতে জেলাতে চলতি আছে। বাঁকুড়ার রেলওয়ে বিশ্রামাগারে স্থানীয় হেডমাষ্টারের মুখে দস্তিদার সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি সেদিনও। স্থানটা বাঁকুড়া তাই বিস্মিত হয়েছিলাম।

ইংরেজকে দেখে নিয়ে দেশের জনসাধারণ কিছুকাল আগে যে আন্দোলন সুরু করে, চাপা বিক্ষোভ যখন প্রাণঘাতী হয়ে উঠল, মহামান্য লাটবাহাদুরের 'সেট্ অ্যান্ একজম্পল' এর গোপন সার্কুলারকে পুরোপুরি মর্য্যাদা দেবার খাতিরে দস্তিদার সাহেব তখন এই গোটা জেলাটিকে তছনছ করেছিলেন। 'টেরোরাইজ' শব্দের সহজ ইংরেজী অর্থ করে সর্বত্র নির্দেশ পাঠালেন— শুট্ টু কীল্।

সে দিনের কথা ভোলা মুস্কিল। স্বয়ং লাটবাহাদুর বিচলিত হয়েছিলেন সে সময়ে। শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীরা দস্তিদার সাহেবের কাজের সমালোচনা করে ডি. ও. চালাচালি করেছেন নিজেদের মধ্যে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের গোপন কক্ষে 'লিমিট' 'লিমিট' রব উঠেছিল।

সে ইতিহাস আজ মৃত। পরিপূর্ণ বিস্মৃতির তলে নির্বাসিত। রাজনৈতিক জুয়া খেলার টু থার্ডের ফেরে পড়ে সে গোপন কাহিনীর ষাট পাতা হয়তো আজ ঢাকাতে। অবশিষ্ট চল্লিশ পাতার ফাইলটার মাথায় লাল কালিতে 'ডি' চিহ্নিত হয়ে রুদ্ধ কক্ষ থেকে কোথায় চলে গেছে আজ, সে হদিশ কারও জানা নেই।

বছর খানেক আগে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরে বাঁকুড়ার স্কুল প্রাঙ্গনে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে দস্তিদার সাহেবের মুখে জাতীয় সংগ্রামের মহান ঐতিহ্যের বক্তৃতাটি আজ শুধু হেডমাষ্টার মনে করে রেখেছেন।

সত্যি, সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

দস্তিদার সাহেব আমাকে পছন্দ করেন। আমি জানি তাঁর প্রচুর বলবার আছে। যে ক্ষমতা নিয়ে তিনি দীর্ঘ অফিস নোটের তলায় 'ইয়েস' 'নো' 'অ্যাজ প্রপোজড' লিখে থাকেন, সেই মনভাব নিয়েই তিনি বাইরের জগতে চলাফেরা করতে চান। নতুন কিছু বলে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার কায়দাও তাঁর জানা।

কি প্রসঙ্গে কবিতার কথা উঠেছিল সেদিন—ইয়েটসের কবিতা। আমার দৌড় আমার ভাল করেই জানা আছে। গতিক সুবিধে নয় দেখে কোণা মেরে বসে অ্যাকোয়েরিয়ামে দৃষ্টি তুলে ডুবে গেলাম। কান কিন্তু উৎকর্ণ। দস্তিদার সাহেব কবিতা বাদ দিয়ে ইয়েটসের কথা পেড়ে বসলেন। অক্সফোর্ডে থাকার সময়ে ইয়েটসের পিসতুতো বোনের থিয়সফিষ্ট্ এক নাতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, সে কাহিনী বিস্তৃত বর্ণনা করলেন। ভাবটা এই, ইয়েটসের খোদ পিসতুতো বোনের থিয়সফিষ্ট্ নাতির সঙ্গে যার পরিচয় তার আর ইয়েটসের কবিতা নতুন করে পড়ে দেখবার কি কারণ থাকতে পারে? অনেকের কাছেই দস্তিদার সাহেব তাই অসহনীয়, কিন্তু ভদ্রলোক আমার কাছে ভয়ানক বেশী কৌতূহলের বস্তু। ইন্টারেষ্টিং। তাই অতি স্থূল কথাতেও আমি আগ্রহ প্রকাশ করি। তার মধ্যেও খুঁজে পেতে হয় ইন্টেলেক্চুয়াল গন্ধ।

বীয়ারের মগে চুমুক দিয়ে সেদিন বলেন: বুঝলে সেন, বেলজিয়ামের একটা বীয়ার আছে নাম তার—লেজার, অন্য কোনো দেশের বীয়ারের সঙ্গে তুলনাই চলে না।

কিন্তু আমার জানা অন্য রকম। লেজার বীয়ারে শুধু বেলজিয়ামেরই *একচেটিয়া অধিকার নয়, আজকাল সব বীয়ারই লেজার। কথাটা এসেছে* জর্মন্ 'লাগার' থেকে। সাদা ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ষ্টোর্ড। আমি ভুলেও ভুল ধরতে যাইনি। বুঝেছি একথা বললে দস্তিদার সাহেবকে চটিয়ে

দেওয়া হবে মাত্র। বরং বলেছি, ড্রিঙ্কস্ সম্পর্কে আপনার কৌতূহল কম নয় দেখছি।

শুধু বীয়ারের আসরে নয়, রাজনীতি থেকে স্থরু করে শিল্প সাহিত্যেও এঁর অবাধ গতিবিধি। এমন কি স্রষ্টার স্থষ্টির পেছনেও যথেষ্ট পরিমাণ ঝোলা গুড়ের সন্ধান পান। বলেন: সাহিত্যিক লেখে অর্থ, যশ ও মেয়েদের ভালবাসার জন্যে। আজকাল তুমি বড় ছাইমাটি পড়ছ সেন। হোয়াই ডু আই রাইট? বিকজ আই কাণ্ট ডু আদারওয়াইজ। কেতাবে তুমি অনেক কিছু পাবে—বিকজ আই কাণ্ট ডু আদারওয়াইজ। নন্সেন্স।

আলবাৎ নন্সেন্স।

তবে আমার সন্দেহ অমূলক। মিসেস দস্তিদার দেখলাম খুব খোলা মন নিয়েই এসেছেন। আজ দুপুরে দস্তিদার সাহেব ফিরছেন আগরতলা থেকে। বড় একটা গাড়ীর দরকার—ষ্টেশন ওয়াগন হলেই ভাল হয়।

অতি সাধারণ কথা। তবু এই সহজ অনুরোধে কিছুটা অবাক হতে হয় আমাকে। বড় গাড়ীর অভাব কি এঁদের? তাই হালকা হেসে বলি: আমাদের সরকার যে এতটা দেউলে হয়েছেন জানতাম না। গাড়ীর প্রয়োজনে এসেছেন আপনি আমার কাছে? তাজ্জব করলেন আমাকে।

—তাজ্জব শুধু আপনি নন, আমিও কম অবাক হইনি। শুনুন, উনি প্রাইভেট ক্যাপাসিটিতে কলকাতায় আসছেন। তাই গভর্ণমেণ্ট ভেহিকল্ তিনি ব্যবহার করবেন না। উনি আবার এসব ব্যাপারে খুব কড়া কিনা।

হাসি পেল। হামেশাই আমি দস্তিদার সাহেবকে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে দেখি। শুধু যে সরকারী কাজের তাগিদেই এ কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। সে সন্দেহ আমার আরও দৃঢ় হয়েছে যখন দেখেছি ড্রাইভারের হাতের লগ্ বুক সই না করেই বিরক্তির সঙ্গে ফেরত দিয়ে বলেছেন: অফিসে।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রশ্ন করি: ষ্টেশন ওয়াগন হলে ভাল হয়। কখন চাই?

—প্রথমে আপনার কথাই আমার মনে পড়ল। আর এটাও জানি, গাড়ী জোগাড় করতেও আপনার বিশেষ বেগ পেতে হবে না। শুধু গাড়ী একটা জোগাড় করে দিলেই হবে না—দুপুরে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এয়ার

পোর্টে। কিছু মুর্গী আর সেই সঙ্গে ডাক্তার বর্ধণকেও সঙ্গে নিতে হবে।

আমার কৌতূহল বিস্ময়ে গিয়ে পৌঁছয়। ডাক্তার বর্ধন খুব নামকরা ডাক্তার সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি তো মানুষের ডাক্তার নন—জন্তুর। জন্তু জানোয়ারের চিকিৎসায় তাঁর অপ্রতিহত সুনাম আছে বাজারে। তাঁকে মিসেস দস্তিদারের কি প্রয়োজন? মুর্গীই বা লাগবে কিসে?

রহস্য উদঘাটিত হল অবশেষে। অদ্ভুত ঘটনা শুনলাম তারপর। ত্রিপুরার জঙ্গল থেকে দস্তিদার সাহেব এক বিরাট পাইথন ধরেছেন। ভয়ঙ্কর সেই জানোয়ারটাকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরে দমদমে আসছেন। মুর্গী, ডাঃ বর্ধন ও গাড়ীর কথা জানিয়ে তিন পাতার টেলিগ্রাম কাল এসে পৌঁছেচে। তাই মিসেস দস্তিদার সকাল বেলায় আমার কাছে এসে হাজির।

দস্তিদার সাহেবের শিকারের ঝোঁকের কথা আমার জানা আছে। কিছু শিকার তিনি করেছেনও। ড্রয়িং রুমে বিরাট একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া রাখা আছে। কাথবার্টসন হারপারের হাতে পড়ে বাঘের মুখের বস্তু স্বাভাবিক টোনটি আজও চমৎকার জ্বল জ্বল করে। তবে এই জানোয়ারটি যে নীলপাড়ার জঙ্গলে দস্তিদার সাহেব নিজ হাতে শিকার করেছিলেন তাতে গুরুতর মতভেদ আছে। তাই জ্যান্ত অজগর ধরার সংবাদে আমি যে পরিমাণ বিস্মিত হই, চিন্তিত হয়ে পড়তে হয় আমাকে অনেক বেশী।

আমার বিস্ময়ে মিসেস দস্তিদার অতিশয় প্রীত হলেন দেখলাম। তাড়াহুড়ো করে একে তাকে ফোনে সে সংবাদ জানিয়ে দিলেন। সম্ভব হলে হাজির থাকতে বললেন এয়ার পোর্টে।

মিসেস দস্তিদার চলে গেলেন। রামদাস পোদ্দারকে ফোন করে ষ্টেশন ওয়াগনই একটা ঠিক করি। ডাঃ বর্ধনকে মুখরোচক সংবাদটা জানিয়ে দিয়ে দুপুরে উপস্থিত থাকতে বলি দমদমে।

যা ভয় পেয়েছিলাম তাই। ডজন খানেক মুর্গী কিনে আমাদের গাড়ীটা যখন বাঁক নিলে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের দিকে, মিসেস দস্তিদার খুব নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন: সেন সাহেব, খোঁজ পেলেন কিছু?

—খোঁজ! কিসের খোঁজ?

প্রশ্নের জবাব দিলেন না মিসেস দস্তিদার। ক্ষীণ একটু হাসি টেনে আমার দিকে ফিরে তাকান। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন: ভুলে গেছেন। কাজের মানুষ আপনি।

আর ভোলা ঠিক হবে না। তাড়াহুড়ো করে বলি: আপনার কথা আমার মনে আছে। তবে কি জানেন, ভয়ানক বেশী পার্সোনাল ব্যাপার—নিজের তরফ থেকে এ ব্যাপারে খুব একটা কন্সার্ণড্ হয়ে পড়া ভাল দেখায় না। তবে এ রকম কিছু যে একটা ঘটেছে আমার তা মনে হয় না।

প্রসঙ্গটা আমি একটু সহজ করে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফল হল উল্টো। চাপা বিক্ষোভ ফেটে পড়ে মিসেস দস্তিদারের: আপনি কিছুই জানেন না, কোনো খবরই আপনি রাখেন না। ইউ ডোণ্ট নো দ্যাট উইচ্। ওঁকে ভাল মানুষ পেয়ে……। দুচার কথা আমার কানে এসেছে বলেই আজ এ সব কথা ভাবতে হচ্ছে। মিসেস সরকার আসলে খুব নীচু ঘরের মেয়ে।

নীচু ঘরের মেয়ে বলতে ঠিক কি বোঝায়, আর মিসেস সরকার নীচু ঘরের মেয়ে কিনা আমার পক্ষে বলা কঠিন। তবে যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে এটুকু বুঝেছি খুব সহজ স্ত্রীলোক তিনি নন। হাতীর মুখে লাগাম লাগানো হয়তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু দুচারটা মিঠে বুলি আর কৃত্রিম অভিমানের অভিনয়ে দুঁদে অ্যাড্মিনিস্ট্রেটার দস্তিদার সাহেবের টুর প্রোগ্রাম বানচাল করে দিতে পারেন অতি সহজেই।

মিসেস দস্তিদার থামলেন না: এ রকম নির্লজ্জ স্ত্রীলোক সারা কলকাতায় মেলা ভার। আপনি জানেন না এদের জন্যে আমি নিজে কত করেছি। স্বামীটা একটা হোপ্লেস। ব্যারিষ্টারি করে এক কানা কড়িও রোজগার হচ্ছিল না, কি কথায় এই মিসেস সরকার এসে কথা পাড়লেন আমার কাছে। আই বি গাঙ্গুলী তখন জজ, কুমুদবাবু অ্যাটর্ণী—এদের ধরে আমার ঝুলোঝুলিতে উনি কি না করেছেন! তিনটে কোম্পানীর লিকুইডেটার ঝটপট হয়ে গেলেন। হয়ে গেলেন ল কলেজের লেকচারার। দিনের পর দিন কতভাবে যে আমি এদের সাহায্য করেছি……আনগ্রেটফুল।

বানানো কথা নয়। মিসেস দস্তিদারের কথায় মিথ্যে নেই। সোজা ঢঙের সহজ মানুষ উনি। সহজেই হাসতে জানেন, ক্রোধ আর ক্ষোভেও এঁর তাই সহজ প্রকাশ। কিন্তু মিঃ সরকারকে লিকুইডেটার বানাতে গিয়ে নিজেই যে নিজেকে তিনি লিকুইডেশানে পাঠাচ্ছেন, ম্যানেজিং এজেন্সির চাবিকাঠি যে এভাবে বেহাত হয়ে যাবে, তিনি ভুলেও সে কথা চিন্তা করেননি।

দস্তিদার সাহেব মিসেস সরকারের হিতের জন্যে যখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন, মিসেস দস্তিদার তখন সে পটভূমির সম্পূর্ণ অন্তরালে। মেয়েকে শান্তিনিকেতনে রেখে পড়াবেন না কলকাতার ফিরিঙ্গী স্কুলেই বহাল রাখবেন তাই নিয়ে চিন্তা করছেন তখন। বেচারা মিসেস দস্তিদার।

দমদম বিমান ঘাঁটি সরগরম।

জনৈক ভি আই পি এসেছেন শুনলাম। সঙ্গে আছে পুরো একটি সাংস্কৃতিক দল। এয়ার পোর্টের বেরুনোর মুখে লম্বা পুলিশ বেষ্টনী। তীর্থের কাকের মত বিস্তর প্রেস ফটোগ্রাফার নাকের ওপর ক্যামেরা তুলে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দৈনিক কাগজে হামেশাই যে সব সাবেকী জননেতার ছবি দেখি তাদের দু'একটি মুখ চোখে পড়লো।

সব কিছু মিটে যেতে অবশ্য খুব একটা দেরি হল না। অনুষ্ঠান যদি বা কিছু থাকে সেটা সম্পন্ন হয়েছে আগেই।

বেঁটে বেঁটে ফর্সা ফর্সা এক দল ছেলে মেয়ে। হাতে গোলাপের তোড়া। হাতের সঙ্গে, কাঁধের সঙ্গে খালি ক্যামেরা আর ক্যামেরা। অতি উৎসাহী দু'একজন অবিশ্রান্ত-ছবি তুলে যাচ্ছে। তার পর গাড়ীতে উঠে বসলেন সবাই। নতুন একটা ষ্টেট বাস বোঝাই হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

শাদা একটা মার্সিডিজ বেনজ্ পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল থর থর করে। এটা বিশেষভাবে সংরক্ষিত ভি আই পির জন্য। ভদ্রলোকের নাক পর্যন্ত ঢেকে গেছে ফুলের মালাতে। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েক জন উঠলেন

গাড়ীতে। সামনে পেছনে মোটর বাইকের সারি। ধীর গতিতে এগুতে থাকে গাড়ীগুলো। স্মিত হাসির সঙ্গে করজোড়ে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে প্রৌঢ় ভি আই পি দুপাশের ছোট্ট জনতাকে অভিবাদন করছিলেন।

মিসেস দস্তিদার বলেন: এঁরা কোথাকার? চাইনীজ বলে মনে হচ্ছে।

—তাই দেখছি। গাড়ীর সামনে সিল্কের লাল ঝাণ্ডা লক্ষ্য করছেন না?

—এ মার্সিডিজ বেনজ্‌টা কার বলুন তো? চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

—ডি এল তালুকদারের। আজকাল ভি আই পিদের আনা নেওয়ার ব্যাপারে এই গাড়ীটা হামেশাই ব্যবহার হচ্ছে।

—আমাদের ষ্টিভেডোর ডি এল তালুকদার? সব সময়েই মুখে একটা সিগার গোঁজা থাকে?

—আলাপ আছে নাকি?

—সামান্য। বেশ লোক।

—খুব ভাল লোক। স্ত্রীকে লাথি মেরে বোম্বে মেল থেকে ফেলে দিয়েছিলেন। খুব ভাল লোক। কথা নয়, চলুন ভেতরে যাই।

পরিবেশটা ফাঁকা হয়ে গেল কিছুটা। ভেতরে ঢুকে পড়ি। মিসেস দস্তিদারের পরিচিত দু'একজন এগিয়ে এলেন। তার-বেতারে চোলাই হয়ে কোন এক বামা কণ্ঠ যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সংবাদ জানাচ্ছেন। অপেক্ষারত কয়েকজন যাত্রী তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়লেন।

আমি একা পড়ে গেলাম। আবার এগিয়ে এলাম সামনে। কাঁচের শো কেসে সাজানো হাতীর দাঁতের তৈরী কাজগুলি দেখছিলাম। দরদামের গাছ পাথর নেই এখানে। যে জিনিস মুর্শিদাবাদে ত্রিশ টাকা, কলকাতার চৌরঙ্গীতে ষাট, এখানে তার দাম পুরো এক শ'।

বাঙালীর ছেলে জুরিখে নেবে যখন শোনে মিউনিকের প্লেনের দেরী আছে চার ঘণ্টা, তখন সে তার লাঞ্চের কথা ভুলে গিয়ে সোজা দৌড় মারে ঘড়ির দোকানে সওদা করতে।

এখানেও অনেকটা তাই। হাতীর দাঁতের জিনিসের প্রতি বিদেশী দূর পাল্লার যাত্রীদের একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ। তবে কলকাতায় বসে জুরিখের

ঘড়ি পাওয়া যায় স্বচ্ছন্দে কিন্তু ইয়োরোপে হাতীর দাঁত শুধু দুর্মূল্য নয়—দুষ্প্রাপ্যও।

—সৌরীন এখানে খারায়ে খারায়ে কি করতেছো?

ফিরে তাকিয়ে দেখি অনাথ কাঞ্জিলাল। হেঁট হয়ে প্রণাম করি। অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাৎ।

অনাথ কাঞ্জিলাল আমার পিতৃবন্ধু। একই গাঁয়ে বাড়ী। ইউনিভর্সিটির বিপজ্জনক ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে আসামের এক সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ। দীর্ঘ একহারা গড়ন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। দু' হাতে এক রকম জড়িয়েই ধরলেন আমাকে।

সারা দমদম এয়ার পোর্টে একটা পানের দোকানের চিহ্ন না থাকাতে দেখলাম খুশী নন। বললেন: কায়দা করতি করতি হ্যাশটা গেল।

একটা পানের দোকান না থাকার ঔচিত্য সম্পর্কে কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়ে বললেন আমাকে: গোটা তিনেক ইলিশ মাছ নিছি, এক বেলার মধ্যে কি আওলায়ে উঠপেনে? অবশ্য মাটির পাতিলের মধ্যে নুন হলুদে মাখামাখা করে নেওয়া আছে—এ জিনিস তো তুমি শিলংএ পাষ্যা না। তোমরা সাহেব সুয়েব লোক, কিন্তু কাঁচা মরিচ ফালি ফালি কইর‍্যা এই মাছের ঝোলের তো তোমার তুলনা হয় না।

অনাথ কাঞ্জিলালের কথায় আমার মাতামহের কথা মনে পড়ে। আমার মাতামহ কতগুলো দেশী বিদেশী ভাষা জানতেন। তিনি যে একজন শিক্ষিত লোক কাগজ পত্তর বা কোনো রসিদের সাহায্যে প্রমাণ করতে না পারলেও তাঁর পরিচিত মহল তাঁকে কিছুটা ভয়ের চোখেই দেখতেন। তাঁর জানা সব কটা ভাষার ওপর ছিল সমান দখল। কিন্তু প্রচণ্ড রাগ ও চরম বিরক্তি প্রকাশ পেত তাঁর পূর্ববঙ্গীয় একটা বিশেষ গালির মাধ্যমে। অনেক ভাষায় বিশারদ হয়েও ট্রেনের কামরার দখল নিয়ে কোনো সাহেবের সঙ্গে ইংরেজীতে তুমুল তর্ক ও গালাগালির শেষে বেমক্কা সেই বিশেষ ধরণের বিশেষণ প্রয়োগ করতে দেখে বুঝেছি আমার মাতামহের জানা ভাষাগুলোর মধ্যে এমন ফোর্স-ফুল পরিপুরক গাল আর নেই।

চেনা মুখ

কাঞ্জিলাল একজন বহুদর্শী পুরুষ। বহুকাল কাটিয়েছেন দেশে বিদেশে। ইয়োরোপের প্রধান প্রধান সহরে ঘুরেছেন। সেখানকার হরেক রকম ডিশের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ত যখন ফালি ফালি কাঁচা লঙ্কা সহযোগে ইলিশ মাছের ঝোলের স" অন্য কোন কিছুর তুলনা খুঁজে পান না, তখন বুঝতে হয় এ এক ..নস। এক অদ্বিতীয় সামগ্রী। রস ও রসনায় বাঙ্গালকে হারানো মুস্কিল।

কি একটা ঘোষণা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অনাথ কাঞ্জিলাল। বললেন: যাত্যাছি। আমারে ডাকত্যাছে।

হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। সবটা মিলিয়ে মনে হয় যেন দমদম এয়ার পোর্টের কোনো একটা বিমানের তিনি যেন যাত্রী নন। হাতছাড়া যেন না হয়ে যায় গোয়ালন্দ এক্সপ্রেস।

ফিরে এলাম আগের জায়গায়। মিসেস দস্তিদারকে ঘিরে ছোটখাট একটা দল। দু'চার জনকে চিনি। সকলেই দেখলাম কথা বলছেন। দস্তিদার সাহেবের পাইথন ধরবার কাহিনীর জের টেনে জন্তু জানোয়ারের প্রসঙ্গ উঠেছে বোধ হয়। আমার বুকের কাছে যে ভদ্রলোকের মাথা ফুরিয়ে গেছে সেই অতিশয় স্মার্ট ভদ্রলোক সামনের এক স্থূলাঙ্গিনীকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে সুন্দর বনের সব বাঘই ম্যান ঈটার। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গিয়ে সুন্দর বনের গঠন এবং সেখানকার ভৌগলিক আদলখানা ভদ্রমহিলার জ্যামিতিক ঢঙে ছাপা সিল্কের শাড়ীর আঁচলের প্রান্তভাগ দু'হাতে পাট করে ধরেছেন। ভদ্রলোক তাঁর বক্তব্য যখন শেষ করলেন, কাঁধের ফস্কে যাওয়া আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে স্থূলাঙ্গিনী কিন্তু অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন: আপনি নাকি এক্সটেন্‌শান পাচ্ছেন শুনলাম?

আচমকা ব্রেক্ কষলে গাড়ীর যেমন অবস্থা হয় স্থূলাঙ্গিনীর কথার ধাক্কা সামলাতে অনেকটা যেন সেই অবস্থা হলো ভদ্রলোকের। জবাব কি দিলেন শুনতে পেলাম না। সিগারেট ধরাতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

নন্দিনী হোম চৌধুরী ছিলেন আমার পাশে। দেখলাম মওকা পেয়ে দস্তিদার সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করেছেন। ভদ্রলোকের চাকুরী জীবনের পেছনে চোখ ধাঁধানো সে রকম কোনো ট্রাডিশন নেই। আদন্তে

বি সি এস্। সিনিয়রিটির ফেরে পড়ে ধানের আলের ওপর দিয়ে সাইকেল করতে হয়েছে। সাব ডেপুটি হয়ে টানা পাখার হাওয়া খেয়েছেন দীর্ঘকাল। পার্টিশানের পর মাথার ওপরের তিন জনের নাম রাতারাতি সিভিল লিষ্ট থেকে উধাও হয়ে গেল। মুসলমান তিন সিনিয়র অফিসার অপ্‌শান দিয়ে চলে গেলেন ঢাকায়। দস্তুর মত হ্যাট্‌-ট্রীক্‌ করে বসলেন হোম চৌধুরী। জয়েণ্ট সেক্রেটারি হয়ে কলকাতায় এলেন। বছর খানেক পরেই ইমার্জেন্সী রিক্রুটের তালিকায় নাম বেরুল। এখন আই. এ. এস্।

ভারসাম্য বজায় রাখতে কিছুটা বিব্রত হয়েছিলেন প্রথমে। নেহাতই ভার্ণাকুলার স্ত্রীর পান দোক্তা বরদাস্ত করতে পারেননি তিনি। স্ত্রীর ছিল গানের গলা। তবে তাঁর গলায় 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' শুনে ভদ্রলোকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছিল। ফিরিঙ্গী পাড়ায় স্পোক্‌ন্ ইংলিশের ক্লাশে গোপনে স্ত্রীকে ভর্তি করেন। কিন্তু পাগলার মনকে বাঁধা শক্ত। বড়ই সে খামখেয়ালী। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে হয়তো সে মজা দেখছিল। প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলেন ভদ্রমহিলা। বলেছিলেন: মাস তিনেকও তুমি আমার শরীরটা ঠিক থাকতে দেবে না?

বানচাল হয়ে গেল সমস্ত প্ল্যান। ছোট্ট নরম দুটো মুঠোতে যেন নিংড়ে নিয়ে গেল হোম চৌধুরীর সমস্ত পরিকল্পনা।

বছরখানেক আগেকার কথা। সে এক দুর্যোগের রাত। নার্সিং হোমের করিডরে হোম চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। আমার পরিচিত কে যেন ছিলেন তখন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা চলেছে হোম চৌধুরীর। শ্রীমতী সুস্থ আছেন তবে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে শিশুটি সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হোম চৌধুরী বললেন: আপনাকে পেয়ে ভালই হল। আমাকে গড়পারে কাইগুলি একটু লিফ্‌ট দিন। ঠিক ধরেছি। বাচ্চাটার শনির স্থান মোটেই ভাল নয়, মহারাজের দৃষ্টি আছে। নিবারণ আচার্যের সঙ্গে একটু বসতে হবে। বিয়ে থা করেননি মশাই, বেঁচে গিয়েছেন।

গড়পার পর্যন্ত গাড়ী আমার গড়িয়ে গেল স্বচ্ছন্দে। নিবারণ আচার্যের বাড়ী আজও আমার ভোলা মুস্কিল। কানা গলি থেকে সদর রাস্তায় পৌছতে আমার পুরো আধ ঘণ্টা লেগেছিল। মোটর ভেহিকল্‌সের সার্জেণ্ট ভাগ্যিস

সে গলির সন্ধান জানেন না। নচেৎ গলিতে গাড়ী ঢুকিয়ে মিষ্টি হেসে যদি গাড়ী ব্যাক করতে বলেন, তাহলে আর ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হবে না কোনো বাছাধনের।

গড়পারের কানা গলিতে সেদিন হোম চৌধুরীকে ছেড়ে এসেছিলাম। মাঝে দেখা দু' একবার। অতি সামান্য সাধারণ কথার হয়েছে আদান প্রদান।

অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকবার ওনাকে ঘড়ি দেখতে দেখে বলি: কাজ কিছু ফেলে এসেছেন মনে হচ্ছে।

—তা ছিল। তা ছিল। কাজ কিছু ছিল। তবে দেখেই যাই। ফোনটা আবার আমি শেষ সময়ে পেলাম কিনা। আমি অবশ্য কিছু আগেই এসে পড়েছি। আগে বুঝলে ডাক্তারের সঙ্গে দেখাটা শেষ করেই আসতাম।

—ডাক্তার! কি হল আবার?

—উনি আবার হাসপাতালে আছেন কিনা। তবে কি থেকে একটা ইন্‌ফেক্‌শান হয়েছে। ওর প্রবল জর হচ্ছে কদিন। রিণ্টু হবার সময়ও ওনার ঠিক এই রকম হয়েছিল। অফ্ কোর্স চাইল্ড ইজ ও. কে. আট পাউণ্ড বেবি—একটা খেলাখেলি কথা তো নয়।

সবে ধরিয়েছিলাম সিগারেটটা। ঠোঁট থেকে খসে পড়ল।

রয়েল বেঙ্গলের জেষ্টেশান্ পীরিয়ড নিয়ে খর্বকায় অতি স্মার্ট ভদ্রলোক যখন জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিচ্ছিলেন, ডাক্তার বর্ধন হন্তদন্ত হয়ে এসে জানালেন, দস্তিদার সাহেব আসছেন।

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের তেরছা টানে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দস্তিদার সাহেব এগিয়ে এলেন। দোহারা গড়নের মানুষটি অসম্ভব রকম তড়িঘড়ি। কাছে এসে মিঠে হাসি ঠোঁটে নিয়ে দুর্মূল্য সিগারেট তুলে ধরলেন সবার সামনে। সে হাসিতে কূটনৈতিক পিঠ চাপড়ানো নেই। যেন যুদ্ধপ্রত্যাগত ক্লান্ত এক সৈনিক ঘরে ফিরে চলেছেন। অতি সাধারণ পোশাক। খাকি ট্রাউজারের সঙ্গে শাদা সার্ট। টাই নেই। কাঁধের সঙ্গে ঝোলানো বিদেশী এক বিমান কোম্পানীর নাম খোদাই করা ব্যাগ। মাথার চুলগুলো কাত করে আঁচড়ানো।

মিসেস দস্তিদারের সঙ্গে দুচার কথা বলেন আর আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসেন। বললেন: ডজন খানেক মুর্গী এনেছ সেন—ইউ আর সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল। বেচারা তিন দিন ধরে কিছু খায়নি।

এক ফাঁকে এয়ার পোর্টের কারগো মুভমেণ্ট অফিসার কি যেন বলে গেলেন। সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন দস্তিদার সাহেব।

কাঠের বিরাট একটি বাক্সে পাইথন অনেক আগেই যে এসে হাজির সে তথ্য আমাদের কারও জানা ছিল না।

ডাঃ বর্ধন কিন্তু গোলমাল করে দিলেন সব। বললেন: হাংগ্রি পাইথন ইজ ডেঞ্জারাস। ক্রেট এখানে খুলে ফেলা ঠিক হবে না—কাল সকালে যা হোক করা যাবে।

স্থূলাঙ্গিনী মহিলাটি দস্তিদার সাহেবের গায়ে যেন ভেঙ্গে পড়লেন: পাইথনটা কি জু'তে প্রেজেণ্ট করবেন দস্তিদার সাহেব?

দস্তিদার সাহেব রসিকতা করে বলেন: আপনার ড্রয়িং রুমের শোভা বাড়াতে চাইলেও আমার আপত্তি নেই।

অপেক্ষাকৃত কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল মিহির। কাঁধে ক্যামেরা। দস্তিদার সাহেবের ষ্টেনো। ছেলেটাকে আমি জানি। আমার ভাই তেজুর সহপাঠী ছিল। হামেশা যাতায়াত করে আমাদের বাড়ী। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা পাশ করে সরকারী বহু দপ্তর ঘুরে আজ দস্তিদার সাহেবের কাছে এসে ঠেকেছে।

ইশারায় কাছে ডাকি। বলি: খুব প্লেনে যাতায়াত করছ আজকাল দেখছি।

কি যেন বলতে চাচ্ছিল মিহির, হুড়মুড় করে এগিয়ে এলেন দস্তিদার সাহেব: মিহির, তুমি এখনও আছো?

সংকুচিত হয়ে মিহির বলে: আমি এখন তাহলে স্যর যেতে পারি?

কথা কেড়ে নেন দস্তিদার সাহেব: নিশ্চয়ই! তুমি এয়ার—ওয়েজের বাসে চলে যাও। ধর্মতলা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে নেবে।

পকেট থেকে ব্যাগ টেনে বার করেন। একটা দশ টাকার নোট মিহিরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন: ট্যাক্সি ফেয়ার সঙ্গে রাখো।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও মিহির টাকাটা নিতে বাধ্য হয়। কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে দস্তিদার সাহেব বলেন: কাল সকালে এসো বাড়ীতে। আচ্ছা, এখন তুমি যাও।

নমস্কার সেরে মিহির চলে গেল। আমার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে দস্তিদার সাহেব বলেন: তুমি পালাবে না সেন! তোমাকে আমার দরকার আছে।

কারগো মুভমেণ্ট অফিসার দস্তিদার সাহেবকে কি যেন ব'লতে ব'লতে এগিয়ে গেলেন সামনে। ডাক্তার বর্ধণকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিলেন।

ঠিক এই সময় এক কাণ্ড ঘটলো। মিসেস দস্তিদার দেখলাম আমাকে কিছু বলতে চাইছেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াই। রুদ্ধকণ্ঠে বলেন: ঐ যে আপনার 'কৃষ্ণকলি'! দেখেছেন, স্বামীটাকে সঙ্গে আনেনি। খবরই বা পেল কোথায়?

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মিসেস সরকার। দৃশ্যমান জগতের অতি সামান্য কিছুই তাঁর চোখে পড়ে। সে দৃষ্টির সামনে আমরা সবাই যেন কিছুটা আবছা। জ্যাবজ্যাবে। ব্লটিং পেপারে কালির আঁচড়ের মত নয়, অনেকটা যেন ক্যামেরায় তোলা ক্লোজ-আপ ছবির পেছনের পারস্পেকটিভ-এর মত। আউট অব ফোকাস।

মিসেস সরকারকে 'কৃষ্ণকলি' নামে অভিহিত করবার পেছনে সামান্য এক ইতিহাস আছে। মিত্র সাহেবের কাছে সামান্য রসিকতা করে কি বলেছিলাম; এখন দেখছি কথাটি পৌঁছেচে বহুদূর।

গোলাপের পাঁপড়ির মত হয়তো নয়, কিন্তু এর চেয়ে গায়ের রঙ ফরসা হ'লে মিসেস সরকারকে এত ভালো দেখাতো না। জনশ্রুতি আছে কবিগুরু ময়না পাড়ার মাঠে কালো মেয়ে হয়তো দেখেছিলেন ঠিকই কিন্তু কালো হরিণ চোখের সাক্ষাৎ আদৌ সেখানে মিলেছিলো কিনা সে বিষয়ে নাকি ঘোরতর মতভেদ আছে। মিসেস সরকারকে দেখেই নাকি কবিগুরু 'কৃষ্ণকলি' রচনা করেন।

খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাসে শাড়ীর আঁচল বিছিয়ে আলতো ক'রে বসেছিলেন। তার ডাগর কাজল আঁখি ঈশান কোনের কালো মেঘে উধাও হয়েছিলো। কবিগুরু নাকি সেদিন ঠিকই চিনেছিলেন।

সেই দুপুরেই ডাক এলো। মিসেস সরকার তখন সবুজ গাছের এক ফালি ছায়ার আড়ালে অজন্তা-ইলোরা ঘুরে আসা ভবঘুরে এক জাপানী চিত্রকরের ঠোঁটে 'ইণ্ডিয়ান কনসেপশন অব ব্রেস্ট্' শুনছিলেন ব'সে। দুষ্টু দুষ্টু হাসি পাচ্ছিলো। মজাও হচ্ছিলো শুনে।

মিসেস সরকার তখন বাঁশরী স্বর। তখন কণ্ঠেও ছিলো বাঁশির স্বর। ডাক শুনে নৃত্যের তালে তালে, আঙুলে জড়ায়ে এলোচুল, মুঠিতে ছিলো বনফুল, কণ্ঠে নিয়ে বাঁশির স্বর 'উদয়নে' এলো বাঁশরী স্বর।

সুরেলা কণ্ঠ ঝরে পড়েঃ গুরুদেব, আমাকে ডাকা কি কারণে।

কবিগুরু নাকি বলেছিলেনঃ সকারণে! আহ্বান নয় অকারণে। ভরা দুপুরে তোকে কষ্ট দিলেম, তবু কেন যেন তোকে ডেকে নিলেম। ছন্দ আছে, সুরও আমার হাতে আছে, তোর কণ্ঠটুকু শুধু আমি চেলেম। গা তো আমার কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলায় দেতো।

আন্দামানের কমিশনার হ'য়ে যাচ্ছেন সুনির্মল মিত্র। মিত্র সাহেবের ফেয়ারওয়েল পার্টি সেদিন জমজমাট। দু'দে দু'দে এডমিনিস্ট্রেটার আর ডজনখানেক কেউ কাউকে সহ্য ক'রতে পারেন না, এমন হালফ্যাশনের বিভিন্ন মাপের বঙ্গ ললনায় গ্রেট ইষ্টার্ণের চাইনিজ উইং সেদিন সরগরম।

'কৃষ্ণকলি' কবিতা ও গানের প্রামান্য এই চমকপ্রদ কাহিনী মিসেস সরকারের মুখেই আমি সেদিন প্রথম শুনি।

কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'রে দস্তিদার সাহেব বলেছিলেনঃ আপনি এই সব রেমিনিসেন্স গুলো লেখেন না কেন। দু' একটা ছাপানোর মত কাগজ বাজারে আছে।

বিস্বাদে মন ভরে ওঠে। আমার মুখটা কেমন তেতো হ'য়ে গেল মুহূর্তে। বিয়ারও নয়, দুর্মূল্য অতি সুন্দর পানীয়ই ছিল আমার হাতে। দায়িত্বহীন আজেবাজে তুচ্ছ কথা শুনতে গেছি। ঘটা করে এর-ওর-তার চারিত্রিক উঞ্ছবৃত্তির রসাল গল্পও হয়তো দুর্মূল্য পানীয়ের সঙ্গে আমার মন্দ লাগতো না। কিন্তু কবিগুরুকে কেন্দ্র ক'রে মিসেস সরকারের এই মর্মান্তিক অপভাষণ আমাকে বড় আহত করে। মিসেস সরকারের ঠোঁটের হাস্যকর মিথ্যেকথা আমাকে পীড়িত করে অনেকটা।

চেনা মুখ

একে দালাল মানুষ। বিত্তের বহরও আমার নিতান্ত আঁটোমাপের। দস্তিদার সাহেব আমার মক্কেল। মিসেস সরকারকে আমার বড় প্রয়োজনও।

অনেক কষ্টে নিজেকে সেদিন সংযত করেছিলাম। মাঝে একবার মনে হয়েছিলো কিছুটা আড়ালে ডেকে বলি : ভদ্রে, আমার মত পাঁড় মূর্খ লোক ছাড়াও দেশে মানুষ আছে। আর যাই করুন, কাগজে কিন্তু রেমিনিসেন্স ছাপতে যাবেন না। কবিতা লিখতে জানিনে কিন্তু আঁক কষতে বাধা কি? আপনার কাহিনীতে যদি কিছুমাত্র সত্যি থাকে তবে আপনাকে আজ সত্তরের কোঠায় পৌছনো উচিত। 'কৃষ্ণকলি' কবিতা রচনা ১৩০৭ সালে। 'ক্ষণিকা'য় এই রকম পাওয়া যায়। ওলো কৃষ্ণকলি, তখন তুমি কোন্ দেশেতে কোথায় ছিলে আঁধারে? ইচ্ছা হ'য়ে ছিলে বোধ হয় কারও মনের মাঝারে।

স্থূলাঙ্গিনী মহিলাটি ছুটে গিয়ে হিড়হিড় করে টেনে আনলেন মিসেস সরকারকে। কপালের নিচের কালো পেন্সিল স্কেচ্ (যেটাকে ভ্রূ বলে সকলে ভুল করে চলেছেন) ভেঙ্গে পড়েছে স্থূলাঙ্গিনীর : হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! আপনার এত দেরী, দূরে দাঁড়িয়ে কেন?

সাদা একটা সিল্কের শাড়ী আঁট করে দেহের সঙ্গে লেপটানো। মানিয়ে পরা হাতা চাঁচা ব্লাউজে সাদা জাফরি কাটা বর্ডার। মাথার চুল সুন্দর উঁচু করে ডোনাট করা। সীমন্তে সিঁদুর নেই। গলায় কোনো কিছু নেই। দু'হাতে দু'গাছি বালা। মণিবন্ধে ছোট্ট গোল ঘড়ি। টানা টানা চোখ দুটোতে ক্লান্ত জড়িমা। কণ্ঠস্বরেও যেন নেমেছে শ্রান্তি। ধীরে একবার সকলের ওপরে দৃষ্টি বুলিয়ে করজোড়ে কিছুটা কাছে এসে বলেন : ভালু আছেন?

হোম চৌধুরীর সঙ্গে এক অত্যাবশ্যকীয় বিশেষ আলোচনায় ডুবে যান মিসেস দস্তিদার। মিসেস সরকারের উপস্থিতি যেন টেরই পাননি।

ফিরে এলেন দস্তিদার সাহেব। পেছনে জনা তিনেক ভদ্রলোক।

স্মার্ট ভদ্রলোক আমার কনুই স্পর্শ করে বলেন : এই-রে প্রেস।

বাতাসের আগে কথা আদৌ ছোটা যদি সম্ভব হয় তবে সে কথা আগে গিয়ে পৌছোয় সংবাদপত্র অফিসের রিপোর্টারের কানে।

তিন ভদ্রলোক যেন ত্রিমুখী আক্রমণ সুরু করলেন। চটপট কতগুলো ছবি তুলে নিলেন।

হেসে প্রথমটা উড়িয়েই দিলেন দস্তিদার সাহেব। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে কোনো রকম মন্তব্য করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু এঁদের নিবৃত্ত করবে কে? কিছু বলতেই হল দস্তিদার সাহেবকে।

ঠোঁটে হেসে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন। তার পর রোমাঞ্চকর পাইথন ধরার কাহিনী বর্ণনা করলেন। ইংরেজি বাংলায় মেশানো অতি প্রাণবন্ত সে বর্ণনা। শেষের দিকে দস্তিদার সাহেব ধীরে ধীরে বলে চলেন:

A hungry python is a dangerous beast I admit. When it darts towards anybody with its mouth wide open that is horrible ......but I don't consider it more horrible than any dangerous motor car. Furthermore, in this connection I should say, in the wood, in the evergreen forest, I found the symphony of life, and an equilibrium of nature where tiger and deer, carnivora and herbivorous animals make room for each other, for their own survival. It is a lesson, and nay warning to us. We can very well link up this lesson with international politics. Communist and Imperialist countries can get a better and clear understanding from this mute wild philosophy which leads them to believe in peaceful co-existence.

অতি সুন্দরভাবে দস্তিদার সাহেব বক্তব্য শেষ করলেন।

ডাঃ বর্ধনের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলতে বলতে ছোট দলটি সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেন।

আমার আনা ষ্টেশন ওয়াগানটাতে পাইথনের কাঠের বাক্সটা তোলা হয়েছিল। এয়ার পোর্টের দু'একজন কর্মচারী ছুটোছুটি করছেন।

দস্তিদার সাহেব বলেন: দেখ সেন, আমি এখনও ফাইনালি কিছু ঠিক করিনি কোথায় দেব এটাকে। অফ কোর্স আই হ্যাড এ টক উইথ মিঃ ত্রিপাঠী। এখনকার মত আমি কিউরেটর মিঃ শীলের ওখানে রেখে আসবো।

মিসেস সরকারের দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বলেন: দেবীর আগমন হয়েছিল কিসে? আপত্তি না থাকলে স্বচ্ছন্দে গমন করতে পারেন আমার

সঙ্গে। মিসেস দস্তিদারকে সামনে দেখে পরের কথাগুলো অন্য গতিতে বয়ে গেল : ইউ ক্যান ভেরি ওয়েল কাম উইথ মি মিসেস সরকার।

তারপর যেন জবাবদিহির ভঙ্গীতে বলেন মিসেস দস্তিদারকে : তুমি আর সেন সাহেব এসো বর্ধনের গাড়ীতে। খামাখা তোমরা আবার কেন কষ্ট করবে উল্টোমুখো গিয়ে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই লাফ দিয়ে উঠে বসলেন। হাত বাড়িয়ে সন্তর্পণে পাশে তুলে নিলেন মিসেস সরকারকে।

গর্জন করে গাড়ী গতি পেয়ে ছুটে চলে। বাঁকের মুখে অপস্রিয়মান গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে মিসেস দস্তিদার বলেন : মিসেস সরকার এসেছিলেন কার গাড়ীতে ?

আমি নিরুত্তর।

—আচ্ছা সেন সাহেব, এ্যানাসিন পাওয়া যায় না এয়ার পোর্টে ?

মুখের প্রসাধন গলে নেমেছে। থলথলে দেহভার ঘিরে শাড়ীটাও কেমন লাট হয়ে গেছে। মিষ্টি করে বলতে চেষ্টা করি : চলুন, পথে কিনে নেব। এবার ফেরা যাক।

গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পাইপে তামাক পুরছেন ডাঃ বর্ধন। অন্য গাড়ীগুলো হুসহুস করে বেরিয়ে গেল। স্থূলাঙ্গিনীর পাশে জায়গা করে নিয়েছেন হোম চৌধুরী। হাঁটুর ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়েও মরিস্ মাইনরে দরজা লাগাতে নাজেহাল হচ্ছেন ভদ্রলোক।

ডাঃ বর্ধনের গাড়ীতে উঠে বসি। মিসেস দস্তিদার বলেন : ডান দিকের কাঁচটা নামিয়ে দেবেন সেন সাহেব ?

পরদিন সকালে কাগজে যে সংবাদ পাঠ করলাম তার বাংলা তর্জমা অনেকটা এই রকম :

জীবন্ত অজগর ধৃত

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আগরতলা হইতে চল্লিশ মাইল দূরে ঘন গভীর জঙ্গল শ্রী এ. আর. দস্তিদার আই-সি-এস্ একটি বিপুল পাইথন জীবন্ত ধরিতে সক্ষম হন। অন্য

সেই পাইথন সঙ্গে লইয়া শ্রীদস্তিদার বিমানযোগে দমদম বিমান ঘাঁটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ষ্টাফ রিপোর্টারের সহিত এক সাক্ষাৎকারে শ্রীদস্তিদার বলেন, আর্ত চিৎকার অনুসরণ করিয়া গভীর জঙ্গলে ঢুকিয়া তিনি দেখেন, একটি কুকি যুবক-কে শত পাকে জাপটাইয়া এই পাইথন উন্মাদের মত পিষিয়া চলিয়াছে। ক্ষিপ্রতার সহিত ল্যাসো আর লাঠির সাহায্যে প্রায় আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া এই দানবটিকে কৌশলে শ্রীদস্তিদার আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হন। তবে সেই কুকি যুবকের প্রাণ রক্ষা পায় নাই। পাইথনটি লম্বায় প্রায় বিশ হাত। বিখ্যাত .পশু চিকিৎসক ডাঃ টি. সি. বর্ধন দমদম বিমান ঘাঁটিতে পাইথনটি-কে পরিক্ষা করেন।

দমদমের কারগো মুভমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত ট্রাফিক অফিসার শ্রী কে. কে. পোখ্‌রয়াল, ক্যাপ্টেন ভরদ্বাজ, ফ্লাইট অফিসার এস. ডি. চক্রবর্তী ও শ্রী আর. সেন গুপ্ত এই পাইথন বহনের তদারক করেন।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, এই পাইথনটি সুদানের বালকবালিকাদের উপহার দিবার প্রস্তাব লইয়া উচ্চ মহলে গভীর রাত অবধি আলোচনা হয়।

দিন দশেক পরের কথা। সারাদিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যের আগেই বাড়ী ফিরেছি। হাতে কোনো কাজ নেই। পাশের ঘরে দেখলাম দস্তুর মত তর্ক চলেছে। আমার ভাগ্নী দীপু একজনকে বোঝাতে চাইছে—আধুনিক কবিতাকে আগে কবিতা হতে হবে, তারপর তার আধুনিকতার বিচার। আধুনিক কবিতা ভাল লাগে কারণ সেটা আধুনিক বলে নয়—কবিতা বলেই।

স্রেফ চুরি। দীপুর সামান্য রকমও মৌলিকতা নেই। অন্যের পুরোনো কথাগুলো বলে কাকে যেন সে জ্ঞান দিচ্ছে।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় তেজু এসে ঘরে ঢুকলো। বলল যে, মিহির এসেছে। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ডেকে পাঠাই মিহিরকে।

ছোকরাকে আমার বেশ লাগে। কথাবার্তায় জড়তা নেই। সঙ্কোচ নেই চালচলনে। যথেষ্ট বিনয়ী। হাতের সিগারেট লুকিয়ে আমাকে সম্মান দেখানোর সামান্য চেষ্টাও সে করে না।

হাতে নেই কাজ। তাছাড়া দস্তিদার সাহেবের পাইথন ধরার কাহিনীটা মিহিরের মুখ থেকে শোনবার আমার ইচ্ছেও ছিল। মিহির এসে ভালই করেছে।

হিম্মত আছে ছেলেটার। পোশাকে-আশাকে দারিদ্র্যের ছাপ আছে সত্যি কিন্তু দীনতা নেই। বোনের বিয়েতে দুহাতে টাকা ধার করেছে। সে ধার শোধও করেছে। পণপ্রথার বিরুদ্ধে জোরালো বক্তৃতা দিয়ে দায়িত্ব সারেনি। কঠিন বাস্তব সমস্যা পীড়ন করে অহরহ। কিন্তু আমার ভাল লাগে, মিহির সে কথা শুনিয়ে অপরকে পীড়িত করে না। নিজের ব্যর্থতা অপরের পকেটে ঢুকিয়ে কোনো এক বিশেষ গৃহপালিত জীবের মত মাথা বাড়িয়ে হাত বুলিয়ে দেবার অনুরোধ করে না ভাসা ভাসা চোখে।

মিহির এসে ঘরে ঢুকলো। এক নজর তাকিয়ে বলি: আজকাল খুব জন্তু জানোয়ার ধরে বেড়াচ্ছো। আচ্ছা চাকরী জুটিয়েছ যা হোক।

কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বসে পড়ে বললে মিহির: কিন্তু সে চাকরী যে আমার যেতে বসেছে।

—কেন?

—আর কেন।

—তুমি তো দস্তিদার সাহেবের সঙ্গেই আছ?

—ছিলাম।

—ছিলে? তোমার তো পাকা চাকুরী।

—দস্তিদার সাহেব আমাকে সস্পেণ্ড করে রেখেছেন।

বিস্মিত হই মিহিরের কথায়: তোমাকে এয়ার পোর্টে দেখলাম সে দিন। দেখে মনে হল, পছন্দই করেন দস্তিদার সাহেব। সস্পেণ্ড করেছেন। কি করেছ তুমি?

—উনি লম্বা এক চার্জ এনেছেন। আমি নাকি গোপন ফাইল লুকিয়েছি। গেজেটেড্ অফিসারদের কন্‌ফিডেন্‌শ্যল রির্পোট হারিয়েছি।

—হারালে কি করে?

মাথা সামান্য দুলিয়ে ম্লান হেসে মিহির বললে: হারায়নি। সম্পূর্ণ গট্ আপ্ কেস।

পা গুটিয়ে বসতে হল আমাকে। বললাম : আমি দস্তিদার সাহেবকে জানি। তিনি এ রকম কোনো মিথ্যা অভিযোগ তুলে……আর সে সব তিনি করতে যাবেনই বা কেন ?

—আমি আপনার কাছে তদবিরে আসিনি। দস্তিদার সাহেবকে আপনি জানেন, আমি জানি। বিশেষ পরিচয়ই আছে আপনার সঙ্গে, কিন্তু এ সব আপনি জানেন না। চাকরি হয়তো যাবে, আর সরকারী চাকরির মোহও আমার গেছে। অসুবিধে হবে, জুটেও যাবে একটা কিছু।

বিচলিত দেখলাম মিহিরকে।

—শুধু শুধু এ রকম কেন করলেন দস্তিদার সাহেব ?

—কারণ আছে।

—কি কারণ ?

—সেই কথাই আজ আপনাকে বলতে এসেছি। দস্তিদার সাহেব আজকে এ সব কথা আমাকে বলতে বাধ্য করছেন। পাইথনের কথা নিয়ে আমি কোথাও কিছু বলিনি। মাথুর সাহেব সম্ভবতঃ কিছু ফাঁস করে থাকবেন। কিন্তু আমিও আজ এ সব না বলে থাকতে পারছি না। চাকরি যাচ্ছে বলে নয়, আমার মাথায় কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কাকে বলব ? তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম। আমার পকেটের ছবিগুলো থেকেও আপনি কিছুটা আন্দাজ করতে পারেন।

মিহির সুরু করলে :

আগরতলা থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে জিওলজিক্যাল সার্ভের তাঁবু পড়েছিল। কোনো কিছুর সন্ধানে এসেছিলেন ভি এস্ মাথুর। তিনি ছিলেন দলের নেতা—এঞ্জিনীয়ার।

মাথুর সাহেবের অনুরোধে দস্তিদার সাহেব দু রাত্রের অতিথি হয়ে এসেছিলেন এই তাঁবুতে। জিওলজিষ্ট এসেছিলেন মাটির টানে। কৌতূহলী মন দস্তিদার সাহেবের। জঙ্গলের ভবঘুরে কুকি, রিয়াং ও মগদের বিচিত্র জীবনযাত্রা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। সবুজ ঘন অরণ্যের মধ্যে ছোট ছোট টিলার উপর বাঁশ পাতার ছাউনিতে ঘেরা সুন্দর ঘর। সহজ সরল অর্ধউলঙ্গ

নরনারীর শান্ত নীরব জীবনযাত্রা কিছুটা নতুন লেগেছিল তাঁর চোখে। জংলা উঁচুনীচু পথে পথে সন্ধান করেছেন খরগোশ আর বুনো মুরগীর।

পরদিন দুপুর বেলা তাঁবুর বাইরে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে ইন্সপেক্‌শান নোট তৈরী করছিলেন দস্তিদার সাহেব। মিহির দাঁড়িয়ে নোট নিচ্ছিল।

মাথুর সাহেব দলবল নিয়ে গিয়েছিলেন পুবমুখো। দিনটা ছিল মেঘলা। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিল বাইরে। বিচিত্র পাখীর বিচিত্র কলরব আনমনা করে দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। ঠিক এই সময়ে একটা চিৎকার শোনা গেল। মানুষের গলা। শান্ত পরিবেশকে আচমকা এক ঝাঁকুনি দিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

কি ভেবে দস্তিদার সাহেব মিহিরকে ডাকলেন। বললেন : শুনলে কিছু ?

—চিৎকার শুনলাম একটা।

—ঠিক শুনেছ। তুমি এগিয়ে দেখ। সামথিং রং।

জঙ্গল আর জঙ্গল। কোন দিকে যাবে মিহির ? উত্তরের কিছুটা দূরের গাছগুলো থেকে এক ঝাঁক পাখী অস্বাভাবিক চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। মিহির সেই দিকেই পা বাড়ায়।

মিহিরের যে পরিমাণ কৌতূহল, ভীতি তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। অচেনা অজানা জায়গা। কাল রাত্রে আবার গল্প শুনেছে যে উঁচু পাহাড়ে 'জুমের' আগুন লাগানো হয়েছে। বাঘের উৎপাত নাকি বেড়েছে এ অঞ্চলে। পথটা ঢালু হয়ে গেছে খানিকটা এসে। মাটির ধ্বস্ নাবায় জায়গাটা অপরিষ্কার।

হঠাৎ নজরে পড়ল। নেহাত-ই অবিশ্বাস্য। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হয় না মিহিরের। বিরাট একটা পাইথনের সঙ্গে একটা কুকি যুবকের যুদ্ধ চলেছে। ভয়ঙ্কর সেই সরীসৃপের মুখটা শক্ত দড়ির ফাঁসে আটকানো। গাছের ডালে পাক খাওয়া সে দড়ির অপর প্রান্ত কুকি যুবকের হাতের মুঠোতে। কিন্তু পাইথনের দেহটি যে পরিমাণ দীর্ঘ ফাঁসের দড়িটি সে পরিমাণ লম্বা নয়। শিকারীর পক্ষে তাই অসম্ভব হয়ে উঠেছে এই ভয়ঙ্কর জানোয়ারকে শাসনে আনা।

বেচারা মিহির। মুহূর্তে গলা শুকিয়ে গেল। হাঁটু এল ভেঙে। সবল চওড়া কুকি যুবক মুখে নানা রকম শব্দ করছে। পাইথনের লম্বা লেজের ঝাপ্‌টা সে লাফিয়ে লাফিয়ে ব্যর্থ করে দিচ্ছে বার বার। দড়ির ফাঁস বড় করে বসেছিল গলায়।

কতক্ষণ এই ভাবে গেল মিহিরের খেয়াল নেই। শুকনো পাতার ওপর পায়ের আওয়াজ পেয়ে মিহির ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে দস্তিদার সাহেব। মুখে সিগারেট। হাতে রাইফেল। ইশারায় মিহিরকে পিছনে যেতে বললেন। কোণাকুনি ভাবে তুলে ধরলেন রাইফেলটা।

চরম মুহূর্ত। গর্জে উঠল রাইফেল। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মিহির দুটো ছবি তুলে নিল সে সময়ে। দস্তিদার সাহেব বলেন, কুইক্। ডান দিকে নামার রাস্তা আছে। লোকটাকে পালাতে দিও না, মিহির। দ্যাট্ বাগার ডিজার্ভস্ এ গুড থ্র্যাশিং।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সামনে এগিয়ে আসেন। মরা গাছের ডাল ধরে গড়িয়ে নামলেন ঢালুতে। কিন্তু এ কি করলেন তিনি? আচমকা এক বিস্ময়োক্তির সঙ্গে খসে পড়ল রাইফেলটা হাত থেকে।

কুকি যুবকের কালো চকচকে দেহটি রক্তে সিঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বুক ও পেট বিদীর্ণ হয়ে গেছে। থরথর করে কয়েকবার কেঁপে স্থির হয়ে গেল দেহটা। সেই বিশাল সরীসৃপ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত।

উচ্ছৃঙ্খল জনতার ওপর গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়েছেন দস্তিদার সাহেব বহুবার। শক্ত ধাতুতেই তৈরী তাঁর মন। কিন্তু হাত পা কেমন অসাড় হয়ে উঠেছিল। মাথা নীচু করে বসে পড়লেন মাটিতে। নিজের ডান হাতটা বাঁ হাতে নিয়ে দেখতে থাকলেন।

গুলির আওয়াজ পেয়ে মাথুর সাহেব দৌড়ে এলেন লোকজন নিয়ে। আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে অত্যাবশ্যকীয় কি যেন পরামর্শ করলেন। হতভম্ব মাথুর সাহেবের সবটা বুঝতে বেশ কিছুটা সময় লাগল।

মাথুর সাহেবের নির্দেশে বন্য কালো কালো মরদে লাঠি আর মাদোল নিয়ে ছুটে এল। চক্রাকারে বনাঞ্চল ঘিরে ফেলে অন্বেষণে লেগে গেল সেই পাইথনের। জানোয়ারটা ধরা পড়ল কিছুটা দূরে। ফাঁসের দড়িটা

কাঁটাগাছের সঙ্গে জট পাকিয়ে আটকা পড়েছিল। কুণ্ডলী পাকিয়ে পরিশ্রান্ত পাইথন বোধহয় কিছুটা দম নিচ্ছিল।

হতভাগ্য যুবকটিকে গুলি করে মেরে ফেলবার পেছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। সহজ সরল মানুষ। এদের চিন্তা আছে, মতলব নেই। তাই ভয়ঙ্কর এই সরীসৃপের হাতেই যুবকটির মৃত্যু ঘটেছে—অতি সহজেই বিশ্বাস করলে সবাই। ফ্রেডারিক আধা খৃষ্টান শিক্ষিত যুবক। কাজের তাগিদে মাথুর সাহেবের লোকাল রিক্রুট। ঘটনাটা অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলে সবাইকে। পোষা জানোয়ারের মত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সকলের চোখে মুখে। সেলাম ঠুকে ঠুকে চলে গেল।

মৃতদেহটা চটপট সরিয়ে ফেলা হ'লো। দস্তিদার সাহেব তাঁবুতে ফিরে চললেন। মিহিরকে বললেন: এদের প্রকৃত মনোভাবটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করো? লোকটা কে? কে কে আছে? খবরটা নাও। পরে জানাবে আমাকে।

মাথুর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দস্তিদার সাহেব তাঁবুতে ফিরে চললেন। সমস্ত ঘটনাটা যেন দুঃস্বপ্নের মত মনে হ'লো মিহিরের। কিছুই ভাবতে পারছিল না। ঘাসের উপর বসে প'ড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল সামনে।

দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ চড়াই উতরাই। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। পেঁজা তুলোর মত সাদাসাদা মেঘগুলোর উপর অস্তগামী সূর্যের রঙীন ছটার বিচ্ছুরণ। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভর করে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘর মুখো বালি হাঁস।

আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঘর মুখো লোকগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তাদের চলার গতিতে শ্রান্তি। মাদলের শব্দেও নেমেছে ক্লান্তি।

মাথুর সাহেবের দুই কর্মচারী ছিল মিহিরের সঙ্গে। তার মধ্যে এক জনের কাছে গুলির আওয়াজটা মোটেই পরিষ্কার হচ্ছিল না। খুব একটা লাগসই জবাব দিয়ে মিহির উঠে দাঁড়াল। কার কাছে কিসের খোঁজ করবে সে? তাঁবুতেই ফিরে চললো।

চেনা মুখ

দূর থেকে মাদলের আওয়াজ ভেসে আসছে। ধীরে সে আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরান্তে। মিঠে ঝিরঝিরে হাওয়া। দলহারা কোন পাখী দ্রুত লয়ে ছুটে চলেছে সাথীদের খোঁজে। উঁচু পাহাড়ের 'জুম' চাষের আগুন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাঁকের মুখে নজরে পড়ল। একটি অল্প বয়সী উলঙ্গ ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ। সঙ্গের একটি মেয়েকে হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছে। মাথুর সাহেবের খৃষ্টান কর্মচারী ফ্রেডরিক অপেক্ষাকৃত কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

কোন কথা বোঝবার উপায় নেই। তবু এটুকু বুঝলে মিহির যে মেয়েটি নিশ্চয়ই এই হতভাগ্য মৃত যুবকের কেউ হবে। মেয়েটার হাঁটু পর্যন্ত এক ফালি মোটা কাপড় কোমরে জড়ানো। তামাটে সুডোল দেহটা প্রায় অনাবৃত। এক ফালি 'রিয়াঁ'তে তার পরিপূর্ণ যৌবন শাসনে আসেনি। কানে বাঁশের দুল। জট পাকানো চুলের মধ্যে কাঁকই। তার মধ্যে জংলি ফুল গোঁজা। বৃদ্ধের কথা যেন মেয়েটির কানেই ঢুকছে না। হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে বৃদ্ধের দিকে তাকাচ্ছে।

সূর্য সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। কালো পাখা মেলে অন্ধকার নেমে আসছে চারদিকে। অপরিচিত দু একজনকে পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে মেয়েটা সংকুচিত হয়ে পাশে দাঁড়ালো। তার পর কি ভেবে হাঁটতে সুরু করলে। বৃদ্ধ ও বালকটি মেয়েটাকে অনুসরণ করে। বৃদ্ধ শুকনো বাঁশের মশালে আগুন লাগিয়ে নিল। ফের চলতে সুরু করে। পায়ে হাঁটা সর্পিল পথ বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল তার পর।

খৃষ্টান কুকি লোকটা মিহিরকে দেখে এগিয়ে এল। সঙ্গের দু জন লোক তাঁবুর দিকে পা চালালো। লোকজনের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। বেশী আর দূরে নেই তাঁবু।

মিহির বলে: এরা কারা?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে লোকটা বললে: বড় মন্দ কপাল মেয়েটার। বিয়ের আগেই মরদটাকে খেয়ে বসে রইল।

চেনা মুখ

তাঁবুর দিকে চলতে সুরু করে ওরা দুজনে। ফ্রেডারিক হাতের লাঠিটা মাটিতে দু পাশে জোরে ঠুকতে ঠুকতে চলছিল। সাপ তাড়াচ্ছিল বোধ হয়।

—এদের চেন তুমি?

—খুব।

নিজের মনেই বলে চলে ফ্রেডারিক :—

কবে কোন দিন এই মানুষগুলো তাদের মূল বাসস্থান ছেড়েছে সে হদিশ কারো জানা নেই। আজ এরা যাযাবর। জঙ্গলের চড়াই উতরাই বেয়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশে ভেসে বেড়াতেই এরা অভ্যস্ত। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এরা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। জীবিকা কৃষি। কিছুটা বৈচিত্র্যও আছে তাতে। বর্ষার আগে জঙ্গল কাটা সুরু হয়। সবুজ জঙ্গল দুদিনে রোদ্রে খটখটে তামাটে বর্ণ ধারণ করে। আগুন লাগিয়ে ছাই করে ফেলা হয় সারা জঙ্গলটা। আসে বর্ষা। সুরু হয় রোপণ। ফসল হয়। কিছুকাল যায় এই ভাবে। তার পর এক দিন আবার নতুন পথে যাত্রা সুরু।

এমন কোনো একটা দলের সঙ্গে থেলমা এসেছিল কয়েক বছর আগে তার বুড়ো বাপের সঙ্গে উঁচু পাহাড়ের ঢালু বেয়ে। জায়গার দখল নিয়ে মুস্কিলে পড়েছিল প্রথমে। সঙ্গে জোয়ান মরদ না থাকায় বৃদ্ধ মোড়ল পছন্দ করেনি এদেরকে। বিপদে আপদে কোনো প্রয়োজনেই লাগবে না তার। বাঁশের হুঁকোতে বার কয়েক মুখ লাগিয়ে সশব্দে রেখে দিল সেটা। টাঙ্গীর মুখটা শক্ত মাটিতে ঘষতে থাকে।

দামাল মেয়ে থেলমা। অতিমাত্রায় ছটফটে। জায়গাটা ঘুরে দেখে নেবার জন্যে চট করে সরে পড়ছিল। ধারে কাছের উঁচু টিলায় যুতসই একটা জায়গা চাই ঘর বানানোর।

জায়গাটা বড় পছন্দই হয়েছিল থেলমার। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট নালা। অল্প জল। পায়ের গোড়ালিও ডোবে না ভাল করে। কিন্তু এই সামান্য জলেই কি দুরন্ত স্রোত। খাড়াই পাহাড়ের ফাটল বেয়ে বহু পথ ঘুরে এই অবিরাম জলস্রোতের বিরাম নেই।

চেনা মুখ

দুরন্ত খরায় নালা শুকিয়ে ওঠে। বয়ে চলে শীর্ণ জলধারা। বর্ষায় চেহারা হয় ভয়ঙ্কর। বড় বিপজ্জনক। সামান্য অসতর্ক মুহূর্তে কোথা থেকে কোথায় ভাসিয়ে নেবে সে হদিশ পাওয়া মুস্কিল।

মাছ ধরছিল ইয়াম্বা। হাতে ছিল কোঁচ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জলের দিকে। সূর্যের আলোতে ঠাণ্ডা টলটলে স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত হয়েছিল তার সুগঠিত দেহের আদলখানা। নিজের সৌন্দর্যে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায় ইয়াম্বা। হাতের কব্জি, শক্ত মাংসল পেশী কাঁধ ঘুরিয়ে দেখে।

নজর পড়তেই দিগ্ বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোঁচ ফেলে দৌড়োতে থাকে। থেলমা তখন প্রায় পৌঁছে গেছে টিলার ওপর। জঙ্গলে অনুসন্ধান করছিল সে ডিমের—বুনো মুরগীর।

ইয়াম্বার দৌড়নোর পেছনে কারণ ছিল। কাল বিকেলে সে 'ফং' পেতেছে এই জঙ্গলে। দুই গাছের ফাঁকে উদ্ধত বাঁশের বিষ মাখান 'ফং'। লম্বা দড়ি ঘাসের মধ্যে লুকোনো আছে এইখানেই। দড়িতে সামান্য নাড়া পেলে ছুটে আসবে সেই উদ্ধত ফং। কোনো শক্তি সে মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবে না। বুনো শুয়োর বা হরিণ মারা পড়ে নিমেষে। আরও বড় জন্তুর-ও নিস্তার নেই এই 'ফং'য়ের কাছে। মানুষ তো কোন ছার।

কিছুটা যেন হতভম্বই হয়েছিল ইয়াম্বা। উঁচু টিলার সর্বনেশে 'ফং'য়ের কথা কার না জানা আছে এ অঞ্চলে। পেছন থেকে থেলমাকে সে আন্দাজ করতে পারে না। মুহূর্তের জন্য থামলে। আবার দৌড়তে থাকে সামনে।

সীমানার ঠিক আগের ঝোপটাতে ইয়াম্বা থেলমাকে ধরে ফেলে। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় থেলমা। কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁটের আগায় এসে কথা থেমে গেল ইয়াম্বার।

বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল থেলমার দিকে। এ চত্তরে সব কিছুই তার নখদর্পণে। শুধু মানুষ নয়, শুওরের চেহারা দেখে তার প্রকৃত মালিক-কে চিনে ফেলে সে মুহূর্তে। অপরিচিত থেলমা অবাক করে তাকে।

চেনা মুখ

এই ইয়াম্বার প্রথম পরিচয় থেলমার সঙ্গে। আচমকা ইয়াম্বার আবির্ভাবে যে পরিমাণ ভয় পেয়েছিল, অবিশ্বাস জন্মেছিল যতটা, ইয়াম্বার মুখের কথা ও গাছের মাথায় উদ্ধত 'ফং' দেখে সে ধারণা দূর হয়।

মাছ ধরা আর হয়নি সেদিন ইয়াম্বার। থেলমা যেন গোলমাল করে দিল সব। থেলমার চেহারায় কি দুরন্ত আকর্ষণ। কি অদ্ভুত অনুভূতি। দুরন্ত ভাল লাগা।

ইয়াম্বা শুধু দুর্ধর্ষ নয়, বেপরোয়া। বুনো জন্তুর উন্মাদনা আছে তার দেহে। হাতে একটা টাঙ্গী থাকলে পৃথিবীর কোন শক্তিকেই সে ভয় পায় না। প্রচুর তাজা রক্ত দেখেছে সে জীবনে। তবে মানুষের নয়—জন্তুর। কোনো লোকের নয়। নেকড়ে আর বুনো শুওরের।

কিন্তু এ আজ তাকে কিসে পেল? শরীরটা তার কেমন যেন করতে লাগল। পথে ভাল করে কথাই বলতে পারেনি থেলমার সঙ্গে।

ইয়াম্বার চেষ্টাতেই থেলমারা রয়ে গেল এখানে। পশুর মত পরিশ্রম করে দু দিনে বানিয়ে ফেলে থেলমার ঘর। সব কিছু হাতে তুলে দেয়। ঘরের সামনের জায়গাটি ধারালো অস্ত্রে মুহূর্তে সাফ করে ফেলে। পুর্ণিমার রাতে দূর থেকে মৌচাক ভেঙ্গে নিয়ে এল। গোটাটাই হাতে তুলে দিল থেলমার। বেপরোয়া বেহিসাবী উচ্ছৃঙ্খল জীবন যেন কিছুটা সংযত হয়। থেলমার সান্নিধ্যে এসে জীবনকে সে যেন নতুন চোখে দেখে। বুনো জানোয়ারের পেছনে ধাওয়া করার উৎসাহ আর আগেকার মত পায় না। বরং থেলমার বুড়ো বাপের সঙ্গে দাওয়ায় বসে বাঁশের চাটাই বুনতে সাহায্য করে। সবুজ কচি চায়ের পাতা চুরি করে আনে থলি ভরে। থেলমার হাতের নুন-চা শুধু অপুর্ব নয়, অতুলনীয় মনে হয় ইয়াম্বার।

এই দামাল বেপরোয়া ইয়াম্বাকে মাঝে মাঝে কেন যেন ভয় হয় থেলমার। হাতে যে কিছুই রাখতে জানে না। কত সে গুছিয়ে দেবে? এই অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যের পেছনে শক্ত কোনো বাঁধন নেই। ইয়াম্বার খামখেয়ালি মনের সঙ্গে কৌতুক চলে, কিন্তু তার সঙ্গে ঘর বাঁধতে ভয় হয় থেলমার। কিন্তু এক বেলা না দেখেও থাকতে পারে না সে। সারা দিন উৎকণ্ঠায় কাটে। ইয়াম্বার বাদামি কুকুরটা যখন তার দাওয়ায় এঁটো

খেতে আসে দুহাতে তাকে জাপটে ধরে মনিবের খোঁজ করে। মূক প্রাণী লেজ নাড়ে আর থেলমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। অকারণ হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে থেলমা।

দৃষ্টি এড়ায়নি অনেকেরই। থেলমার সঙ্গে ইয়াম্বার এতটা মাথামাখি পছন্দ করিনি। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেনি কেউ। সাধ করে বিপদ ডেকে আনে? বিশ্বাস কি ইয়াম্বাকে?

পলাশ ফুলে যেন আগুন লাগিয়েছিল চারিদিকে। গাছের মাথায় অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণাভ আলোতে সে দৃশ্য বড় মনোরম। কালো পাখা মেলে পূব দিকে কিছুক্ষণ পরেই নেমে আসবে অন্ধকার। ঝরণা থেকে জল নিয়ে থেলমা পা চালিয়ে ফিরছিল। পলাশ বন আর পাখীর ডাকে মাঝে মাঝে তাকে আনমনা করে দিচ্ছিল। নেকড়ের ছানা কোথা থেকে ধরে সেই পথেই ফিরছিল ইয়াম্বা।

এক চোট হেসে নিল থেলমা। জলের কলসী নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মাটিতে। বুকের শিথিল রিঁয়া আঁট করে বেঁধে নিল।

থেলমাকে পেয়ে যেন ভালই হল ইয়াম্বার। বাঁ দিকে ঘুরে এসে বসল। আজ ইয়াম্বা তার গোপন প্রস্তুতির কথা জানিয়ে থেলমাকে তাক লাগিয়ে দেবে। দশ ঝুড়ি চাল, চারখানি টাঙ্গীর ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। শুওর আর তাড়ি ছাড়া আর কিসের জোগাড় রাখতে হবে তার? আগামী পুর্ণিমার রাতে ইয়াম্বা থেলমাকে তার ঘরে আনতে চায়। উৎসবের সব কিছু আয়োজন সে পাকা করে ফেলেছে মনে মনে।

গালে হাত দিয়ে চুপচাপ সব শুনলে থেলমা। পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে থাকে মাটিতে। হাসির পাতলা রেশ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে থেলমার। ইয়াম্বার দিকে চেয়ে থাকতে আজ যেন বড় ভাল লাগে।

অনেকক্ষণ গেল তারপর। মনের সব কথা গুছিয়ে বলতে পারে না ইয়াম্বা। এলোমেলো উচ্ছ্বাস যেন আর বাঁধন মানে না।

নেকড়ের ছানার গায়ের বাদামি রেঁায়ার মধ্যে আঙুল চালিয়ে গত রাত্রের এক অদ্ভূত স্বপ্নের কথা বলে থেলমা।

চেনা মুখ

অল্প দিনে থেলমাও কেমন যেন বদলে গেছে। দেহ আরও নিটোল হয়েছে। উগ্রতা আজ নেমে এসেছে নম্রতায়। কালো ডাগর চোখের দুষ্ট মি-ভরা চপলতা আজ দখল করেছে ভাবগর্ভ চাউনিতে।

মজার এক স্বপ্ন দেখেছে থেলমা। শক্তি ও সাহসের স্বাক্ষর বহন করে এনেছে তার কাছে ইয়াম্বা। ফালাতে গাঁথা বুনো শুওর নয়, মামুলি কোনো হরিণ মারেনি সে। এমন কি টাঙ্গীর সাহায্যে কোনো বাঘকে মেরে এনে পৌরুষের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নি।

স্বপ্নের স্থন্দর বিছানায় থেলমা ছিল ঘুমিয়ে। বুনো ফুলের গন্ধে আকাশ বাতাস ছিল ভরপুর। কিসের শব্দে যেন জেগে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে ইয়াম্বা। অতি পরিচিত মিষ্টি হাসি হেসে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। ইয়াম্বার পরনে স্থন্দর বিচিত্র পোষাক। মাথায় মনে হ'লো একটা পাগড়ি।

ইয়াম্বার সঙ্গে সে ঘর থেকে নেবে এল দাওয়ায়। বিরাট বাঁশের চুবড়ি। চুবড়ির ঢাকনা খুলে ইয়াম্বা তাকে হতবাক করে দিল। প্রকাণ্ড এক অজগর। দেহের সঙ্গে শক্ত দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে বাঁধা। নিদারুণ রোষে সে ফুলে ফুলে উঠছে। অপেক্ষাকৃত কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াম্বা।

এই সময়ে ঘুম ছুটে গেল থেলমার। বাসি ফুল শুকিয়ে গেছে শিয়রে। ফ্যান আর কচুর ডালের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে পোষা শুওর। দাওয়ায় কোন কিছু নেই। ইয়াম্বা নেই। অজগরের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। দড়ি পাকাচ্ছে বুড়ো বাপ। প্রভাতের ঝিরঝিরে হাওয়া। গাছের ডালে, শাখায় শাখায় হরেক রকম পাখীর ঐকতান। বহু দূর থেকে ভেসে আসছিল জংলি মুরগীর ডাক।

ইয়াম্বার মুখের ওপর চোখ তুলে থেলমা বলেঃ ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়?

জবাব ঠোঁটে আসেনি ইয়াম্বার। নেকড়ের বাচ্ছাটাকে ছেড়ে দিল। মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল সেটা জঙ্গলে।

থেলমার মাথায় জলের কলসীটা তুলে দিয়ে ইয়াম্বা কয়েক মুহূর্ত ভাসা ভাসা চোখে তাকিয়ে থাকে থেলমার দিকে। পুবমুখো পথ ধরল ওরা দুজনে। ঘরে ফেরবার আগেই পুরো অন্ধকার নেমে এল আকাশে।

সারা রাত্রি এপাশ ওপাশ করল ইয়াম্বা। লেশমাত্র ঘুম এল না চোখে। থেলমার কথা তাকে পাগল করে তোলে। একই প্রশ্ন ভেবেছে সে বার বার। ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

হতেই হবে। থেলমার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলবার দুরন্ত শপথ নেয় ইয়াম্বা। নিজের জীবনই সে আজ উৎসর্গ করতে পারে থেলমার জন্য। থেলমাকে খুশী করতে যে কোনো ভয়ঙ্কর সত্যিকে আলিঙ্গন করতে দ্বিধা করবে না সে।

পরদিন সারা সকালটা ইয়াম্বা বাড়ীতে কাটালে। গাছের ছালের মজবুত দড়ি বানালে একটা। কোমরে ছুরি গুঁজে দুপুরে বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলে। পরিশ্রান্ত ইয়াম্বা দিনের শেষে বাড়ী ফেরে। সারাদিন সে শুধু ঘুরেছেই। মেলেনি কিছুই। সামান্য একটা খরগোশও চোখে পড়েনি।

তারপর সে এক নতুন অধ্যায়। সারাদিন জংলা পথের চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে ইয়াম্বা। কখনও কোনো দিন কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখা যায় থেলমার সঙ্গে। মনের কথাটি কিন্তু অতি সন্তর্পনে গোপনই করে যায় ইয়াম্বা। প্রভাতে পুর্বদিকের টকটকে সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে তাজা উদ্যমে আবার কর্ম স্বরু।

বন্য মানুষ ইয়াম্বা। বুনো জানোয়ারের গতিবিধি তার অজানা নয়। কিন্তু অজগর কিছুটা ভিন্ন জাতের জীব। অতি সহজেই দেখা মেলে অতি সাধারণ পরিবেশে। আবার বহুদিনের শত চেষ্টাতেও তার নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য।

কিন্তু দমে যাবার মানুষ সে নয়। থেলমার স্বপ্ন সফল করতে হবে। বনদেবতা তাকে নিরাশ করবে না।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতে কিছুটা দেরীই হয়ে যায়। রোদে মাখামাখি হয়ে গেছে সব। পথে নেবে আসতে কিছুটা দেরীই হল ইয়াম্বার। টিলার ওপর টিলা পেরিয়ে পুবমুখো স্যাঁতসেঁতে জঙ্গলে এসে পড়ে। দিনের আলো

রাত্রের অন্ধকারকে সম্পূর্ণ নিংড়ে নিতে পারেনি এখানে। হিমশীতল ঝরণার জল আকণ্ঠ পান করে নিল। তার পর উধাও হয়ে গেল।

ইয়াম্বা আর ফেরেনি।

তার পরের মর্মান্তিক ইতিহাস কারও অজানা নয়।

ফ্রেডারিক থামলে। মিহিরের সঙ্গে গল্পে গল্পে তাঁবুর অতি নিকটেই এসে পৌঁছেছিল। বিদায় নিয়ে ফ্রেডারিক চলল উত্তরমুখো। তাঁবুর বাইরে শুকনো গাছের পাতায় আগুন জ্বলছে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আগুন খুঁচিয়ে দিচ্ছে শীর্ণ একটা ছায়ামূর্তি।

ডান দিকের বেতের চেয়ারে মাথুর সাহেবের মুখোমুখি বসে দস্তিদার সাহেব। কফি পান করছেন।

চুপচাপ। বড় বেশী গুমোট। গাছের পাতা নীরব নিশ্চল। পেছনের ঘন জঙ্গল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। ধরণীকে আজ বোবায় পেয়েছে যেন।

মিহিরের কাহিনী শেষ হল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে আমার ঘরে। সব অন্ধকার।

ঘটনাটার মধ্যে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। থেলমা আর ইয়াম্বা-র কাহিনীর পাখায় ভর করে বন্য পৃথিবীর জংলা পথে মন আমার উধাও হয়ে গিয়েছিল। মাটির মানুষের এই অতি সত্য জীবনের ওপর যান্ত্রিক কালো যবনিকার গ্রন্থি উন্মোচন হবে না কখনও। ইয়াম্বার প্রেম ও দস্তিদার সাহেবের প্রয়োজন পৃথিবীর মানুষের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল। এই রকমই হয়। এই রকমই নিয়ম।

বাঁশের আগুনের মশাল জ্বেলে অন্ধকার জংলা পথে বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে রিক্তা থেলমা কোথায় গেল? সেখানে তার কি ইতিহাস?

সময় নেই। সে কাহিনী শোনবার অবসর নেই কারও। মাটিতে চাপ বাঁধা ইয়াম্বার বাসি রক্তের স্বাক্ষর ধারালো জিভে নিঃশেষ করে নিয়ে গেছে কোনো জানোয়ার। থেলমার নিঃশেষিত তৃষিত হৃদয় অন্ধকার অরণ্যে হা হা করে কেঁদে ফিরবে। তবে ভয় নেই। সে কান্না বহু দূরে।

হাজার হাজার ফিট ওপরের দূর পাল্লার কমেট বিমানের কাছে সে কান্না নাগাল পাবে না কোন দিন।

কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম আমি। সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে ছাইদানে। তাকিয়ে দেখি সামনে মিহির নেই।

পাশের ঘর থেকে দীপুর কণ্ঠ ভেসে আসছে কানে :—

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

উপন্যাসের সমাপ্তির শেষে উপসংহার। নাটকের শেষে এপিলোগ—কিন্তু আমার এ কাহিনীর শেষে কি? যবনিকা আমাকেই তুলতে হয়। সে পটভূমিতে শুধু আমার একার আবির্ভাব। সেখানে দস্তিদার সাহেবের অস্থির রাইফেল নাগাল পাবে না কোনো দিন।

দেখা করেছি। অতি স্বাভাবিক সহজভাবেই মিহিরের প্রসঙ্গ তুলেছি। বলেছি: মিহিরের কাছে কিছু ছবি দেখলাম। অদ্ভুত ছবি। পাইথন আর কুকিতে যুদ্ধ চলেছে, আপনি তুলে ধরেছেন রাইফেল···কম্পোজিট শটটা এসেছে অপূর্ব। নিগেটিভটাও আমার কাছে আছে—পাঠিয়ে দেব।

কয়েক মুহূর্ত নীরব ছিলেন দস্তিদার সাহেব। ছোট্ট জবাব এসেছিল অনেক পরে: না কি?

কাজ হয়েছিল এতেই। দুনিয়ায় আজ ছোট বড় সব কাজই এইভাবেই হয়। দালালেরই তো দিন আজ। ছোট ছোট দলে টুকরো টুকরো হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র আজ ছড়িয়ে পড়েছি আমরা।

চেনা মুখ

ইন্সিওরেন্স পলিসি থেকে মিসেস দস্তিদারের নাম নির্বাসিত হল না। শেষ মুহূর্তে তার নামই বহাল রইল। সংবাদটি মিসেস দস্তিদারকে পৌঁছে দিয়ে অনিবার্য 'করোনারি থ্রম্বসিস' থেকে হয়তো তাঁকে বাঁচানো গেল। কিন্তু দস্তিদার সাহেব 'কৃষ্ণকলি'র নামে লোভনীয় অঙ্কের এক পলিসি করলেন নতুন করে, সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ চেপে গেছি।

শ্রীএ. আর. দস্তিদার আমার সব নয়। মিসেস সরকারে-ও আমি ক্ষান্ত নই। তিনি কতটা কৃষ্ণকলি আমার জানার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই; তবে আমি যে আজ অনেক বেশী কলির কেষ্ট সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পুরাণের কেষ্ট ছিলেন দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র। একটি কংসের ধাক্কা সামলাতে বসুদেব কেষ্টকে নিয়ে নাকাল হয়েছেন বিস্তর। চাতুরীও তিনি কম করেননি। হিন্দী সিনেমার হাস্যকর সিকোয়েন্সের মত যশোদার মেয়ের সঙ্গে ছেলে চালাচালি আমার কিছু জোলোই লাগে।

আমার জন্ম পদ্মাপার। ইচেডাঙার সবচেয়ে বেশী ইংরেজী জানা ভাগ্য বিড়ম্বিত, অপদার্থ শ্রীবীরেন সেনের আমি জ্যেষ্ঠ, একেবারেই অদ্বিতীয় পুত্র। নন্দালয়ে চোরের মত আমার আশ্রয় নয়, ভাঙ্গাচোরা মাটির ঘরের টিনের তলায় আমার বেড়ে ওঠা।

পুরাকালে কংস ছিল একটা। কিন্তু কলির কেষ্টর জ্বালা অনেক। কংস একালে অগুনতি। আজ স্পেন্সর্স্‌, কাল বোম্বের তাজে, পরশু অশোক হোটেলের কক্ষে দেশ বিদেশের রোমহর্ষক কংস আমি বধ ক'রে থাকি গোপনে। তবে লম্ফ দিয়ে রঙ্গভূমে নিপাত করিনে। প্রোপজাল ফর্মে সই করিয়ে ব্যাঙ্কে চেকটা ক্যাশ করিয়ে। হত্যা করিনে দুরন্ত কেশাকর্ষণে। চরিত্রের চোরাগলির দুরন্ত আকর্ষণে অনেক কংস পিছলে হাতে আসে শত সহস্র দ্রাক্ষার রুধির বর্ষণে। যারা ফিরে যেতে চায় মানসিক নানা দ্বন্দ্বে, ধরাশায়ী শেষে হয়, আমার ফাঁকা কথার ইন্টেলেকচুয়াল গন্ধে।

কৃষ্ণ পুতনা থেকে অরিষ্ট পর্যন্ত নিধন করেছেন বৃন্দাবনে। হরিবংশ ও পুরাণে এই রকম পাওয়া যায়। কিন্তু হোটেলে, পার্টিতে, ডিনারে, ক্লাবেতে কত পুতনাকে যে আমার ব্যাগের অরিষ্টের বিধানে বশ করেছি সে ইতিহাস লেখা আছে আমার নিত্যপুরাণে।

তবু কলির কেষ্ট আর যাই পারুক রাজ্যচ্যুত উগ্রসেনের রাজত্ব ফেরাতে পারে না। সে দোষ অবশ্য কেষ্টর নয়—কলিকালের। দোষটা নিতান্তই কলকাতার।

রাজ্যচ্যুত উগ্রসেনের কথা থাক; কিন্তু চাকরীচ্যুত মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হলো। তবে মথুরাতে নয়—বেহালাতে।

মর্ডার সাহেব ভরসা দিলেন। ওর নাম ঠিকানাও লিখে নিলেন। চতুর লোক সন্দেহ নেই। বেফাঁস কোনো মন্তব্য করবার মানুষ নন। তবে তার মত লোক যখন আমার সামনেই আধ ডজন ফোন চালাচালি করলেন তখন বুঝলাম মিহিরের সুরাহা একটা হবেই।

দুদিন পর জয়ন্তীর তার পেলাম পাহাড় থেকে। জরুরী তলব। পরদিনই আমাকে কলকাতা ছাড়তে হ'লো। সঠিক কিছু আন্দাজ না ক'রলেও জয়ন্তী যে এরকম সামান্য কারণে জরুরী তারে আমাকে ডেকে পাঠাবে ভাবতে পারিনি।

তবে জয়ন্তীর সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারলাম না। শুধু মতভেদ নয়, আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রতিবাদধর্মী।

তর্ক হ'লো। জয়ন্তী যুক্তিও দেখালে বহু। তারপর এক টুকরো হেসে বলে: আপনাকে তার পাঠিয়ে ডেকে এনেছি, সে দোষ আমার। তবে ডানকান সাহেবের ওপর আপনি এত খড়্গহস্ত কেন! ডাক্তার বসুও আপনার কানে মন্ত্র দিয়েছেন নিশ্চয়ই।

মাথা নেড়ে বলি: জয়ন্তী, আমি জানি তুমি আমার অন্তরের ক্ষেত্রফল জরিপ করতে ব'সেছো। ডানকান সাহেবকে এ হাসপাতালে আনার ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে আমি কথা তুলতে চাই না। শুধু আমার বক্তব্য একজন ইংরেজ ডাক্তারের পেছনে প্রচুর অর্থ খরচ না ক'রে আমাদের বাঙ্গলা দেশের কয়েকটি ডাক্তারকে তুমি নিযুক্ত ক'রতে পার ঐ একই খরচে। ডাক্তার বসুর সঙ্গে কথা আমার অনেক হ'য়েছে, কিন্তু ডানকান ঘটিত রহস্য উদ্ঘাটিত তুমিই করেছো আজ সকালে। কিন্তু এই কথা শোনানোর জন্যে আমাকে তুমি দৌড় করালে এতটা। আমার হাতে কাজ থাকে। জরুরী তারের একটা ইজ্জত আছে জয়ন্তী।

কৃত্রিম অভিমান ক'রে জয়ন্তী ঘাড় নেড়ে বলে : আপনাকে আমি অকাজে ডাকিনি। জরুরী তারকে হাস্যাস্পদ ক'রতেও আমার ইচ্ছে নেই। আপনাকে জানান না দিয়ে নতুন কিছুতে হাত দিতে আমার ভয় করে। 'ডিরেক্টর অব হেল্‌থ' আমাদের হাসপাতালকে সাহায্য করবার জন্যে খুব কড়া নোট দিয়েছেন শুনলাম। ফিনান্সে ফাইলটা আটকে আছে। দস্তিদার সাহেবের সঙ্গে আপনার তো খুব দোস্তি, কিছুটা হাত চালাতে বলুন না। কি যে কাজ করেন ছাই, টাকা তো বহু রোজগার করলেন। এত টাকা দিয়ে হবে কি। ভাল কথা, দস্তিদার সাহেব নাকি একটা পাইথন ধরেছেন ত্রিপুরার জঙ্গলে। কাগজে দেখছিলাম।

কি যেন ব'লতে যাচ্ছিলাম, করিডোরের সোরগোলে সেটা হারিয়ে গেল। দারোয়ানের হাঁক, অন্য আরও দু'একটা গলা। আর সমস্ত কিছু ছাপিয়ে ডাঃ বসুর অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

করিডোরে নয় ডাক্তার বসুর গলার আওয়াজ আসে পাশের কামরা থেকেই।

একটি অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো : একে আপনারা ফিরিয়ে দিয়েছেন কেন? এ-র সারবে। এ মেয়েটি ভাল হ'য়ে যাবে। একে ফিরিয়ে দিয়েছেন কেন আপনারা?

ডাঃ বসুকে ব'লতে শোনা গেল : এত প্রশ্নের জবাব আমি দিতে বাধ্য নই। আপনি দেখছি জানেন সব। তা'হলে আপনিই বসুন এখানে।

সোরগোল শুনে জয়ন্তী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ব'ললে : এত চেঁচামিচি কেন। আপনি একটু বসুন, কে আবার জালাতে এলো অসময়ে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমিও। তবে সোরগোলের দিকে নয়, পুবদিকে সামনের বাগানের দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম।

বাগানের কোল ঘেষে সামনেই পাহাড়। কঠিন পাথরের ফাটল বেয়ে অবিশ্রান্ত ঝরণার জল সূর্যের আলোতে ঝলমলিয়ে উপ্‌চে পড়ছে। উঁচু নীচু পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ জঙ্গল স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। বহু মানুষের পায়ে পায়ে গড়া সর্পিল খাড়াই পথ মালার মত পাহাড়ের গলার সঙ্গে ঝুলছে।

চেনা মুখ

অসংখ্য গোলাপ ফুটেছে বাগানে। লোহার জাফরী দেওয়া সীমানাটি সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে সবুজ লতায়। বারান্দায় পেতলের চকচকে টবে বিচিত্র ফুলগাছের সারি। রংকরা বিচিত্রিত বাঁশের খোলোসের মধ্যেও সমান দূরত্ব রেখে মাথার ওপর নানা অর্কিড সিলিঙের সঙ্গে ঝুলছে।

সামনের ঝরণাটির নাম 'রুঞ্চিমায়া'। কথাটা হয়তো নেপালী। বাঙ্গলায় তরজমা করলে দাঁড়ায় 'কান্নায়-প্রেম' আরও সহজ ক'রে বলা যেতে পারে 'কাঁদতে যার ভাল লাগে'।

ঝরণার এই নামটি আমাকে কৌতুহলী ক'রেছে কয়েকবার। কার কান্না? কোথা থেকে, কেন এসেছে কথাটা? সন্তান বিয়োগে বেদনাহত কোনো মাতৃহৃদয়ের উদ্বেলিত অশ্রুধারা এই বনভূমির কঠিন পাষাণে ঝরে পড়েছিল, না পশম বেচতে এসে ভিনদেশী এক মানুষ মকাই ক্ষেতের এক মাইলির কোমল হৃদয় ভেঙে দিয়ে খচ্চরের পিঠে বসে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি পথে উধাও হ'য়ে গিয়েছিল? সম্ভব-অসম্ভব গল্প বা কাহিনী চিন্তা করতে আমার বেশ লাগে।

সেন সাহেব! সেন সাহেব! আপনি শীঘ্রই আসুন!

ডাঃ বসুর উৎকণ্ঠাপুর্ণ ডাকে আমার চমক ভাঙ্গে। দিশেহারা হ'য়ে একটানা কি বলে গেলেন আমার মাথায় নিল না সব। শুধু শুনলাম জয়ন্তী কেমন ক'রছে! কেমন যেন বেহুঁস হ'য়ে প'ড়েছে জয়ন্তী ডাঃ বসুর ঘরে।

এক রকম দৌড়েই এলাম আমি। হালকা সাদা সিল্কের শাড়ী কাঁধ থেকে খসে নেমেছে! সুন্দর মুখশ্রী ঘিরে দুরন্ত এক বিষন্নতার ভিড়। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘামে কপাল ভরে উঠেছে। মেঝের ওপরই ভেঙ্গে ব'সে পড়েছে জয়ন্তী।

আমি কি করতে ব'লব! আমার দিকেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন ডাঃ বসু। শুধু বললেনঃ ওনার লো প্রেসার আছে নাকি?

কথার জবাব না দিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা জলের গ্লাসটি হাতে তুলে নিলাম। আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি খরচ ক'রে কয়েক আঁজল জলের ঝাপটা দিলাম জয়ন্তীর চোখে মুখে।

কেঁপে উঠলো জয়ন্তী। নাড়া খেয়ে উঠলো সারা দেহ। মুখে বললাম: জয়ন্তী, জয়ন্তী তোমার কি হ'য়েছে? অমন করছো কেন, শরীর খারাপ লাগছে?

অস্ফুট এক আর্ত্তনাদ ক'রে কি ব'ললে আমার কানে পৌছোল না। থরথর করে ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে অব্যক্ত বেদনায়। শাড়ীর আঁচল সরিয়ে আমার হাতে এক ফালি কাগজ শুধু তুলে দিলো জয়ন্তী।

সামান্য এক ফালি কাগজ। কাঁপা হস্তাক্ষরের এক প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন।

ডাঃ বসুর মুখে শুনলাম, আউট ডোরের রোগী দেখা শেষ হ'লে, হাতের কিছু কাজ সারছিলেন ঘরে বসেই। অল্পক্ষণ আগে উদ্‌ভ্রান্তের মত একটা লোক তার ঘরে ঢোকে। সঙ্গে এক নেপালী মেয়ে। সামান্য একটা সিটেরও সঙ্কুলান নেই, তাছাড়া বছর দুই আগে এলে মেয়েটির হয়তো কিছু সুরাহা করা যেত। নিরুপায় হ'য়ে মেয়েটিকে তাই ফিরিয়েই দিয়েছিলেন তিনি।

হঠাৎ একেবারে জানান না দিয়ে, কোথা থেকে এই দীর্ঘকায় আধ ময়লা পোশাকে পাগলাটে মানুষটি মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে এসে ঢোকে। অপরিষ্কার মুখটি দাড়ি গোঁফে ভরাট। এক প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ডাঃ বসুকে এসে প্রশ্ন করেন: একে আপনারা ফিরিয়ে দিয়েছেন কেন? এর সারবে! ফিরিয়ে দিয়েছেন কেন একে আপনারা?

ডাঃ বসু অসহিষ্ণু হ'য়েছেন। রূঢ় ভাষাই ব্যবহার করেছেন হয়তো। আধ পাগলা মানুষটি টেবিল থেকে কাগজ কলম টেনে নিয়ে খসখস ক'রে খানিকটা যখন লিখে চলেছে, জয়ন্তী ঠিক সেই সময়ই ঘরে ঢোকে। কাগজটা ডাঃ বসুর হাতে দিয়ে জয়ন্তীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই এক রকম দৌড়ে পালিয়ে গেছে লোকটা। পর মুহূর্তেই জয়ন্তী এক বিস্ময়োক্তি করে ভেঙ্গে পড়েছে। তারপর ডাঃ বসু আমাকে ডাকতে গেছেন।

হাঁটু গেড়ে ব'সে জয়ন্তীর মুখের ওপর চোখ তুলে কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, আমাকে থামিয়ে জয়ন্তী অস্ফুট স্বরে বলে: লেখাটা চিনতে পারেন সেন সাহেব?

জয়ন্তীর কথা কেমন বিভ্রান্তিকর। কাগজটা আমার হাতেই ছিল। চোখের ওপর মেলে ধরে নিরীক্ষণ করি। পর মুহূর্তেই একটা বিস্ময়োক্তির সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে খসে পড়ে কাগজটি।

জয়ন্তীকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলি : আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। এ যে অশোকের লেখা! কোন দিকে গেল সে?

জয়ন্তীর রিক্ত কণ্ঠ : সে চলে গেল!

বীভৎস নেপালী মেয়েটি তখনও করিডোরের এক পাশে মুখ গুঁজে বসেছিলেন। তাকে প্রশ্ন করে কোনো কিছুর হদিশ পাওয়া গেল না।

ডাঃ বসু বলেন : আপনি দেখুন এদিকে। আমি ঠিক চিনতে পারবো। আমি তাকে খুঁজে পাব ঠিকই।

আমি বিমূঢ়! আমি হতবাক! জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে ডাঃ বসুকে দেখলাম করিডোরের বাঁকের মুখে হারিয়ে গেলেন।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, জয়ন্তীর কথায় সম্বিত ফিরে আসে। জয়ন্তী বলে : আপনি আমাকে একটু নিয়ে যাবেন, সেন সাহেব।

মাথা নেড়ে বলি : তোমার শরীর ভাল নেই! তুমি না হয় অপেক্ষা কর। আমি একটু ঘুরে আসি। ছোট জায়গা, সন্ধান তার পাওয়াই যাবে।

কাঁপা গলায় অসহায়ের মত উঠে দাঁড়ালো জয়ন্তী। বলে : আর অপেক্ষা করবেন না, আর দেরী করবেন না সেনসাহেব। তাকে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। আমরা তাকে খুঁজে নিয়ে আসি চলুন! শরীর আমার ভালই লাগছে এখন।

জয়ন্তী আমার সঙ্গে এলো। গাড়িতে এসে বসি। ডাঃ বসু গেছেন ডানদিকে। বামদিকের পিচের রাস্তায় আমরা নিচের দিকেই এগিয়ে চললাম। কয়েকটা বাঁক নিয়ে অনেকটা নেমে এলাম। তারপর আর নিচের দিকে অনুসরণ করা বৃথা। ওপরে উঠে এলাম আবার। তেমন কোনো মানুষের সন্ধানই পাওয়া গেল না।

পাথরের মত স্থির হয়ে আছে জয়ন্তী। হিমেল ঠাণ্ডা বাতাসে তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়েছে। পাতলা সাদা শাড়ী কানের ওপরে কাঁধের ওপর অস্থিরতা করে চলেছে একটানা। আশ্চর্য, অতি কঠিন মানুষ আমি, আমিও কেমন বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি।

ওপরের দিকে উঠতে উঠতে হাসপাতালের গেট ছাড়িয়ে এলাম। ছু' একটা পাক খেয়ে আরও ওপরে উঠে গেলাম। সে মানুষের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। পথে ডাঃ বসুরও চিহ্নমাত্র নেই।

জয়ন্তীকে গাড়িতে বসিয়ে আমি নেমে আসি গাড়ী থেকে। বললাম: তুমি একটু বসো, আমি এদিকটা দেখে আসি। খুঁজে তাকে পাওয়া যাবেই। অল্পক্ষণ অপেক্ষা কর তুমি।

জয়ন্তী নীরব। শুষ্ক ভাবলেশহীন চাউনী।

মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে আমি সামনের মালভূমির দিকে এগিয়ে এলাম।

সমগ্র জায়গাটি ঘুরে এলাম। সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গাটি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এলাম। কিন্তু তেমন কোনো মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল না। কপালের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে লটকানো ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে কয়েকটি মেয়ে খাড়াই পাহাড়ী পথে নেমে গেল। আর বার বার আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে গেল।

শূন্য হাতেই ফিরে এলাম। নিদারুণ এক উৎকণ্ঠা নিয়ে মালভূমিটা পেরিয়ে এলাম।

ফিরে এসে দেখি গাড়ি শূন্য। জয়ন্তী নেই। আমার সমস্ত উৎকণ্ঠা আর শঙ্কা নিদারুণ উদ্‌বেগ ও আশঙ্কায় গিয়ে পৌঁছলো। রাস্তা পেরিয়ে অপর দিকের পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো পথে এগিয়ে এলাম। উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে চারপাশে নিরীক্ষণ করলাম অনেকক্ষণ। নেমে এলাম তারপর।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বহু নীচের কোনো পাহাড়ের ফাটলে যে কুয়াশা হারিয়ে গিয়েছিল, ঘুরতে ঘুরতে কয়েক হাজার ফিট ওপরে এসে দুই পাহাড়ের মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করছে চুপিসারে। ওপরে রশ্মিমায়া। তার বর্ষণ চলেছে অবিশ্রান্ত।

মানুষের পায়ে পায়ে গড়া পাহাড়ী পথ এবার নিচে কিছুটা খাড়াই ভাবে এগিয়ে গেছে। থামতে হলো। নিদারুণ এক ভীতি, উৎকণ্ঠা আর উদ্‌বেগে তছনছ্ হ'তে হ'তে ফিরে আসছিলাম।

চেনা মুখ

হঠাৎ নজরে পড়লো। অতি নিকটেই। সামনের দুরন্ত খাদের মুখে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে আধ ময়লা পোশাক। প্রচুর গোঁফ দাড়ির মধ্যে থেকে আমার পরিচিত মানুষের মুখের আদল সহসা ধরা পড়বার নয়। তবে কাঁধ ঘোরানো, টানাটানা দুই চোখের নিচে খাড়াই নাকটি ভুল হবার নয়।

জয়ন্তী দাঁড়িয়ে আছে পাশে। জয়ন্তীর কাঁধের ওপর হাত রেখে অশোক যেন জয়ন্তীর সারা চোখেমুখে কিসের অনুসন্ধান ক'রছে পাতি পাতি করে।

ধীরে এক রকম পা টিপে টিপে এগিয়ে এলাম। সরল এক দীর্ঘ সেগুন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বিমুগ্ধচিত্তে, অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। জয়ন্তীর সুন্দর মুখশ্রী অশ্রুতে মাখামাখি হ'য়ে গেছে। দুঃসহ আবেগে ঠোঁট দুটি থর্থর্ ক'রে কাঁপছে। অশোকের জলজ্বলে ছল্ছলে চোখ দুটি যেন বাঁধন মানে না মোটেই।

ধরা পড়ে গেলাম নিজের কাছেই। আমাকেও যেন বিব্রত করে অনেকটা। সবুজ গাছের মাথার ওপরে সেঁতসেঁতে ভিজে এক বিষণ্ণতা টেনে এনেছে। তার আরও ওপরে রঞ্জিমায়া। অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা যেন কঠিন পাষাণের বুক বেয়ে অজানা কোনো সুদূরের টানে বয়ে চলেছে কুলকুল প্রবাহে।

দুরন্ত খাদের মুখে জয়ন্তী দাঁড়িয়ে আছে। তার রিক্ত চাউনী আর ক্লান্ত অশ্রুসিক্ত মুখটির মধ্যে থেকে বিস্মৃত পুরনো দিনের এক দৃশ্য আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

সে আজ অনেক দিনের কথা। খাদের মুখেই জয়ন্তী দাঁড়িয়েছিল সেদিনও। অনিবার্য এক প্রস্তুতি তার চোখেমুখে ভেঙ্গে পড়েছিল। মুক্তোর মত অশ্রুকণায় চোখদুটি তার টলটলে ছিল। জনমানবহীন সেই পাহাড়ের কোলে জীবনের সামান্য রকম চিহ্ন ছিল না সেদিন। চারদিক নীরব। রঞ্জিমায়ার মত খরস্রোতা এক পাহাড়ী ঝরনার বিরামবিহীন কল কল শব্দই ছিল শুধু একটানা।

বিচ্ছিন্ন সেই টুকরো দৃশ্যের পরিবর্তন হয়েছে আকস্মিক ভাবে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ঘটনা ছুটে গেছে। কত ঘটনাকেই যে অনিবার্য করেছে তারপর। ঘটনা ঘটেছে অনেক। অঘটন ঘটেছে আরও বেশী। কিন্তু আজকের এই

মুহূর্তে অনিবার্য এক পরিশিষ্টর মধ্যে সমস্ত কিছুর ওপর যবনিকা টেনে দিল। ছেঁড়া ছেঁড়া দৃশ্য, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, মর্মান্তিক দু'একটি অঘটন যেন পর পর গ্রথিত হ'য়ে ছবির মত আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

একদিন বাধা ছিল অনেক। মনে আমার সংশয়ও ছিল বহু। কিন্তু আজ এই গ্রথিত কাহিনী প্রচারে আর বাধা কোথায়? এই অবারিত অশ্রুধারার অজ্ঞাত সেই উৎসর সন্ধান দেওয়া আর দোষের নয়। পুরো কাহিনীই আজ বলা দরকার। সত্য কাহিনী আজ আমি প্রকাশ করে দেবই।

উদাসী-দাঁড়ায় সন্ধ্যা নামছে!

সারাদিনের একঘেঁয়ে কাজ সেরে অশোক ঘরে ফিরছিল। রাত্রে আজ আর তার ডিউটি নেই। কাল থেকে সপ্তাহ ধরে রাত জাগার পালা। পাকা সড়ক এড়িয়ে রেল লাইনের তলা দিয়ে পশ্চিমদিকের এই জঙ্গলপথ ধরলে হাসপাতাল থেকে তার বাড়ির দূরত্ব অনেকটা কমে যায়। সামান্য কিছুটা চড়াই আছে ঠিকই, কিন্তু এই পথেই অশোক আসা যাওয়া করে বেশী।

কিছুটা অন্যমনস্ক হ'য়ে পথ চলছিল। বিদেশের এই হাসপাতালের ডাক্তারী প্রথম প্রথম ভালই লাগতো। কিন্তু জায়গাটি এত ছোট, কথা বলার মত লোকের এত অভাব, হাঁপিয়েই পড়েছে ইদানীং।

প্রায় মাঝামাঝি পথ পেরিয়ে এসেছিল। এমন সময় নজরে আসে। কিছুটা তফাৎ, দুটি সরল দীর্ঘ ধুপী গাছের আড়ালে রঙীন শাড়ীর আঁচলের আভাষ পেয়ে থমকে দাঁড়ায় অশোক।

একে শীতকাল। তাছাড়া উদাসীর প্রতিটি মানুষ এক রকম চেনা হ'য়ে গেছে তার। শীতের আগেই বাঙ্গালীর কয়েকটি বাড়ি শূন্য হ'য়ে গেছে। দারোয়ানের হাতে চাবি তুলে দিয়ে তারা নিচে নেমে গেছে বহুদিন। এমন দিনে এত অবেলায় জঙ্গলা পাহাড়ী পথে, এমন অজায়গায় রঙীন শাড়ীর আঁচল চোখে পড়বার কথা নয়।

দূর থেকেই কয়েক মুহূর্ত দেখে অশোক। তারপর সামনের বিরাট পাথরের স্তূপটা পেরিয়ে এলো। কৌতূহল প্রথমে সংশয়, তারপর বিস্ময়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভুল সন্দেহ নয় মোটেই। সংশয় বা বিস্ময় কিছুমাত্র অমূলক নয়। ভয়ঙ্কর ঐ খাদের দিকে মেয়েটি এগিয়ে যাচ্ছে কেন? অপর প্রান্তের ঝরণার মধ্যে সে কি দেখছে অমন করে? নিতান্ত মর্মান্তিক প্রয়োজনেই মানুষ ওরকম বিপদজনক পথে এগুতে পারে।

চীৎকার করা বোকামো হবে। অন্য প্রান্তে যান্ত্রিক আওয়াজ আসছে ডি এইচ আর-এর। পা চালিয়ে এগিয়ে আসে অশোক। বুনো ফুলের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে।

রঙীন শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিলো মেয়েটি। ভারী একটা কোট পাথরের ওপরে রাখা। শাড়ীর নিম্নাংশ সেফটিপিন্ এঁটে আটো করা। অনেকটা ট্রাউজারর্সের দুই পায়ের মত দেখাচ্ছে।

প্রায় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে অশোক দৌড়ে এলো। খাড়াই খাদের দিকে মেয়েটি পৌঁছে গেছে অনেকটা। তন্ময় হ'য়ে আছে নিজের সর্বনেশে প্রস্তুতিতে।

সজোরে একটানে অনেকটা যেন হিঁচড়ে পেছনে নিয়ে এলো মেয়েটিকে। আচমকা এক ঝাঁকুনি খেয়ে মেয়েটি একরকম মাটিতে আছড়ে পড়ে। অপর প্রান্তের মালভূমিকে আবর্তন ক'রে বালি ছেটানো লাইনের সঙ্গে ঘষা খেয়ে খেয়ে, সারা চরাচরের নীরবতা খান খান ক'রে ভেঙে দিয়ে আরও ওপরে উঠে গেল ডি এইচ আর।

সামান্য কয়েক মুহূর্ত। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান। মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অশোক কেমন অবাক হ'য়ে যায়। মুখখানি ফোলা ফোলা। কানের পাশে, থুতনীতে, গলায়, আর দুটি গালে অতি পরিচিত সর্বনেশে দাগ।

কোনো কিছু বলবার আগেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি। দুঃসহ এক আবেগে বুকটা দ্রুত ওঠানামা ক'রছে। অবিন্যস্ত এলোচুলের মধ্যে অশ্রুসিক্ত ফোলা ফোলা ঠোঁট দুটি ক্রোধে, লজ্জায়, আত্মগ্লানি আর ব্যর্থতায় থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে।

—আমাকে আপনারা মরতেও দেবেন না? হিমশীতল কণ্ঠ। মরা মানুষের মত স্থির দৃষ্টি চোখে লেগে আছে মেয়েটির।

প্রকৃতিস্থ হ'তে অশোকেরও কিছু সময় লাগে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে: সকালে আমি একবার হাসপাতালে দেখেছিলাম ব'লে মনে হচ্ছে। ডাঃ ধরকে আপনি দেখিয়েছিলেন, তারপর কি হ'য়েছে আমার জানা নেই। তিনি কি আপনাকে আত্মহত্যা করতে বলেছেন?

কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি। পাগলের মত অস্থিরতার সঙ্গে বলতে থাকে একটানা: আমাকে মরতে দিন। আমি যে মরতে চাই। আপনি আমার পথ আটকাবেন না। আমি কি করেছি আপনার?

অশোকের দুই হাতের মধ্যে কান্নায় লুটিয়ে পড়ে মেয়েটি। অশোক বলে: মরে যাবার কোনো অধিকারই নেই আপনার। মরে যাবেন কেন আপনি? আত্মহত্যা পাপ আপনি জানেন!

কি অসম্ভব চাউনী। কি শীতল কণ্ঠ। মুখটা কিছুটা তুলে রিক্ত কণ্ঠে বলে: পাপের আর কি ভয় আপনি দেখাবেন আজ আমাকে। সারা জীবন এই পাপ শরীরে নিয়ে নরকের এক প্রেতের মত জগতে বেঁচে কি পুণ্য আমি সঞ্চয় ক'রবো বলতে পারেন? আমার কেন এমন হ'লো! আমি কি করেছিলাম ডাক্তার! আমার স্বর্গ এমন নরকের বিষে আমি তো ভরিয়ে তুলিনি। ডাঃ ধর আমাকে সকালে বলেছেন এবার আমার হাড় ক্ষয়ে যাবে। মোমের মত ক্ষয়ে যাবে! নাক বসে যাবে। আমি ভাবতে পারি না ডাক্তার! ডাক্তার! আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আপনি আমাকে মরতে দিন ডাক্তার।

মেয়েটির সারা দেহে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে অশোক কিছুটা কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বলে: মিথ্যে কথা! ডাঃ ধর আপনাকে মিথ্যে ব'লেছেন। বলুন, কি বলেছেন তিনি! আপনার রোগ সারবে না, এমন কথা বলেছেন ডাঃ ধর?

অশোকের দুই বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটি। বেশ কিছুক্ষণ পর বলে: ডাঃ ধরের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কলকাতার ডাক্তারও আমাকে ঐ একই কথা বলেছেন।

অশোক যেন ধরতাই পায় নিজের কথার। বলে: কলকাতার বড় বড় ডাক্তার আপনি দেখিয়েছেন যখন আমার নিজের কিছু বলবার নেই! ডাঃ

ধরও খুব অভিজ্ঞ। আমার বিদ্যে সামান্যই। অভিজ্ঞতাও ক'দিনের। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন?

—আমার অসুখ সেরে যাবে! এই কথা ভাবছেন তো? বিদ্রূপের হাসি মেয়েটির ঠোঁটে।

অশোক বলে: আপনার রোগ মারাত্মক সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনি আর বিজ্ঞ ডাক্তারেরা মিলে মর্মান্তিক করে তুলেছেন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন? দয়া করে আমার কথা শুনুন। আপনার রোগ সারবে। আপনি আবার সুন্দর হয়ে উঠবেন। ভাল হয়ে যাবেন আপনি। ডাঃ ধর সেকেলে মানুষ। ডাক্তারী জ্ঞানও তার মান্ধাতার। কলকাতার ডাক্তার আপনাকে এভাবে কেন ভয় দেখিয়েছে বুঝতে পারছি না। আমি আপনার চিকিৎসা করবো। আপনি কতবড় একটা অন্যায় করতে চলেছিলেন আপনি জানেন না।

অশোককে বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে: আপনি আমাকে মিথ্যে আশা দেবেন না। এ রোগ সারে না আমি শুনেছি। এতবেশী 'পজিটিভ্ কেস' কিছুতেই সারতে পারে না। ডাঃ ধর আমার গায়ে হাত পর্যন্ত দেন নি। কাঠি দিয়ে কানে, গালে, মুখে আর পায়ে খুঁচিয়েছেন কিছুক্ষণ! আপনি কতটা জানেন। দাগগুলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছেন যে বড়।

পরিবেশটিকে সহজ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে অশোক। কৃত্রিম হাসিতে সারা মুখ ভরিয়ে তোলে। বলে: ডাক্তার হিসেবে আপনি আমাকে পাত্তাই দিতে চাইছেন না। দেখুন ডাঃ ধর বিজ্ঞ ডাক্তার সন্দেহ নেই, তবে এই রোগটি সম্পর্কে তিনি অতি হাস্যকর ধারণা মনে মনে পোষণ করেন আমি জানি। রোগ হিসেবে এ অসুখকে তিনি পাত্তাই দিতে চান না। সমস্তটাই নাকি কৃতকর্মের ফল! এমন কি এ জন্মের সাকিন-ঠিকানায় তেমন কিছুর হদিশ না পেলে গতজন্মের পাপের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে তিনি চূড়ান্ত ডায়গনিসিস সারেন।

তুচ্ছ হেসে মেয়েটি বলে: এ রোগ কখনও সারে?

অশোক অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে: কিন্তু আমি যদি আপনাকে সারাতে পারি! পূর্বের জীবন যদি আপনার ফিরিয়ে দিতে পারি! সুন্দর ক'রে

তুলতে পারি আপনাকে। কি দেবেন আপনি তাহলে? আত্মহত্যা! বেশ তো ছ'মাস পরেই আপনি করবেন। পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে নয়। তাতে কষ্ট অনেক, যন্ত্রণাও প্রচুর। যন্ত্রণাহীন সুন্দর মৃত্যুর ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব সেদিন। ছমাস পর আপনার গায়ের দাগ যদি মিলিয়ে যেতে সুরু না করে, যদি আপনার মনে হয় আপনি সারছেন না, বেশ তো আত্মহত্যা করবেন তখন। আপনাকে সাহায্যই করবো সেদিন। জীবনের যখন কোনো দামই নেই আপনার, দিন না আমি ছ'মাস নিয়ে নাড়াচাড়া করি। পৃথিবীর ওপর এ আপনার দুরন্ত অভিমান!

মেয়েটি বলে: অভিমান করে মানুষে। আজ আর আমি মানুষ নেই ডাক্তার।

—সামান্য একটা গিনিপিগের মর্য্যাদাই আপনি দিন না নিজেকে! তাতেই আমার কাজ হবে। আসুন! আমার সঙ্গে আসুন আপনি। সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে! সাপের ভয় আপনার নেই—আমার আছে।

পাথরের ওপরে রাখা কালো কোটটি হাতে তুলে নিয়ে অশোক অতি সহজ সরল কণ্ঠে কথা বলে।

কথা যেন কানেই পেঁছিলো না। ছলছলে চোখদুটিতে দুফোঁটা অশ্রু ভরে ওঠে। অশোকের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

অশোক বলে: আসুন, ভয় শুধু সাপের নয়। জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। গলা পাচ্ছি, কারা যেন আসছে এদিকে। শাড়ী ঠিক ক'রে নিন। সেফটিপিনগুলো আপনি এখনও খোলেন নি!

শাড়ী ঠিক হ'তে সময় অবশ্য লাগল না। বিনা বাক্যব্যয়ে অশোকের সঙ্গে পা চালিয়ে এলো মেয়েটি। জঙ্গলা পথ ছেড়ে পাকা রাস্তায় উঠে আসতে আসতে অনেক খবরই সংগ্রহ করে অশোক

কলকাতার বিখ্যাত এটর্ণী সুবিমল পালিতের একমাত্র তনয়া জয়ন্তী। কাউকে কিছু জানান না দিয়ে পালিয়ে এসেছে এখানে। উদাসীতে সুবিমলবাবুর একটা বাড়ি আছে। নেপালী দরোয়ান আর তার ছোট্ট পরিবার ছাড়া সে বাড়িতে আর কেউ নেই।

অশোক বিস্ময়ের স্বরে বলে: পালিয়ে এসেছেন? কেন মনুমেণ্ট ছিল না? হাওড়া ব্রীজের কথা কি আপনি ভুলে গিয়েছিলেন? কলকাতার লেকেও তো এ কাজ আপনি নির্বিঘ্নে সমাধা করতে পারতেন। আমার মত লোক হয়তো বাধা দেবার সুযোগই পেত না। আপনি একটার পর একটা অন্যায় করে চলেছেন। এ সব কি আপনি ঠিক করেছেন? আসুন, পা চালিয়ে আসুন।

সন্ধ্যে পার হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ। অশোক জয়ন্তীকে নিয়ে বাড়ি আসে।

সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। উত্তর বঙ্গের নানা অঞ্চলে আমার কোম্পানী তখন নানা শাখা বিস্তার করেছে। কিছুদিনের জন্যে আমি এই সমগ্র অঞ্চলের কাজের ভার নিয়ে এসেছি। দার্জিলিং-এর ষ্টিফেন ম্যানসনে একটি ফ্ল্যাট নিয়েছি। কালিম্পং-এর অফিস সংলগ্ন দু'কামরার একটা ফ্ল্যাটও আমার হাতে এসেছে। তামাম অঞ্চলে দৌড়ে বেড়ানো তখন আমার কাজ। নতুন এজেন্ট সংগ্রহ করি। চলতা পুরতা উৎসাহী এজেণ্টের মধ্যে থেকে অর্গানাইজার খুঁজি। ক্লান্ত শরীরে, নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে অশোকের কাছে আসি মাঝে মাঝে। ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে যাই উদাসীতে।

অশোকের সাড়া পেয়ে দরজা আমিই সেদিন খুলেছিলাম সন্ধ্যেবেলায়। একমুখো পাল্লার পাশে অশোকের সঙ্গে জয়ন্তীকে আমি প্রথম দেখি।

অতি সামান্য পরিচয়। হাতজোড় ক'রে নমস্কার বিনিময় হ'লো। সম্ভব-অসম্ভব নানা কথা ভাবছি। বিশেষ ক'রে অশোকের মত মানুষের সঙ্গে বেমক্কা জলজ্যান্ত এক তরুণীর ভরা শীতের সন্ধ্যেতে এভাবে এসে পড়াতে বিচলিতও হ'য়েছিলাম।

জয়ন্তীকে বসিয়ে অশোক ইশারায় আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেটারের চোখ এড়িয়ে পাশের বন্ধুকে যেমন প্রশ্নের খেই ধরিয়ে দেয়, অশোক অনেকটা সেই রকম তাড়াহুড়ো করে জয়ন্তীর সমস্ত কাহিনী আমাকে বলে গেল।

তারপর বল্লে: দেখ সৌরীন, তোমাকে আমি পুরাতন রোগী হিসাবে চালাবো। এককালে খুব কঠিন অবস্থা ছিল তোমার। আজ তোমার মুখের

এই হাল। একা আছে এখানে, কিছুটা মরাল সাপোর্ট ওর পাওয়া দরকার। একবার বাঁচানো গেছে, কিন্তু কখন আবার কি করে বসে তার ঠিক কি?

ঘর থেকে বেরিয়ে আসি চায়ের টেবিলে এসে বসি। জয়ন্তীর অসুখের কথা শুনলাম সেদিন অনেকক্ষণ ধরে।

জয়ন্তীর দিকে ফিরে অশোক বলে: শরীরের কোথাও আপনার প্রথম ছোট্ট একটু জায়গা নিয়ে অসাড় হ'য়ে যায় না? মনে করতে পারেন?

জয়ন্তীর মুখে বিস্ময়ের রেখা নেমে আসে। বলে: ঠিক তাই। প্রথমে হাটুর ওপরে একটু জায়গা আমার গোল হ'য়ে কেমন অসাড় হ'য়ে যায়। আমি তাতে গা করিনি। কিন্তু আপনি জানলেন কি ক'রে? এই রকম বুঝি হয়?

এক চুমুক চা মুখে নিয়ে আমি ছোট্ট মন্তব্য করি: ঠিক আমার মত।

স্মিত এক টুকরো হেসে অশোক কি কাজের ভাণ করে চেয়ার ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

বিস্ময় ও কৌতূহলের এক অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গি জয়ন্তীর চোখেমুখে সেদিন ভেঙে পড়েছিল। কিছুটা ঝুঁকে প'ড়ে বলে: আপনার কি এসব হ'য়েছিল?

নাটক করা আমার পেশা। অভিনয় আমার ভালই আসে। বলেছি: ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে ছিলাম আমি অনেকদিন। আপনার মত নয়, আমি এসেছিলাম ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে। আর কিছু দেরী ক'রলে বোধ হয় বোন্ অ্যাফেক্ট ক'রতো। আপনি টের পেয়েছেন কতদিন?

জয়ন্তী আমাকে ছাড়তে চায় না। অনেক কথা। বহু সাজানো বানানো কথার হিজিবিজি। আমার কথায় জয়ন্তীর মনের বিষণ্ণ গুমট ভাব বেপরোয়া এক দখিন হাওয়ায় যেন উধাও হ'য়ে গেল মুহূর্তে।

জয়ন্তী যেন সার্থক। আমার চেহারার মধ্যে থেকে ভাবীকালের নিজের মুখশ্রী যেন তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। খুশীর হাসিতে রাঙা হ'য়ে গেল জয়ন্তী।

শীতের দিন। বেশ কিছু রাত করেই আমরা সেদিন জয়ন্তীকে বাড়ি পেঁৗছে দিলাম।

ফেরার পথে অশোক আমার হাত চেপে ধরে বলে: মেয়েটির সম্পর্কে আমার আর দুশ্চিন্তা নেই। এবার ও নিজের থেকেই বাঁচতে চাইবে। তুমি কি দুরন্ত অভিনয় করতে পার!

হেসে বলেছি আমি: অভিনয়ের সুযোগ চাই। নাটক তোমার ভালই।

খবর পেয়ে সুবিমল পালিত এলেন দুদিন পর। চোরের মত এলেন। অশোকের হাতে মেয়ের চিকিৎসার ভার তুলে দিয়ে আবার চোরের মত পালিয়ে গেলেন।

দীর্ঘদেহী, সুগঠিত স্বাস্থ্যের প্রবীণ এই মানুষটিকে আমার অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল সেদিন।

বলে গেলেন: জয়ার অসুখের কথা গোপন করেই রাখবেন। কলকাতায় রাখার অনেক বিপদও আছে। জানাজানি হবার ভয় পাই। বিয়ে তো আমাকে দিতে হবে মেয়ের।

সুবিমলবাবুর তাড়াহুড়ো করে আসা ও দুদিন পর মাসি বা পিসি জাতীয় এক বিধবা মহিলাকে জয়ন্তীর কাছে ফেলে দিয়ে আবার চলে যাওয়াটা আমার কিন্তু কেমন কেমন লেগেছে।

বড় কঠিন মেয়ে জয়ন্তী। অতি সহজে ধরা দেবার মেয়ে সে নয়। পারিবারিক সমস্ত প্রসঙ্গ সে কিছুটা এড়িয়েই যেতে চায়।

অশোকই বলে একদিন। জয়ন্তীর মাতৃবিয়োগ হ'য়েছ শৈশবে। সুবিমল-বাবু দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছেন। বাইরে বাইরে মানুষ হয়েছে জয়ন্তী। হোস্টেলে থেকে পড়া। জয়ন্তীর চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন ডাঃ অলক ঘোষ। সামনাসামনি না বল্লেও রোগ সম্পর্কে তাঁর নৈরাশ্যজনক মন্তব্য জয়ন্তীকে সম্পূর্ণ হতাশ করে। কাউকে না জানিয়ে সে কলকাতা ত্যাগ করে। কথা প্রসঙ্গে আরও জানলাম ডাঃ ঘোষ সুবিমলবাবুর হাল আমলের শ্যালক। জয়ন্তীর হঠাৎ পাওয়া মাতুল।

দুদিন পর আমাকে জরুরী কাজে উদাসী ছেড়ে চলে যেতে হলো।

আমি তখন দার্জিলিংয়ে। বিকেল বেলা পার্ক রেস্টরেণ্টে কফি নিয়ে বসেছিলাম। নিজের কাজের ও ব্যক্তিগত নানা সমস্যায় ডুবে ছিলাম।

শীতকাল। লোকজনের বালাই নেই একরকম। জুতোর ফিতে ট্রাউজারের ক্রিজ, আর হাতে পায়ে সাহেবীয়ানা ঠিক রাখতে বেশ কষ্টই ছিল সে সময়ে। আজ যদি আমার এয়ার কন্‌ডিশন্‌ড্‌ সেলুন কামরায় হাত পৌছায় তখন আমার পকেটে থাকতো ইণ্টারের কোনের সীটের রিজার্ভেশন। তবু ঠাট বজায় রাখা চাই। নিতান্ত প্রয়োজনের ব্যয় সঙ্কোচ করে আয়োজনের বহর ঠিক রাখতে হয়।

এমন সময় ফোন এলো। দোকানের মালিক এসে জানালো আমার ফ্ল্যাট থেকে তলব এসেছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেলাম।

মাথায় ঘোমটা তোলা জয়ন্তীকে সেদিন করিডোরে দেখে অবাক হ'লাম। কিছুটা অপ্রস্তুতের ভাব। সঙ্কোচের কণ্ঠও ছিল কিছুটা। ঘরে নিয়ে বসালাম।

জয়ন্তী বলেঃ ডাক্তারের কাছে আপনার ঠিকানা নিলাম। বেড়াতে এসেছিলাম এখানে। তাই ফেরার পথে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলাম।

জয়ন্তীর এভাবে আমার এখানে আসা আমার বড় ভাল লাগলো না। আমার সঙ্গে যে সামান্য পরিচয় তাতে ফোনে তলব ক'রে দেখা না করলে মহাভারতের কিছু হানি হ'তো ব'লে মনে হয় না।

দুচার কথার পর কিন্তু আমাকে বুঝতে হ'লো অন্য রকম। মনে হ'লো জয়ন্তী কি যেন ব'লতে এসেছে। অনুমান মিথ্যেও নয় মোটেই। একথা সেকথার পর জয়ন্তী বলেঃ দেখুন, লুকোবেন না মোটেই। সত্যি করে বলুন, আমার কি এ রোগ সারবে?

সিগারেটে মুখাগ্নি করে বলিঃ আমাকে দেখেও আপনার বিশ্বাস হয় না। ডাক্তারকে বিশ্বাস ক'রতে হয়।

জয়ন্তী জবাব দিলেঃ বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়! অনেকদিন তো হ'লো, সারবার তো কোন লক্ষণই দেখিনে। বরং কি যে হয়েছে আমার। দেখবেন আপনি? এই দেখুন! আপনার ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে আমার কি অবস্থা হয়েছে আপনি দেখুন। আমি কি এই রকম ছিলাম? ডাক্তার বলেন—রিঅ্যাকশনের চিকিৎসায় নাকি কাজ হচ্ছে। অয়েল ইনজেকশনে প্রথমে এরকম ইরাপশন নাকি হবেই

ঘোমটা খুলে ফেলে মাথার। কোটের বোতাম খুলে কাঁধটা জয়ন্তী আমাকে দেখালে অনেকক্ষণ ধরে।

আমি শিউরে উঠি। মাথাটা আমার ঘুরেই গেল একরকম।

তারপর একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে আমি মিথ্যের পর মিথ্যে বলে গেলাম। আমার নিজের ভয়ঙ্কর দিনের এক ফটোগ্রাফ দেখাতে চাইলাম এবং এটা সেটা নাড়াচাড়া ক'রে নিতান্ত অনিবার্য কারণে সেটা আমি আর খুঁজে পেলাম না।

কি মন নিয়ে জয়ন্তী সেদিন ফিরে গেল আমি জানি না। কিন্তু আমার সমস্ত মন তখন তোলপাড় ক'রছিল। এ কি রোগের চিকিৎসা! না অশোকের আগুন নিয়ে খেলা!

উদাসীতে আমি গেছি তারপর। ছোট জায়গা! জয়ন্তীর সাক্ষাৎ এড়ানো কঠিন। ভরসা দিয়েছি সাজানো কথায়। মন থেকে সাড়া পাইনি। দুদিনের বিশ্রাম! আবার চলে গেছি অন্য খানে।

শুধু বর্ষা নয়। সারা অঞ্চলে বড় দুর্দিনই গেল সেবার। দুর্য্যোগের এক রাতে অশোক আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির।

খবর পেলাম জয়ন্তী গেছে কলকাতায়। দিন দশেকের ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেছে। হাসপাতালের ডাঃ ধর সামনের সপ্তাহে অবসর নেবেন। আরও শুনলাম এক আমেরিকান স্কলারশিপ অশোকের হাতে এসেছে। মাস-খানেকের মধ্যেই তাকে যাত্রা করতে হবে।

ভালই লাগলো শুনে। তার সামান্য কোনো উপকারে লাগলে আমি খুশী হবো জানালাম। জয়ন্তী কিছুটা ভাল আছে জেনে বড় ভাল লাগলো।

পরদিন অশোক চলে গেল। মাসের শেষে একবার উদাসীতে যেতে ব'লে গেল।

কথা আমি রেখেছি। জয়ন্তীকে সহজ ভাবে হাসতে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। বিস্মিত হলাম বাইরে থেকে দেখে ওর শরীরের বীভৎস রোগের আনাগোণা কিছুমাত্র চোখে পড়ে না। অনেকটা পরিস্কার পরিস্কার দেখলাম সেদিন জয়ন্তীকে।

অশোক বলে : আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় জয়ন্তী ?

জয়ন্তী হেসে কুটি কুটি হ'য়েছে। বলেছে : দেখুন তো সেনসাহেব। আত্মহত্যা ক'রতে যাব কোন দুঃখে। কি রকম ভয়ঙ্কর সব কথা বলেন উনি শুনেছেন !

অশোক বলে : তোমার চিকিৎসার প্রথম পর্ব প্রায় শেষ। দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হবে নতুন ক'রে। দাগ নেই, কিন্তু রোগ তোমার কিছুমাত্র সারেনি। সময় লাগবে। আরও কিছু ধৈর্য ধরতে হবে।

রাত্রে খাবার টেবিলে বসে অশোকের কথায় আমি অবাক হ'লাম। স্কলারশিপ্ তার কপালে একটা জুটেছে ঠিকই কিন্তু দেশ ছেড়ে তার এখন কোথাও যাওয়ার বাধাও নাকি অনেক। ও প্রসঙ্গ অশোক দেখলাম চেপে যাচ্ছে।

লেখাপড়া আমার সামান্যই। তবু অশোকের যুক্তিতে আমি অবাকই হলাম। বৃটিশ বা জর্মন স্কলারশিপের যে কৌলিন্য আছে, আমেরিকান স্কলারশিপের নাকি সে মর্য্যাদা নেই। ওদেশ থেকে ঘুরে এসে এদেশে নাকি চড়া দাম পাওয়া মুস্কিল। তাছাড়া হাসপাতালের ডাঃ ধর চলে যাচ্ছেন। জয়ন্তী আছে।

আমি বেশ বুঝলাম, নিজের কথার মধ্যে অসংগতি অশোক নিজেই খুঁজে পেয়েছে যথেষ্ট। তাই তাড়াহুড়ো করা। অন্য প্রসঙ্গ তোলা।

জোর করাটা আমার আসেনা। তবু সামান্য দু'চার কথাতেই দেখলাম অশোক বিব্রত হচ্ছে। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। তবে লোভনীয় আমেরিকান স্কলারশিপ ফেলে তিনশ' টাকার হাসপাতালের চাকুরী আঁকড়ে ধরবার রহস্য আমার কাছে ঠিক রহস্যই রয়ে গেল না। জয়ন্তীর ভাবসাব দেখে সে ধারণা আমার আরও দৃঢ় হলো।

অশোককে দেখলাম চিকিৎসকের সীমারেখা লঙ্ঘন ক'রছে অনেকটা। ওষুধে নয়। পথ্যেই নয় শুধু। জয়ন্তীর এম. এ. পরীক্ষা সম্পর্কে সে চিন্তা করতে শুরু করেছে। তাতে অবশ্য এমন কিছু দোষের ছিল না। কিন্তু জয়ন্তীর পরণে কি রঙের শাড়ী সবচেয়ে মানায় ভালো সে সম্পর্কেও দেখলাম অশোকের বক্তব্য আছে। জয়ন্তীর টনসিলে ক্ষুর চালানোতে আপত্তি করবার

কি আছে? কিন্তু কণ্ঠের স্বরের প্রতি জয়ন্তীর নিতান্ত অবহেলা অশোককে দেখলাম পীড়িত করেছে অনেকটা।

অবশ্য বলিনি আমি কিছুই। অর্থপূর্ণ হেসেছি।

মরশুমের সময়। দার্জিলিং শহর জমজমাট। একটা কাজ সেরে বাড়িতেই ফিরে আসছিলাম।

প্রায় মুখোমুখি পড়ে গেলাম। দেখা হয়ে গেল ক্যালকাটা রোডের ধারে। বটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরছিলেন বোধ হয়। সুবিমল পালিত দেখি মৃদু মৃদু হাসছেন। সঙ্গে এক মহিলা ও অপর এক ভদ্রলোক। জয়ন্তীও আছে সঙ্গে।

নিতান্ত পরিচয়ের খাতিরে পরিচয়। অপরিচিতা ভদ্রমহিলা সুবিমল পালিতের স্ত্রী। সঙ্গের অপর ভদ্রলোকের নাম ডাঃ তরুণ মিত্র। উদাসী দাঁড়ার হাসপাতালের নতুন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্।

ডাঃ মিত্রের সুন্দর অমায়িক ব্যবহার আমাকে স্পর্শ করে। হাসিটি সুন্দর। কথাও বলেন ধীরে। বিলেত থেকে সার্জারীতে পাকা হয়ে এসেছেন। কিন্তু হাতের আঙুলগুলো দেখে মনে হলো প্রেমের কবিতাই এনার হাতে আসে ভাল।

হাইকোর্ট বন্ধ। গরমও কলকাতায় প্রচণ্ড। সুবিমল পালিত সস্ত্রীক উদাসীতে কিছুদিন থেকে যাবার ইচ্ছে নিয়ে এসেছেন। তবে শুনলাম পাহাড়ে সুবিমলবাবুর স্ত্রীর শরীর ভাল থাকে না। ভরসা দিয়েছেন ডাঃ মিত্র।

ভদ্রমহিলার ভাবসাব দেখে মনে হ'লো অফিসে যেন তাঁর লেট্ হয়ে যাবে ঠিকই। আমার পুরোপুরি পরিচয় পেয়ে কেমন যেন চুপসে গেলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর পরিচিত এক ইনসিওরেন্স এজেণ্টের যে গল্প করলেন তাতে আমাকে যথেষ্ট কটাক্ষই করা হলো। আমি অভ্যস্ত, খারাপ লাগেনি মোটেই। তবে তাঁর ঠোঁটের রঙ আর মুহুর্মুহুঃ ভুল ইংরেজী আমার অসহ্য লাগছিল মাঝে মাঝে।

সেবার উদাসীতে গিয়ে দেখি আসর খুব জমজমাট। পোর্টিকোতে গোল হয়ে বসে হাসাহাসি হচ্ছে। আমাকে দেখে জয়ন্তী এগিয়ে এলো। সুবিমলবাবু

বলেন : আসুন স্যার ! মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন ডাঃ মিত্র। ডাঃ মিত্রের সুন্দর বিনয় আমাকে স্পর্শ করে।

ডাঃ মিত্রকে আমার প্রয়োজনও ছিল। এ কথা সেকথার পর কথাটি পাড়লাম। আমার কথায় দ্বিধা ছিল। সঙ্কোচও ছিল কিছু। হেসে কিন্তু একেবারে উড়িয়েই দিলেন ডাঃ মিত্র।

বললেন : টিবেটিয়ান ! তাতে ক্ষতি নেই। নেপালী বলতে জানে তো ? দেবেন পাঠিয়ে। অনেকে আসছে, দরখাস্ত পড়েছে বহু। আপনার একটা চিঠি যেন নিয়ে আসে। গোলমাল হয়ে যাবার ভয় থাকবেনা তা'হলে।

বললাম : মেয়েটিকে আমি জানি। নেপালী সে ভালই জানে। ইংরেজীও বলে বেশ। মেয়েটির ভাই আমার কোম্পানীর এক এজেন্ট। মেয়েটি নার্সিং পাশ করেছে গত বছর। শীতের দেশের মানুষ, অন্যত্র যেতে চায় না। তাই আপনার হাসপাতালে ওকে যদি নেন তবে বড় ভাল হয়।

সুবিমলবাবুর পায়ের তলায় বিরাট একটা এ্যালশেসিয়ান বসেছিল। কথার মাঝখানে সে কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম অশোক আসছে গেট পেরিয়ে।

সেদিন এক অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করলাম। সুবিমলবাবু মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সুবিমলবাবুর স্ত্রী এক কাজের অজুহাতে ভেতরে চলে গেলেন। জয়ন্তীরও নড়নচড়ন নেই। ডাঃ মিত্রের ঠোঁটের কোণে সামান্য এক টুকরো হাসি নেমে আসে। আর আমি নীরব।

মুখর হলো একজন। সুবিমলবাবুর পায়ের তলা থেকে প্রচণ্ড এক চীৎকার করে উঠলো কুকুরটা। সুবিমলবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন : ফ্রেডি ! ফ্রেডি ! ডাঃ মিত্র চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আমি ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে ! একলাফে পোর্টিকো পেরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে গেল ফ্রেডি। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল।

কিন্তু অঘটন কিছু ঘটলো না। ভেবেছিলাম অসম্ভব গতিবেগ নিয়ে অশোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ফ্রেডি। দুরন্ত বেগে ছুটে গেল ঠিকই ! তবে অশোকের কাঁধের ওপর দুই থাবা রেখে লকলকে জিব বার করে হাঁপাতে থাকে ফ্রেডি।

আমি আশ্বস্ত হই। ডাঃ মিত্র তুচ্ছ এক কৌতুকের হাসি হাসেন। এই বিশেষ শ্রেণীর সারমেয়টির অশোকের প্রতি আকস্মিক এই আশ্চর্য রকম সৌজন্যতায় কিছুটা বিস্ময়ও প্রকাশ করেন।

দেখলাম অশোক ডাঃ মিত্রকে এখানে ঠিক এ সময়ে আশা করেনি। ডাঃ মিত্রও কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। তাড়াহুড়ো ক'রে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পর মুহূর্তেই সুবিমলবাবুর স্ত্রী এসে হাজির। অশোককে দেখে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করেন। বলেনঃ খুব সকালে বা রাত ক'রে এলেই তো পারেন। ডাঃ মিত্র বুঝি চলে গেলেন? ডাঃ মিত্রের সঙ্গে আমার যে কিছু কথা ছিলো।

সঙ্কোচের হাসি টেনে অশোক বলেঃ আজ জয়ন্তীর শেষ ইনজেকশন্! কাল থেকে আপনার এখানে আসবার আমার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না।

সুবিমলবাবু বলেনঃ আসল কথা হচ্ছে রমা জানাজানি হবার ভয় পায়। ডাঃ মিত্র কিছু সন্দেহও তো করতে পারেন। অনর্থক এসব কথা জানিয়ে গৌরব আমাদের বাড়বে না, একথা আপনার জানা দরকার।

জয়ন্তী ঘরে চলে যায়। অশোক অনুসরণ করে পেছনে।

রমা দেবী আমার দিকে তাকিয়ে বলেনঃ আদতে আপনার ডাক্তার বন্ধুটির কাণ্ডজ্ঞান একটু কম। উনি আর কাউকে কিছু বলেন নি আমার বিশ্বাসই হয় না মোটে। আপনি ওনার বন্ধু ভাল কথা, তাই বলে জয়ন্তীর অসুখের কথা এত ঘটা ক'রে আপনাকে বলার কি কারণ থাকতে পারে?

কানে কে যেন আমার গলানো সীসে ঢেলে দিল। বলতে ইচ্ছে হ'লো অনেক কথা। মনে হ'লো একবার জিজ্ঞাসা করিঃ আপনার ভাই তো চৌষট্টি টাকার ডাক্তার। বিলিতি ডিগ্রীর মিছিলের ঠেলায় তার নাম খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। জয়ন্তীর রোগ সম্পর্কে নৈরাশ্যজনক ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন কেন? ডাক্তারী বিদ্যেই কি শুধু তাতে কাজ করেছিল, না আপনার গোপন হাত ছিল তাতে?

একবার মনে হলো জয়ন্তীর ভয়ঙ্কর দিনের কথা প্রকাশ করে দিই। পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার দিন অশোক কি ভাবে তার প্রাণরক্ষা করে,

পুরাতন রোগীর অভিনয় ক'রে দুরন্ত অঘটন থেকে জয়ন্তীকে কি ভাবে রক্ষা করা গেছে সে সব কথাই প্রকাশ করে দিই।

বলতে আমি অনেক কিছুই পারি! কিন্তু নিজেকে সংযত করেছি। তুচ্ছ এক কথার খেই ধ'রে সুবিমলবাবুর সঙ্গে কথার খাতিরে কথা বলতে চেয়েছি।

রমা দেবী এক নজর আমাকে দেখে নিয়ে সুবিমলবাবুকে বলেন: আমি ডাঃ মিত্রের ওখানে একবার চললাম। আমার গোড়ালির ব্যথাটা একবার দেখিয়ে আসি। এই জন্যেই তো আমি পাহাড়ে আসতে চাইনে।

রমা দেবী চলে গেলেন।

সুবিমলবাবু কিছুটা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর বলেন: কাজকর্ম চলছে কেমন? আপনার শরীর এখন কেমন? জয়ার কাছে আমি সব শুনেছি! অবশ্য আমি কাউকে কিছু বলিনি। রমার কাছেও নয়। আপনি জয়ার অসুখের কথা কাউকে বলেন নি নিশ্চয়ই। এমন সুন্দর স্বাস্থ্য অথচ কেন এমন হয়? শুধু আপনি কেন, রাণীর মত মেয়ে আমার জয়া; এসব আসে কোথা থেকে বলতে পারেন!

সুবিমলবাবুর কথায় কেমন যেন দয়া হলো। কিসে আমায় পেয়ে বসলো জানি না! আমি সব কথা বলে গেলাম। অশোকের সঙ্গে জয়ন্তীর প্রথম দিনের সাক্ষাতের ঘটনা থেকে আরম্ভ ক'রে আমার মিথ্যে রোগী সাজার সমস্ত ঘটনা আমি প্রকাশ ক'রে দিলাম।

সুবিমলবাবু বিস্মিত। হতবাক। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ।

আমি বলি: ভেবেছিলাম এসব কথা বলবো না! না বললেই হয়তো ভাল করতাম। আমার কথা আপনাকে কাতর করেছে জানি কিন্তু আপনি জয়ন্তীর বাবা! জয়ন্তীকে আমি বিশেষ স্নেহ করি। এসব কথা অন্য কাউকে না বললেও আপনাকে হয়তো বলতে পারি। আপনাকে আহত করলাম অন্যায় করে! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সুবিমলবাবু উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে! শুষ্ক মুখ! স্থির দৃষ্টি।

বাইরে তাকিয়ে দেখি আকাশে সন্ধ্যা নেমেছে অনেকক্ষণ। গাছের মাথায় মাথায় কুয়াসার স্তূপ জমেছে আরও অনেক বেশী। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি পোর্টিকো শূন্য! সুবিমলবাবু নেই।

শেষ ইনজেকশন শেষ হ'তে অনেক সময় লাগে নাকি? জয়ন্তীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম অশোকের বুকের মধ্যে মুখ রেখে জয়ন্তী দাঁড়িয়ে আছে। ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে দেহটা। অশোকের চোখমুখ দেখে মনে হ'লো তাকেও বিচলিত করেছে অনেকটা।

পা টিপে টিপে পালিয়ে এলাম। একাই ঘরে ফিরে এলাম।

তারপর কিছুদিন কোনো খবর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কলকাতায় এসেছিলাম অফিসের কাজে। চন্দননগর থেকে একদিন পক্স নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। নিজে ভুগলাম। বাড়ির প্রায় সবাইকে ভুগিয়ে বেশ কিছুদিন পর আমি কালিম্পং আসি। প্রায় মাস দুই পর আমি দার্জিলিং ফিরে আসি।

একদিন অশোক এলো সকাল বেলা। কিছুটা নরম নরম দেখলাম বলে মনে হ'লো। মুখে লেগে থাকা ঠোঁটের হাসিটি কেমন নিস্প্রভ! চোখদুটি দীপ্তিহীন। কুয়াশায় ভিজে মাথার চুলগুলো কেমন সেঁতসেঁতে।

অশোককে আমি দেখছি দীর্ঘকাল। অতিশয় চাপা চরিত্রের মানুষ। সহজে বিচলিত হবার পাত্র সে নয়। কোথায় বিশেষ একটা গোল বেঁধেছে ব'লে মনে হলো।

জয়ন্তী সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই কেমন যেন সাদা হ'য়ে গেল। তারপর ম্লান একটুকরো হেসে বলে: জয়ন্তী, হ্যাঁ সে তো উদাসীতেই আছে। যতদূর জানি শরীরও তার ভালই আছে। আমার ইনজেকশনের কোর্স-তো শেষ হয়েছে অনেক দিন।

অশোককে আমি সেদিন এড়িয়ে যেতে দিইনি। জবাবে শুধু বলেছিলাম: জয়ন্তী ভাল আছে জেনে ভাল লাগলো, কিন্তু তুমি ভাল নেই কেন?

অশোক অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে। বলে: মিস ওয়াংদিকে তুমি ডাঃ মিত্রকে ধরে উদাসীর হাসপাতালে ঢুকিয়েছো শুনলাম। মিস ওয়াংদি যে তোমার লোক আমি জানতামই না এত দিন। জয়ন্তীর মুখে আমি সেদিন শুনলাম।

ঠোঁটে হাসি টেনে বলি: ডাঃ মিত্র সত্যি চমৎকার মানুষ। কথায় কথায় বলেছিলাম, কিন্তু তিনি যে এতটা মনে ক'রে মিস ওয়াংদিকে

চট ক'রে নিয়ে নেবেন ভাবতেই পারিনি। মাঝে কালিম্পং-এ দেখা হয়েছিল একদিন। তোমাদের সিষ্টার ছায়া বিশ্বাসকে দেখি এক গাদা আনারস নিয়ে গাড়ীর মধ্যে বসে আছেন। আমি প্রথম চিনতে পারেনি…।

থামতে হল। দেখলাম অশোক আমার কথা মোটেই যেন শুনতে পাচ্ছে না। টেবিলে রাখা ইনসিওরেন্স জার্নাল খুলে বসেছে।

ধীরে ধীরে কাছে এসে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আমার দিকে চোখ তুলে অল্প হেসে বলে: কি দেখছো?

বললাম: ব্যাপার কি বলতো? তোমাকে আজ এরকম দেখছি কেন। তুমি হাসতে পারছো না কেন! কি হয়েছে তোমার? জয়ন্তী-কে নিয়ে এলেই পারতে।

অশোক ভাঙবে তবু মচকাবে না। শুষ্ক হেসে বলে: আমার আসারই কোনো ঠিক ছিলো না। বড্ড গুমট লাগছিলো তাই বেরিয়ে পড়লাম।

বললাম: দেখ অশোক, আমার কাছে লুকোবে না। তোমার কথা আমার শোনা দরকার। জয়ন্তীর কথা আমার জানতে ইচ্ছা করে।

আরও কিছুক্ষণ সময় গেল। তারপর অশোকের মুখে যে সংবাদ পেলাম তাতে আমি বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে এসে পৌছোই।

জয়ন্তীর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ ছিল অশোকের। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালের কাজের অজুহাতে সে নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলো। ডাঃ মিত্রকেই বলতে এসেছিলেন রমা দেবী। নেহাৎই সামনাসামনি পড়ে যাওয়াতে রমা দেবী অশোককেও সন্ধ্যেতে আসতে বলেছিলেন। নিতান্তই ছিল বলার খাতিরে বলা।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত অশোক কি ক'রতো বলা কঠিন। অন্ততঃ জয়ন্তীর ঘটা ক'রে সাজা একবার হয়তো দেখতে যেত। কিন্তু মিস ওয়াংদি অশোককে এক রকম আটকে দিল।

চেনা মুখ

সে দিনটা ছিল লোসার। তিব্বতী নববর্ষের প্রথম দিন। ওয়াংদির এক ভাইয়ের আসার কথা ছিল লেবং থেকে। আয়োজন সবই ছিল প্রস্তুত। দূর থেকে কিন্তু শুধু অপ্রস্তুতের একশেষ হয়ে ভাই শেষ মুহূর্তে এক চিঠিই লিখে পাঠিয়েছিল। মনের মত আচ্ছুর সন্ধান পায় না ওয়াংদি।

মিস ওয়াংদি একরকম জোর ক'রে তার কোয়াটার্স-এ ধরে নিয়ে আসে অশোককে।

সিল্কের ঝালর বসানো সাদা 'খাদা' তুলে দিয়েছিল অশোকের গলায়। হেসে কুটি কুটি হ'তে হ'তে কপালে ছাতুর গুড়োর তিলক এঁকে দিয়েছিল।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। 'লোসা' উৎসব অশোকের বড় ভাল লাগে। মিস ওয়াংদির অতি সুন্দর আপ্যায়ন আরও অনেক বেশী মুগ্ধ করে। আহারেরও বিচিত্র আয়োজন ছিল সে সন্ধ্যায়। মিস ওয়াংদির হাতের তৈরী অতি সুন্দর খাবজে। সেই সঙ্গে অতি লোভনীয় থুকপা।

মিস ওয়াংদির আপত্তি ছিল 'কোদো'তে। সুললিত কণ্ঠে হেসে বলেছিল: বিয়ার চলে না আপনার, 'কোদো' খাবেন কি? মিলিটারী রাম-এ যারা হাত পাকিয়েছে কোদো তাদেরও বেশ কাহিল করে। মাপ ক'রবেন ডাক্তার। আপনাকে কিছু থুকপা দেব কি?

কথা কানেই নেয়নি অশোক। হেসে বলেছে: উৎসব হয় না প্রত্যহ। 'লোসা' বছরে আসে একদিন। একপাত্র 'কোদো' না দিলে কিন্তু আমার ভাল লাগবে না সিস্টার।

সুরেলা কণ্ঠে চোখ বন্ধ করে খিল খিল ক'রে হেসে উঠেছিল মিস ওয়াংদি। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাঁশের তোংবায় কিছুটা 'কোদো' অশোকের হাতে তুলে দিয়েছিল।

বেশ কিছুক্ষণ বসবার ইচ্ছেই ছিল অশোকের। সিস্টার ওয়াংদির মুখে লোসা উৎসবের গল্প শুনতে বেশ ভালই লাগছিল তার। হঠাৎ খেয়াল হ'লো সে ঠিক নেই। শরীরটা কেমন যেন করতে লাগলো।

পা চালিয়ে নিজের কোয়াটার্স-এ ফিরে আসে অশোক।

ঘরে এসে ঢুকেছে সবেমাত্র। এমন সময় একেবারে জানান না দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে জয়ন্তী।

অবাকই হয় অশোক। রাত ক'রে এভাবে জয়ন্তীর এসে পড়াটা ঠিক আশা করেনি অশোক। কিছুটা বিস্ময়ের সুরে বলেঃ জয়ন্তী, তুমি এত রাত করে?

জয়ন্তী জবাব দেয়নি সেকথার। স্তব্ধ হ'য়ে অশোককে দেখতে থাকে অনেকক্ষণ ধ'রে। জয়ন্তীর দৃষ্টি অনুসরণ করে অশোক নিজের দেহে চোখ ফিরিয়ে আনে। সিল্কের ঝালর লাগানো 'খাদা'টির প্রান্ত এক হাতে ধরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, জয়ন্তীর কথায় বাধা পেল।

জয়ন্তী বলেঃ ডাঃ মিত্র তা'হলে খুব ভুল বলেন নি!

অশোক বলেঃ ভুল হয়তো বলেন নি, পুরোটা তোমার শোনা হয়নি।

শুষ্ক হেসে জয়ন্তী বলেঃ তাই শেষটা দেখতে এলাম। তুমি এত নীচ! প্রতারণা কর আমার সঙ্গে।

অশোকের চোখেমুখে দুরন্ত বিস্ময়রেখা নেমে আসে। বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলেঃ এসব তুমি কাকে ব'লছো? তুমি এসব কি বলছো জয়ন্তী। ডাঃ মিত্র তোমাকে কি বলেছেন?

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে জয়ন্তী বলেঃ হাসপাতালের অজুহাত দিয়ে তিব্বতী নার্সের ঘরে রাত কাটাতে আজকাল যে খুব অভ্যস্ত হয়েছো আমার জানা ছিল না। ছি ছি, কুলিদের মত মদ গিলেছো তুমি! তোমার রুচি সার্থক! এই মন নিয়ে তুমি আমার বাড়ির সমালোচনা কর! সত্যি এতটা প্রতারণা তুমি আমার সঙ্গে করবে আমি ভাবতে পারিনি।

কণ্ঠ অবরুদ্ধ! বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে যেন পৌঁছে যায় অশোক। সামনের টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলেঃ প্রতারণা! আমি প্রতারণা করেছি তোমার সঙ্গে। এসব কথা তুমি কাকে ব'লছো জয়ন্তী।

জয়ন্তীর চোখেও অস্থির দৃষ্টি নেমে আসে। কণ্ঠস্বরে এক অস্বাভাবিক কাঠিন্য ফুটে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে বলেঃ প্রতারণা তুমি আমাকে ক'রেছো দীর্ঘদিন ধরে। আমার অসুখ থেকে সে প্রবঞ্চনার সুরু। তোমার 'অয়েল' চিকিৎসায় আমি কতটা সেরেছি জানি না, কিন্তু আজ আমি অনেক জেনেছি! 'সালফোন' ছিল না? 'প্রমিন' দিতে পারনি তুমি?

বজ্রাহত অশোক অস্ফুট স্বরে বলে : 'সালফোন' আর 'প্রমিন-এর কথা তুমি কার কাছে শুনে এলে জয়ন্তী। তুমি আজ আমাকে এসব কি বলছো?

পূর্বের কণ্ঠ জয়ন্তীর। বলে : আমি কিছু ভুল শুনিনি। চিকিৎসা তুমি করেছো, টাকা বাবাও তোমাকে কম দেন নি। সেনসাহেবকে মিথ্যে রোগী সাজিয়ে আমাকে তুমি হাতে রেখেছো। চতুর ব্যক্তি তিনি। ডাঃ মিত্রকে ধ'রে তিব্বতী নার্সটিকে তিনিই নিযুক্ত করেছেন এই হাসপাতালে। আমার এখন সব পরিষ্কার লাগছে। বুঝতে পেরেছি সবকিছু। কিন্তু 'সালফোন' চিকিৎসা যদি করতে তুমি, 'প্রমিন-এর সাহায্য নিলে আমি অনেক আগেই ভাল হয়ে যেতাম! বল, জবাব দাও? জবাব তোমার নেই আমি জানি!

টেবিলে রাখা কাচের অনেকগুলো পাত্র অশোকের হাতে নাড়া খেয়ে ঝনঝনিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ে। চীৎকার করে ওঠে অশোক : জয়ন্তী!

রাগে-দুঃখে জয়ন্তী এবার যেন ভেঙ্গে পড়ে। চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। বেদনাহত-কণ্ঠে বলে : আমার জন্মদিন উপেক্ষা ক'রেছো, তা সে ভালই করেছো তুমি। কিন্তু হাসপাতালের নার্সের ঘরে বসে 'কোদো' গেলবার মধ্যে আর যাই থাক রুচির পরিচয় নেই। নিজেকে কিছুটা সম্মান করতে শেখো। আমাকে ঠকিয়ে তুমি লাভবান হয়েছো কতটা আমি জানি না, কিন্তু আমাকে তুমি শূন্য করেছো। রিক্ত করেছো অনেক করে।

জয়ন্তী অন্ধকারের মধ্যে চলে যায় সে রাত্রে। সিল্কের ঝালর বসানো 'খাদা' গলা থেকে হাতে খসে আসে অশোকের মুঠিতে।

ছাইদানে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত সিগারেট। অশোক একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছে। আমিও কেমন বিমূঢ় হয়ে বসে থাকি। বিভ্রান্ত হয়ে যাই অনেকটা।

কথা অবশ্য আমিই বলি প্রথমে। তুচ্ছ হেসে বললাম : 'সালফোন', 'প্রমিন' না কি যেন সব বললে!

ঘরের নীরবতা ভেঙ্গে অদ্ভুত এক ফাঁকা হাসিতে সারা পরিবেশ ভরিয়ে তোলে অশোক। সহজ হাসি নয়। জোর করে হাসা। কৌতুক বা উপহাসের হাসি নয়। বিদীর্ণ হৃদয়ের বেয়াড়া অট্টহাসি। বিলীয়মান সেই অদ্ভুত হাসির মধ্য থেকে অরুন্তুদ এক চোরাই কান্নার সুরই আমার কানে ভেসে এলো।

নীরবতা ভেঙে অশোকই সুরু করে। অশোকের কাছে শুনলাম 'সালফোন' ও 'প্রমিন-এর কথা মিথ্যে নয়। কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসায় আজকাল 'সালফোন-এর ব্যবহার হচ্ছে সর্বত্র। 'প্রমিন' ইনজেক্‌শনে কাজও হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু অশোকের মুখে আরও শুনলাম জয়ন্তী যখন অশোকের হাতে আসে 'সালফোন' ছিল অজ্ঞাত। প্রমিন-ও ছিল মানুষের অগোচরে।

ছাইদানে ভস্মীভূত সিগারেট। খানিকটা মরা ছাই।

দেখা হয়েছিল ম্যালে। অক্সফোর্ড বুক শপ-এ। এটা দেখছিলাম। ওটা নাড়ছিলাম। পড়ছিলামও কোনোটার কয়েক পাতা। এমন সময় পরিচিত কণ্ঠ কানে এলো। জয়ন্তী প্রায় আমার গা ঘেঁষে, কাচের শো কেসের পাশে এসে দাঁড়ালো। ঘর সাজানোর সচিত্র এক কেতাব চেয়ে বসলো। মাথার টুপিটা সামনে নামিয়েও জয়ন্তীকে এড়াতে পারিনি সেদিন।

—সেন সাহেব! আপনি এখানে? জয়ন্তীর অতি পরিচিত কণ্ঠ। থামতে হলো।

অভিনয় ঠিক আমার সেদিন আসেনি। সেই মুহূর্তে কেন যেন আমার স্বাভাবিক অভিনয় কেমন গোলমাল হয়ে গেল। শুধু শুষ্ক হেসে বলি: এদিকেই আমার কাজ। এখানেই আমার হাঁটাচলা। এসেছো কবে? উঠেছো কোথায় এখানে?

জয়ন্তী বলে: উদাসীতেই আছি। ডাঃ মিত্রের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি এখানে। ডাঃ মিত্র ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে এক মিটিং সারছেন। আজই ফিরে যাব উদাসীতে।

অনেক হাতড়ে কথা খুঁজে পেলাম: কেমন আছো?

ডাগর আঁখিতে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। জয়ন্তী বলে: ভালই! কেমন দেখছেন?

মাথার টুপিটা খুলে কাচের শো কেসের ওপর কনুই রেখে বললাম: দেখছি ভালই। তবে আরও অনেক ভালো দেখানো উচিত ছিল। তা'হলে হয়তো আমার অনেক বেশী ভাল লাগতো।

স্থির দৃষ্টি মেলে জয়ন্তী বলে : এ কথা বললেন কেন ?

—বললাম ! তুচ্ছ হেসে হাত উল্টে জবাব ফিরিয়ে দিলাম।

বই আর কেনা হলো না জয়ন্তীর। আমার সঙ্গে পা চালিয়ে এলো দোকান থেকে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে অল্পক্ষণ আগে। আটকে পড়া লোকের চলাচল স্বরু হয়েছে। পথে মানুষের ভীড়। ছাতার যেন মিছিল চলেছে চারদিকে।

আমার পূর্বের কথার খেই ধরে জয়ন্তী আমাকে প্রশ্ন করে : আপনি ওকথা বললেন কেন সেন সাহেব ? আপনি কি যেন বলতে চান মনে হচ্ছে !

কথার জবাব না দিয়ে বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়ালাম। বললাম : ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল এদিকে নয় জয়ন্তী।

জয়ন্তী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

মন আর আমার পূর্বের মত সাড়া দেয় না। সেদিনও আমার আগ্রহ ছিল বহু। কিন্তু আজ দেখলাম জয়ন্তী সম্পর্কে সামান্য রকম কৌতূহলও আমার সম্পূর্ণ মরে গেছে।

—জবাব দিলেন না যে ! জয়ন্তী যেন উষ্মা প্রকাশ করে।

সিগারেট ধরিয়ে আমি হেসেছি সামান্যই।

জয়ন্তী বলে : কতটা ভাল দেখালে আপনার ভাল লাগতো বলতে পারেন ?

জয়ন্তীর কথায় বিদ্রূপ ছিল। তাচ্ছিল্যের আভাষ ছিল। সংযত চরিত্রের মানুষ হিসাবে আমার স্বনাম বহুদিনের। তবু কেন যেন শাসন করতে পারিনে নিজেকে। এক রকম রূঢ়ই শোনালো কথাগুলো।

বললাম : আমি চতুর সন্দেহ নেই। চতুরতা আমার আসেও। আর আমার হিসাবে চাতুরী বড় দোষের নয়। ঐ চাতুর্যটুকু ছিল বলে হয়তো আমার মত সামান্য লোক এই শীতের দেশে দু'মুঠো করে খায়। কিন্তু বিশ্বাস কর জয়ন্তী, কপটতা আমার আসে না। শঠতা আমার জানা নেই। তুমি বলতে চাও আমি নাকি কিছু বলতে চাই। বলার মত কিছু নাকি আমার মনে জমা হয়েছে। হ্যাঁ, আছেই তো। বলার কিছু আছেই তো। কিছুমাত্র মিথ্যে কথা নয়। কিন্তু সে কথা শোনার মত সময় তোমার আজ আর হাতে নেই সেটা অনেক বেশী সত্যি কথা। তোমার হাতে সময় থাকলে আসতে

পার। আজ তোমার সঙ্কোচ হবে জানি, বাধাও প্রচুর মানি। ব'লতে তো আমি অনেক কিছুই চাই। কিন্তু শোনার মত আজ আর তোমার কান কই?

জয়ন্তী আমার কথাগুলো হয়তো গিলতে পারে না। ওষ্ঠাগ্রে এক চাপা অসহিষ্ণুতার ভাব ফুটে ওঠে। তবে তিল মাত্র আভাষ ছিল না চলিষ্ণুতার।

আমি পুর্বের স্বরে বলি: তোমার হাতে সময় থাকলে আসতে পার। পথে আর যাই হোক এ সব কথা ব'লতে পারিনে। তোমার কথা জানিনে, তবে চতুর লোকের অভাব কি দেশে? চতুর চতুর দৃষ্টি তুলে অনেকে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

জয়ন্তী কোনো কথা বলে না। পলকহীন চাউনিতে কয়েক মুহূর্ত আমার চোখেমুখে যেন কিসের অনুসন্ধান করে। তারপর বলে: যাবেন কোথায়? হাতে আমার সময় আছে।

হেসে বললাম: আমার আস্তানার তলায় দাঁড়িয়েই কথা বলছি। ঘোমটা দিয়ে একদিন আমার এখানে খুঁজতে খুঁজতে এসেছিলে, সেদিনের কথা ভুলে গেলে? আমার ঘরে আজও তোমার বসবার মত জায়গা আছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে জয়ন্তী আমার সঙ্গে আসে। রাগ হচ্ছিল, জয়ন্তীর ওপর দয়াও হচ্ছিল মাঝে মাঝে।

তবে কিছুমাত্র ভণিতা করিনি আমি। সোজা ও খাড়াই প্রশ্ন করেছি। এক এক ক'রে সমস্ত কথা সেদিন বলে গেলাম জয়ন্তীকে।

সিস্টার ওয়াংদির কথা। লোসা উৎসবের কথা। সিল্কের ঝালর বসানো 'খাদা'র কথা তুলেছি। 'কোদো'র গল্প করেছি। আমার মিথ্যে রোগী সাজবার কথা স্বীকার করেছি অকপটেই। 'সালফোন' আর 'প্রমিন-এর কথা তুলেছি অবশেষে।

সবার শেষে বলেছি: দেখ জয়ন্তী, আমি দালাল মানুষ। লোকের মতলব আমার নজরে আসে ভালই। কিন্তু মানুষের নরম হৃদয়ের অন্তস্থলে আমার হাত পৌঁছোয় না। আমি শুধু চতুর নই, জীবনটাই আমার কিছুটা ফাঁকির ওপরে চলেছে। অভিনয় আমার পেশা। তবে স্টেজে সেটা আর্ট। নিজের জীবনে কিন্তু সেটি বড় বেশী সুখের নয়। সামান্য অবসর সময়ে, অসতর্ক কোনো মুহূর্তে শক্ত আর আঁটো করে বাঁধা মুখোস খুলে মনের গ্রীনরুমে যখন বিশ্রাম

নিই, তখন তোমাদের কথা ভেবে কষ্ট পাই। আমি অশোকের হ'য়ে ওকালতি করতে বসিনি। এসব জোরের জিনিস নয়। তবে তুমি তাকে ছাই চিনেছো জয়ন্তী, এ দাবী আমি ক'রবোই।

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি জয়ন্তী উঠে দাঁড়িয়েছে। বললাম: অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম তোমাকে। ডাঃ মিত্র হয়তো তোমার খোঁজ করছেন। তোমাকে পৌঁছে দেব আমি?

—পথ আমি একাই চিনে যাব। জয়ন্তী দরজার দিকে পা বাড়ালো।

সিগারেট কেসটি হাতে তুলে নিয়ে তাকিয়ে দেখি ঘর শূন্য। জয়ন্তী নেই। পুবের জানালা দিয়ে হু হু ক'রে কুয়াশা ঢুকছে।

আমার মনের গুমট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে হলো। অল্পক্ষণ পরে পোষাক বদলে নিলাম। নিমন্ত্রণ ছিল অমিয় গোস্বামীর বাড়ীতে। অমিয় বাবুর স্ত্রীর হাতের সুন্দর রান্নার একটি বিশেষ আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সেণ্ট পল্‌সে ওঠার কথা মনে হলেই আমার বুক শুকিয়ে ওঠে।

তবু এড়ানো অসম্ভব। দেখা হলে অমিয়বাবু হয়তো পুরু ঠোঁটে সামান্য একটু হাসি টেনে বলবেন: অলকা কি সব করেছিল সারাদিন ধরে। কিন্তু অলকা দেবীকে বিশ্বাস নেই। কালই হয়তো মনিঅর্ডার এসে হাজির হবে। কুপনে হয়তো লেখা থাকবে: টাকাটা আপনার নয়—ডাণ্ডিওয়ালার। শনিবার ঘটা করেই আসুন। রবিবার সকালে অধঃপাতে পা বাড়ালে আমরা বাধা দেব না। চিংড়ী মাছ মার্কেট স্কোয়ারে আজকাল শুনছি উঠছে বেশ ইত্যাদি।

জলাপাহাড়ের সোজা পথই ধরেছিলাম। এমন সময় বাম দিক থেকে বাঁক নিয়ে একটা অষ্টিন আমাকে ছাড়িয়ে সামান্য কিছু দূরে গিয়ে দেখলাম দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ীর নম্বরটা চেনা চেনা মনে হ'লো। পর মুহূর্তেই গাড়ীর দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালেন ডাঃ মিত্র।

আমার মুখোমুখি পা চালিয়ে এলেন। বললেন: আপনাকে এসময়ে এখানে পাব ভাবতে পারিনি। আপনাকে উদাসীতে এখনই এ গাড়িতে যেতে হবে। জয়ন্তী যেন কেমন ক'রছে।

ডাঃ মিত্রের কথায় বিস্মিত হ'য়ে পড়ি। ডাঃ মিত্র বললেন: বেড়াতে এসেছিলাম সকালে, ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে আমার কিছু কাজও ছিল। বিকেলের দিকে একাই বেরিয়েছিল জয়ন্তী। ঘণ্টা খানেক আগে কোথা থেকে যেন এলো। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে ব'লছে। বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছে অল্পক্ষণেই। আমার আবার হাসপাতালে ফিরে না গেলেই নয়। অনেকটা পথ উদাসী! আপনি আমাদের সঙ্গে একটু আসবেন। আমার বড় উপকার হয়। জয়ন্তী বড় বিব্রত ক'রেছে। মিসেস পালিত নেই, মিঃ পালিতও ফিরে গেছেন। কাইণ্ড্‌লি একবার আসুন আমাদের সঙ্গে।

একবর্ণও মাথায় নিল না। শুধু এটুকু বুঝলাম আমার সঙ্গে দেখা হবার প্রসঙ্গটি জয়ন্তী সম্পূর্ণ চেপে গেছে। কেন চেপে গেছে বুঝলাম না। যে দু'কথা বলেছি তাতে তার মন কিছুটা খারাপ হ'তে পারে হয়তো কিন্তু সামান্য সময়ে জয়ন্তীর শরীরের আবার কি হলো!

শুধু বললাম: হঠাৎ ক'রে শরীর খারাপ—কি হ'য়েছে কি?

ডাঃ মিত্র বলেন: শুনলাম এর আগেও দু'একবার এরকম হ'য়েছে। জানান না দিয়ে হঠাৎ এভাবে পেটে যন্ত্রণা মোটেই ভাল নয়। পেটের বাম দিকে অসহ্য যন্ত্রণা, ঠিক বুঝতে পারছি না। কলিক্ পেইন্ বলে মনে হচ্ছে, তবে না দেখে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

জয়ন্তীকে দেখে অবাক হ'লাম। শাড়ীর আঁচল দাঁতের মধ্যে চেপে ধ'রছে। ঘণ্টা খানেক আগেকার সুন্দর মুখটা কালো হয়ে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ বুঁজে মাথা নত ক'রে আছে জয়ন্তী। জয়ন্তীর পাশে চুপ-চাপ বসে আছে ডাঃ মিত্রের গ্রেহাউণ্ড—লিও। তার চোখেও যেন উদ্‌বেগের ছাপ সুস্পষ্ট।

জলাপাহাড়ে ওঠা হ'লো না। সেণ্টপল্‌স-এ যাওয়া আর হ'লো না সেদিন। সুন্দর ডিনারের কথা মনেও পড়লো না একবার।

ডাঃ মিত্রকে বলি: জয়ন্তীর পাশে আপনি থাকুন। ষ্টিয়ারিং হুইল দিন আমাকে।

চেনা মুখ

ঘুম পর্যন্ত সামান্য ঠায় এসেছিলাম কিন্তু তারপর সারা পথ একরকম উড়িয়েই এলাম। সোয়া ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম উদাসীতে।

দুটি পথ গেছে দুদিকে। ডাঃ মিত্রকে বলি: হাসপাতালে যাব কি ডাঃ মিত্র?

জয়ন্তীর গলা পেলাম পেছন থেকে। কাতর কণ্ঠে বলে: এখন আমি বাড়িতে যাব। অনেকটা সুস্থ লাগছে। অনেক ভাল লাগছে এখন। হাস-পাতাল নয় বাড়িতেই যাব আমি।

ইতস্ততঃ ক'রে ডাঃ মিত্র বলেন: বেশ তো বাড়িতেই চলুন আগে।

জয়ন্তী বাড়ি এলো বটে কিন্তু তার অদ্ভুত ব্যবহারে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। ডাঃ মিত্রের কথা জানি না, কিন্তু জয়ন্তী আমাকে অসহ্য ক'রে তোলে অনেকটা।

জয়ন্তী অস্বাভাবিক রকম বেঁকে ব'সলো। পিসিকে জড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। সুন্দর মুখটা দেখি যন্ত্রণায় তছনছ হ'য়ে গেছে। মুখটা একবার তুলে বলে: সেনসাহেব, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! আপনারা এবার যান। আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

ডাঃ মিত্র বলেন: ঘরে চলো। তোমার ব্যথাটা আমার দেখা দরকার।

জয়ন্তী কেমন যেন হ'য়ে পড়ে। কৃতজ্ঞতার কথা ছেড়ে দিলাম, সামান্য ভদ্রতারও ছাপ ছিল না তার কণ্ঠে। গ্রীবা নেড়ে বলে: আপনারা একটু যাবেন এখন! একা থাকতে দিন আমাকে। আপনারা এখন আসুন সেনসাহেব, ডাক্তারের প্রয়োজন হ'লে আমি ডেকে পাঠাবো। আপনাকে আর কষ্ট দেব না।

আমি কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়ি। বলি: তোমার কি হ'য়েছে বল তো। ডাঃ মিত্রকে একবার দেখাও। রাত্রে একটা কিছু ওষুধ পড়া দরকার। ডাক্তারবাবুর অন্য রোগী আছে। হাসপাতাল ফেলে তিনি কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবেন। এ তুমি ঠিক ক'রছো না।

—আমার চিকিৎসার এখন দরকার নেই। আমার এখন অনেক ভাল লাগছে। আপনারা দয়া করে যান। নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জয়ন্তী ক্লান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে।

ডাঃ মিত্রের কোটের হাতা চেপে ধরে বলি : ব্যাপার কি বলুন তো! জয়ন্তী এরকম ক'রছে কেন ডাঃ মিত্র?

ডাঃ মিত্র আমার সঙ্গে পোর্টিকো পেরিয়ে এলেন। বলেন : লেডি ডাক্তারের প্রয়োজন কিনা বুঝতে পারছি না। পালিত সাহেবকে একটা খবর দেব কিনা ভাবছি। নার্সও আমার খুব কম। একজন ছুটিতে-আর একজন নিজেই রোগী হ'য়ে পড়েছেন। একজন অভিজ্ঞ নার্স—দেখি কি করতে পারি!

ডাঃ মিত্রের সঙ্গে চলেই আসছিলাম। গেটের সামনে ঘুরে দাঁড়ালেন আমাকে সুমুখ ক'রে। বললেন : আপনি বরং থাকুন কিছুক্ষণ। অল্পক্ষণ পর আমি আর একবার আসবো। আপনি থাকলে আমি একটু ভরসা পাই।

ডাঃ মিত্রকে বলি : আমি কি ক'রবো! আমার থাকার কি প্রয়োজন?

সামান্য হাসলেন ডাঃ মিত্র। চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে বললেন : আপনি থাকুন। একেবারে শূন্য বাড়ি······আমি এসে পড়বো ঠিক।

ডাঃ মিত্র চলে গেলে পোর্টিকোতে এসে বসি। নানা চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সামান্য কিছু আগেও কোথায় ছিলাম, হঠাৎ কিসে যেন এসে জড়িয়ে গেলাম।

সিগারেট শেষ ক'রে ফেলি অনেক গুলো। পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখি জয়ন্তীর পিসিমা আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বহুবার এসেছি এখানে। সামান্য কয়েকবার এনার দেখা পেয়েছি। তবে কণ্ঠস্বর আজও আমার কানে আসেনি।

বললাম : কিছু বলবেন?

পিসিমা বলেন : একটু ভেতরে এস। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নাও। ক্ষিদেও পেয়েছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরে আসি। বৃদ্ধা মহিলা আমার হাত চেপে ধরে বলেন : জয়া জানে তুমি এখনও আছো। ভয়ানক ব্যথা ক'রছে এখনও। ডাঃ মিত্রকে হয়তো সে দেখাতে চায় না। তুমি তো বাড়ীর ছেলের মত বাবা। তুমি জানও অনেকখানি। তা আমাদের অশোক ডাক্তার কি দোষ করলে! তাকে একবার ডাকলে হয় না?

অতি দুঃখেও হাসি পায়। বলি : জয়ন্তী ডাঃ মিত্রকে শুধু চলে যেতে বলেছেন, অশোক এলে তাকে দূর করে দেবে।

পিসিমা নিম্ন কণ্ঠে বলেন: তোমরা ভুল ক'রছো বাবা। 'তুমি জান,. আমিও জানি সব। এতকাল ঐ অশোক ডাক্তারই তো মেয়েটাকে নাড়াচাড়া ক'রেছে। সে জয়ার শরীরের ধাত জানে। কি যেন একটা হ'য়েছে ওদের মধ্যে। জয়াকে আমি বলেছি, সে বলে অশোক ডাক্তার আর এ বাড়িতে আসবে না'। তার চিকিৎসা আর সে ক'রবে না। কই দূর ক'রে দেবে—এসব তুমি কি বলছো? অশোক ডাক্তার তোমার বন্ধু। একবার বলবে তাকে?

প্রায় ঠোঁটের কাছ থেকে পেয়ালাটা আমার সশব্দে প্লেটের ওপর ফিরে এলো। টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

জয়ন্তীর বাড়ী থেকে সন্ধ্যেতে আমাকে টেলিফোন ক'রতে দেখে অশোক প্রথমে কেমন অবাক হয়ে যায়। তারপর শুধু বলে: কিছু বুঝতে পারছি না —তবে আমি আসছি। এখনই আসছি আমি।

অল্পক্ষণ পর অশোক উদভ্রান্তের মত এলো। বেহিসাবী এক ঝড়ের মত পোর্টিকোয় এসে আমাকে জড়িয়ে ধ'রলে।

চেয়ারে এনে বসালাম। সমস্ত ঘটনা বলে গেলাম। ম্যাল থেকে। অক্সফোর্ড বুক শপ্ থেকে।

স্তব্ধ হ'য়ে অশোক স্থির দৃষ্টি মেলে আমার কথাগুলো শুনে গেল। কথা শেষ ক'রে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখি সামনের চেয়ার শূন্য। অশোক নেই।

দেহ আমার ক্লান্ত। মন আরও পরিশ্রান্ত। বেতের হেলানো চেয়ারে গা এলিয়ে প'ড়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বাড়ীর সামনের দীর্ঘ সরল গাছগুলোর মাথায় কুয়াশার ভিড়। আকাশে ঘোলাটে চাঁদ। মাতালের চোখের মত। দীপ্তিহীন। নিষ্প্রভ চাঁদ অনেক ওপরে ঝুলছে।

একভাবেই প'ড়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যাচ্ছিলাম। এলোমেলো বহু চিন্তা আমাকে বিব্রত ক'রছিলো অকারণেও।

—জয়ন্তী এখন কেমন আছে সেনসাহেব? ডাঃ মিত্রের গলা পেয়ে সচকিত হলাম।

চোখ তুলে দেখি ডাঃ মিত্র প্রায় আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। কখন যে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়ালই করিনি আমি।

উঠে দাঁড়িয়ে বলি : আপনি এসেছেন, ভালই হ'লো। অশোকও এসেছে কিছুক্ষণ। চলুন, আমরা ভেতরে যাই।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হ'লো। ডাঃ মিত্র আমার কনুই চেপে ধরলেন।

ঘরের আলো সামান্যই। বিছানার এক দিকে কমজোরি এক আলো। অপর প্রান্তে এক জোরালো হিটার রাখা।

জয়ন্তীর বাম হাতটা অশোকের কাঁধ বেষ্টন করে আছে। মাথা নত ক'রে অশোক জয়ন্তীর অন্য হাতটা মুঠিতে নিয়েছে। পাথরের মত স্থির হ'য়ে আছে দুজনে। আমাদের পায়ের শব্দ ওদের কানেই পৌছলো না।

পাশে তাকিয়ে দেখি ডাঃ মিত্র নেই। এক রকম হুড়মুড় করে এগিয়ে এলাম। পোর্টিকো পেরিয়ে প্রায় নেমেই যাচ্ছেন দেখলাম।

ডাঃ মিত্রকে ডেকে বললাম : আপনি চলে এলেন যে ডাক্তার।

অদ্ভুত তাকানো। ডাঃ মিত্রের আশ্চর্য কণ্ঠস্বর : ব্যথাটা মনের। যন্ত্রণাটা হৃদয়ের। আমার কোনো প্রয়োজনই নেই এখানে।

আমি বললাম : আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না ডাক্তার।

অন্ধকারের মধ্যেও ডাঃ মিত্রের বিস্ময়কর চোখের দৃষ্টি আমি ঠিকই দেখতে পেলাম। কয়েক মুহূর্ত অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে ধীরে টেনে টেনে বললেন : আপনি জানেন না কিছু! অবাক করলেন দেখছি।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পোর্টিকো পেরিয়ে নেমে গেলেন ডাঃ মিত্র। গেট পেরিয়ে আরও দূরে চলে গেলেন তারপর।

আমি বিহ্বল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। সত্যিই তো আমি জানিনে কিছুই। কিছুটা মাথায় নিল—তারপর সব ধোঁয়াটে। ব্যথাটা তবে কি? সবটাই কি মিথ্যে? এ ছলনার প্রয়োজনই বা কেন?

ফেরবার পথে অশোকের মুখে শুনলাম সব। ব্যথাটা সত্যি। যন্ত্রণাটা মিথ্যে নয়। তবে ব্যথাটা পেটের বাম দিকে নয়—ডানদিকে। মারাত্মক অ্যাপেণ্ডিক্স্-এর ব্যথা। অবিলম্বেই কাটিয়ে ফেলা দরকার।

বিস্ময়ের সুরে বলি : তবে জয়ন্তী যে ব'লছিলো এতক্ষণ ব্যথাটা তার বামদিকে?

অশোক বলে : জয়ন্তী ভয়ানক ভয় পেয়েছে।

হাত উল্টে বললাম : বুঝলাম না।

অশোক বলে : জয়ন্তীর বড় দোষ নেই। অ্যাপেণ্ডিক্‌স্‌ও তার জন্তে দায়ী নয়। জয়ন্তীর ডানদিকের পেটের কাছে তার পুরনো অসুখের একটা দাগ আজও আছে। অত্যন্ত ভালনারেবল্ স্কিন্—সামান্ত একটা দাগ আজও তার পুরনো দিনের রোগের কথা জানান দিচ্ছে। ডাঃ মিত্রকে তাই সে দেখাতে ভয় পেয়েছে। ব্যথার কথাই গোপন করতে চেয়েছিলো; সেটা সম্ভব হয় নি তাই উল্টোদিকের ব্যথা বলে চালিয়েছে। দাগটা অবশ্য এমন কিছু নয়। অন্য কারো কাছে অন্য কোনো কিছু ব'লেই মনে হবে। তবুও ডাঃ মিত্রকে তার ভয়। মেয়েদের ব্যাপার। কিন্তু সৌরীন অবিলম্বেই যে ওটা কাটিয়ে ফেলা দরকার তার কি ?

হাসপাতালে ভরতি করার কথা তুলতেই অশোক আমাকে বাধা দিয়ে বলে : ডাঃ মিত্র ভাল সার্জেন নিঃসন্দেহে। হাসপাতালে ব্যবস্থাও প্রচুর। কিন্তু আমাকে কি বিপদে ফেল্লে বলতো। অবশ্য জানতে হ'য়েছে সবই। তবে কাটাছেঁড়া আমি তো বড় করি না। ডাঃ মিত্রের চোখ এড়িয়ে অপারেশন্ করাও সম্ভব নয়। অথচ দু' একদিনের মধ্যে ওটা কাটিয়ে ফেলা দরকার। মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে তাহ'লে। হাসপাতাল ছেড়ে অন্যত্র যাওয়াও সম্ভব নয়।

আমি বললাম : দাগটা আছে কেন ? জয়ন্তী নাকি সম্পূর্ণ ভাল হ'য়ে গেছে বলেছিলে ?

সামান্য হেসে অশোক বলে : ভাল হ'য়ে গেছে তো বটেই। ও দাগটাও কিছুমাত্র দোষের নয়। জয়ন্তীর একটু এলার্জির ধাত। কিছু দিন পরই মিলিয়ে যাবে। জয়ন্তী মিথ্যে ভয় পেয়েছে।

সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এলাম। কালিম্পং-এর ডাঃ নিয়োগীর কথা মনে হ'লো।

বললাম : দেখ অশোক, ডাঃ নিয়োগীকে তুমি হয়তো জান না, আমার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এক ডাক্তার। ওনার ওখানে অপারেশনের ব্যবস্থাও আছে ভাল। ডাঃ নিয়োগীকে ব'লে আমি এখনই ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।

রবিবার তো তোমার অফ-ডে? পরশু তোমার রবিবার পড়ছে। জয়ন্তীকে কাল আমি কালিম্পং নিয়ে যাই। নিয়োগীর ওখানে নিয়ে রাখি। পরশু এস। গোপনেই তো একাজ মিটে যেতে পারে স্বচ্ছন্দে।

অন্ধকার রাস্তাতে অশোক আমার হাত চেপে ধরে বলে: কালিম্পং? মন্দ কি—বড় দূরের পথ নয়। রবিবার আমার ছুটিই আছে সারাদিন। কিন্তু ডাঃ নিয়োগীর ওখানে কি এই অপারেশন করা যাবে? ওনার যন্ত্রপাতি সব আছে তো?

অশোকের কাঁধে মৃদু করাঘাত ক'রে বলি: সে ভাবনা আমার।

অশোক বলে: সেই ব্যবস্থাই কর। পা চালিয়ে এস। দুটো গিলে হাসপাতালে ছুটতে হবে। সিষ্টার ছায়া বিশ্বাস খুব অসুস্থ। রাত্রি জাগা আছে আজ কপালে।

পরদিনের নাটকে আমি ছিলাম দুরন্ত অভিনেতা। সামান্য সন্দেহও আমি রেখে যেতে চাইলাম না। ডাঃ মিত্রকে আমি ফোন করে বলি: আজই যাচ্ছি কলকাতায়। পালিত সাহেবের ওখানে জয়ন্তী তাকে পৌঁছে দিতে ব'লছে। ওর শরীরের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি। আপনার মত কি?

জবাব এলো না। অপরপ্রান্ত থেকে সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখার যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এলো।

দুপুরের দিকে জয়ন্তীকে নিয়ে উদাসী ছেড়ে গেলাম। অশোকের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে এলাম।

শিবক্ ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়িটা যখন ছুটে চলেছে, জয়ন্তীকে হেসে বললাম: আচ্ছা জয়ন্তী, ঘটা ক'রে ছলনা তো তুমি কম করলে না। ডাঃ মিত্র কি তোমার অসুখের কথা জানেন না?

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গ্রীবা বেঁকিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে জয়ন্তী বলে: নাতো! তিনি জানবেন কেমন ক'রে?

হেসে বললাম: তবে সালফোন আর প্রমিনের খবর পেলে কোথায়? তোমার মাথায় ওসব ঢকিয়েছিল কে?

জয়ন্তী যেন ভরসা পায় আমার কথায়। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলে: ডাঃ মিত্রের বাড়িতেই অবশ্য এ সংবাদ আমি জানতে পারি। ডাঃ মিত্রের ঠোঁট থেকে নয়—মেডিক্যাল জার্নালে এই খবর আমি পড়েছিলাম। কিন্তু সেন সাহেব, একথা আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—এমনিই জানতে ইচ্ছে ক'রলো তাই বললাম। নিতান্ত স্বাভাবিক স্বরেই কথাগুলো বললাম।

শুষ্ক হেসে জয়ন্তী বলে: এমনি এমনি আপনি আর আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না।

অন্য প্রসঙ্গ তুলেছি। বলেছি: ব্যথাটা আজ কেমন?

সুন্দর হেসে জবাব দিয়েছে জয়ন্তী: একদম নেই।

গল্পে গল্পে সারা পথ জয়ন্তী বেশ ভালই এলো। কিন্তু কালিম্পং এসে সন্ধ্যের পর থেকেই তার ব্যথাটা আবার সুরু হ'লো। অশোকের নির্দেশ মত দু' একটা ট্যাবলেটে কিছু মাত্র কাজ হলো না দেখলাম।

জয়ন্তীকে বললাম: একটা রাত। কাল সকালেই অশোক এসে প'ড়বে। কিছুটা ধৈর্য ধর।

—আপনার ঋণ জীবনেও শোধ ক'রতে পারবো না সেনসাহেব। দেবতার কথা জানিনে কিন্তু আপনি মানুষ নন! আপনি একটা কি! রুদ্ধ কণ্ঠে জয়ন্তী ব্যথায় ভেঙ্গে প'ড়লো বিছানার মধ্যে।

হেসে বললাম: আর যাই হই ডাক্তার নই জয়ন্তী। তোমার কোন উপকারেই আমি লাগতে পারি না।

ব্যথাটা রইলো। যন্ত্রণাটা একভাবে লেগে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর কিছুটা কমে আসায় আশ্বস্ত হ'লাম। কিন্তু নেহাৎই সে সাময়িক। ঘড়িতে তখন প্রায় বারোটা, যন্ত্রণা আবার এক রকম অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

একবার উঠে ব'সছে। পেটের মধ্যে বালিশ গুঁজে যন্ত্রণায় বিছানার মধ্যে কুঁকড়ে যাচ্ছে কখনও। অতিশয় কাতর হয়ে পড়ে জয়ন্তী। পাগলের মত যন্ত্রণায় ছটফট ক'রতে সুরু ক'রলে।

ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলাম না। ভয় পেলাম। উদাসীর হাসপাতালে ফোন করলাম অশোককে।

অশোকের গলা পেলাম : খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। আচ্ছা আমি আসছি। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমি এসে যাব। জয়ন্তীকে তুমি ভরসা দাও। সব ব্যবস্থা তৈরী রাখো।

জানালাম : আমি প্রস্তুত। তুমি এস।

প্রবল উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে অশোক এলো গভীর রাত্রে। অস্ত্রোপচারে কি পরিমান সময় লেগেছিলো আমি সঠিক মনে ক'রতে পারি না কিন্তু সিগারেটের পুরো টিন প্রায় শূন্য ক'রে এনেছিলাম সে রাত্রে। ডাঃ নিয়োগী যে ভাবে সাহায্য করেছেন তার তুলনা নেই।

রবিবার। ছুটীর দিন। অশোককে কিন্তু উদাসীতে ফিরে যেতে হলো। ব'ললে : তোমার ফোন পাবার পর মাথার ঠিক ছিল না আমার। ডাঃ মিত্রকে ফোনে পেলাম না। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হয়তো। কাউকে কিছু না বলেই পালিয়ে এসেছি। সিস্টার বিশ্বাসের অবস্থা খুব খারাপ। একটা মর্ফিয়া দিয়ে চলে এসেছি। তুমি রইলে, ডাঃ নিয়োগী থাকলেন। হাসপাতালে আমাকে ফিরে যেতে হবেই।

তারপরের কাহিনী ছেঁড়াছেঁড়া। অস্বাভাবিক রকম গুমট। কুয়াশায় ঢাকা ঘুম স্টেশনের মত ধোঁয়াটে। অনেকের মুখে শোনা বিক্ষিপ্ত সব ঘটনা। তার কিছুটা সত্যি, অনেকটা তার অসম্ভব। যোগফল আমার কাছে দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ রহস্যময়।

অশোক হাসপাতালে ফিরে যেতেই নানা প্রশ্নের সামনে তাকে পড়তে হয়। ডাঃ মিত্র শুধু নন, হাসপাতালের অন্যান্য লোকেরাই নয় শুধু। রুদ্ধকক্ষে ডি. এস. পি'র নানা প্রশ্নের সামনে পড়তে হয় অশোককে।

বহু প্রশ্নের শুধু একটি উত্তর দিয়েছে অশোক : নিতান্ত প্রয়োজনে রাত্রে আমাকে বাইরে যেতে হয়। কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম সে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।

রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন পুলিশ অফিসার কিছুটা পরে। পীড়িতা নার্স ছায়া বিশ্বাসকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবার অপরাধে অশোককেই তিনি অভিযুক্ত করেন। সিস্টার বিশ্বাসের কেবিনের ভার ছিলো সিস্টার ওয়াংদির হাতে। গভীর রাত্রে কিছুক্ষণের জন্যে তিনিও উধাও হয়ে যান রোগীর কেবিন

থেকে। সিস্টার ওয়াংদিকে অশোকের বাড়িতে সে রাত্রে সেই সময় পাওয়া গেছে।

বজ্রাহত অশোক বলেছে : ছায়া বিশ্বাসকে ইনজেকশন সে একটা দিয়েছে ঠিকই, তবে সে বিষ নয়—মর্ফিয়া। আর সিস্টার ওয়াংদিকে সে ছায়া বিশ্বাসের ঘরেই শেষ পর্যন্ত দেখেছে। তার ঘরে সে রাত্রে যাবে কেন? তার ঘরে তো সে ডাকেনি সিস্টার ওয়াংদিকে।

আরও কিছু ব'লতে যাচ্ছিল অশোক। বাধা পেলো। পুলিশ অফিসারের কথায় নয়—সিস্টার ওয়াংদির রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে।

সিস্টার ওয়াংদি বলে : গত রাত্রে অশোকের জরুরী ফোন পেয়ে সে তার ঘরে যায়। কিন্তু অশোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় নি। তার কথা মিথ্যে নয়। সাক্ষী আছে।

অশোকের বৃদ্ধ নেপালী চাকর জানায় : সিস্টারের কথা সত্যি, ডাক্তার সাহেবের খোঁজে সেএসেছিলো তবে ডাক্তারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হ'য়েছে কিনা সে কথা সে সঠিক ব'লতে পারে না। কারণ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সিস্টার ওয়াংদিকে সে যখন দেখতে পায় তখন অবশ্য ডাক্তারকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

ডাঃ মিত্র হো হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন শেষ পর্যন্ত।

পুলিশ অফিসার বলেন : **I have met so many Criminals in my life but I have never seen such clever fool before.**

টুকরো টুকরো শোনা কথা সাজালে দাঁড়ায় সিস্টার ছায়া বিশ্বাস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ঘটনার দিন দশেক আগে। অশোকের সঙ্গে সিস্টার বিশ্বাসের অবৈধ সম্পর্ক ছিলো নাকি বহুদিনের। আরও জানা গেছে তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। সিস্টার ওয়াংদির সঙ্গে অশোকের ভাব জমে উঠেছিলো ইদানীং। সিস্টার বিশ্বাসকে সে এড়িয়ে চলেছে কিছুদিন। তারপর সিস্টার বিশ্বাসের অসুস্থ হ'য়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া। অশোক তার সুযোগ নিয়েছে নির্মম ভাবে। ইনজেকৃশন দিয়ে অশোক বাড়ি যায়। সিস্টার ওয়াংদি অবশ্য স্বীকার করেন অশোককে অতি মাত্রায় সন্দেহজনক মনে

হ'য়েছে। রাত্রে সামান্য একটা ইনজেকশন দিতে যেন ঘেমে উঠেছিলো। ভয়ানক তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অশোক।

অল্পক্ষণ পরেই ফোন আসে। অশোক ডাক্তার জরুরী কাজে তাকে ডেকে পাঠায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। নার্স ও ডাক্তারের সম্পর্ক ছিলো তাদের। অন্য কোন রকম সম্পর্কের কথা সিস্টার ওয়াংদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ফোন পেয়ে সে যায়। অশোকের কোয়ার্টার সে খোলা অবস্থায় পায়। ভিতরে আলো জ্বালা ছিলো। কিন্তু অশোক ডাক্তারের সাক্ষাৎ মেলেনি। দেখা হ'য়েছে নেপালী ভৃত্যের সঙ্গে। হাসপাতালে ফিরে এসেও অশোক ডাক্তারের কোনো সন্ধান সে পায়নি। সিস্টার ছায়া বিশ্বাসকে তারপর সে মৃত অবস্থায় দেখে। ডাঃ মিত্রকে সে তখন ফোন করে।

সেইদিনই অশোক আর মিস ওয়াংদিকে চালান করা হলো সদরে। মৃতদেহও আসছিলো পেছনের ভ্যানে।

জায়গা ছিলো কার্শিয়াং-এর কাছাকাছি। সবই ঠিক চলছিলো। শুধু গোল বাঁধিয়েছিলো ডি. এইচ. আর। লাইনচ্যুত হয়ে ট্রেন পিচ রাস্তা আটক ক'রেছিলো। বড় বড় শাল কাঠের চাপে ইঞ্জিনটা আবার লাইনে আনার চেষ্টা চ'লেছে। পথে নেমেছে বহুলোক। হৈ চৈ চলেছে চারদিকে।

এমন সময় কোথা দিয়ে কি হ'য়ে যায়। অসম্ভব কি ভাবে সম্ভব হয়, সে রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

অশোক নাকি জিপ্ থেকে পালায়। বহু লোকের ভিড়ে সে আত্মগোপন ক'রে, দুরন্ত পাহাড়ী পথে সে উধাও হ'য়ে যায়।

ইঞ্জিন লাইনে তোলা হ'লো বটে কিন্তু ট্রেন আটকে রাখা হয় অনেকক্ষণ। কিন্তু অশোকের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। আসামীর কোনো হদিশই পাওয়া গেল না।

আমার কথা থাক। জয়ন্তীর কথা আর নাই বা বললাম। কলকাতায় ফিরে গেল জয়ন্তী। ডাঃ নিয়োগী বলেন: আমার কোন ক্ষতি হবে না তো সেনসাহেব।

সমস্ত কিছু ভুলে যেতে চাইলাম। জয়ন্তী বলেছে, সব মিথ্যে, গভীর ষড়যন্ত্র। আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারিনি।

উদাসী দাঁড়ায় আর যাইনি। তবে ট্রেনে করে বা মোটরে উদাসীর বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছি বহুবার। নামতে ইচ্ছে হয়নি। ডাঃ মিত্রের কি বলার আছে শুনতে ইচ্ছে করেনি।

বাঁকের মুখেই অশোকের সেই কোয়ার্টার। অন্যদিকে সুবিমল পালিতের বাংলো। পোর্টিকোটা দেখলে অনেক কথাই মনে পড়ে। সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে অন্ধকার রাত্রে ডাঃ মিত্রের সেই আসা। নীচু পর্দায় টেনে টেনে অদ্ভুত গলায় বলে যাওয়া: আপনি জানেন না কিছু। অবাক করলেন দেখছি।

অনেকটা লুপ নিয়ে গোটা মালভূমিকে আবর্তন করে ট্রেনটি যখন ওপরে উঠে যায়, উদাসীর হাসপাতাল নজরে আসে অনেকটা। অল্পক্ষণের জন্যে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। নেপালী বালকের মুঠো মুঠো বালির সঙ্গে ইস্পাতের লাইনে ঘষ খাওয়া ইঞ্জিনের চাকার যান্ত্রিক আর্তনাদ সারা চরাচরের কঠিন পাষাণে ধাক্কা খেয়ে আমার কানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। একটানা যেন বলে চলেছে ডি. এইচ. আর: মিথ্যে, মিথ্যে—সবই মিথ্যে! মিথ্যে, মিথ্যে—সবই মিথ্যে!!

মাস ছয়েক পরের কথা। তুং সুং বস্তিতে গিয়েছিলাম কাজে। ফেরবার পথে ম্যালে দেখতে পেলাম। এমন জায়গায় এভাবে দেখবো আশা করিনি। প্রথমটা চোখের ভুল মনে করেছিলাম। সিস্টার ওয়াংদিকে দেখে অবাক হ'লাম।

ঘোড়ার পিঠে এক অল্পবয়সী টুকটুকে ছেলে। শ্বেতাঙ্গ এক বালক বলেই মনে হলো। ঘোড়ার ক্ষুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সিস্টার ওয়াংদি উর্দ্ধশ্বাসে আমাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে গেল। এক হাতে তার ঘোড়ার লাগাম ধরা, আর এক হাত শূন্যে তোলা।

সিস্টার ওয়াংদির মত ছুটতে ছুটতে নয়, তবে বেশ পা চালিয়ে এলাম। ম্যাল রোডের মুখে সিস্টার ওয়াংদিকে দেখি এক রাশ ঘাস নিয়ে ঘোড়াকে খাওয়াতে ব্যস্ত। টুকটুকে ছেলেটির হাত ধরে এক সুন্দরী মহিলা। ঘোড়দৌড়ের দাম গুনে দিচ্ছেন সিস্টার ওয়াংদিকে।

আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলো। সুন্দর টসটসে মুখটিতে বিষণ্ণ রেখা ভেঙ্গে পড়ে। পরিশ্রান্ত শরীরটি তখনও উঠছে-পড়ছে। মলিন ছিন্ন পশমের আঁটো পোষাক ভেদ করেও ওর পরিপুষ্ট যৌবন প্রকাশ হয়ে পড়েছে অনেকটা।

কয়েক মুহূর্ত। তারপর যেন কিছুটা স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। একটুকরো ম্লান হেসে বলে : নমস্কার! এখনও আপনি দার্জিলিংয়ে। আমার খোঁজ পেলেন কোথায়?

শুষ্ক হেসে বলি : তুমি কবে এসেছো? তুমি আজ ঘোড়া টানছো কেন? তোমার একি অবস্থা। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছো কবে?

সিস্টার ওয়াংদি কোমরে হাত দিয়ে অদ্ভুত শুকনো চোখে হেসে বলে : কপাল! সবই আমার অদৃষ্ট সেনসাহেব। আমি অপরাধী। আমি আজ সমাজ থেকে পতিতা। আপনারা বড় মানুষ। আমার খবরে আর আপনার প্রয়োজন কি?

এ কথা সেকথাব পর সিস্টার ওযাংদিব মুখে শুনলাম তিন সপ্তাহ আগে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু পূর্বের জীবনে আর সে ফিরে যেতে পারেনি। হাসপাতালেব নার্সের কাজ আর সে পেতে পারে না। তার সার্টিফিকেটের আর কোন মূল্যই নেই। বাড়ির লোক তার ওপর বিরূপ। পতিতা আখ্যা দিয়ে দূব করে দিয়েছে তাবা। পরিচিত সবাই পায়ে ঠেলেছে নির্মম ভাবে। তাই নতুন বৃত্তি গ্রহণ করেছে। ঘোড়ার সঙ্গে ম্যালের ওপরে ছুটতে হয়। মালিকের হাতে অর্দ্ধেক টাকা তুলে দিয়ে বাকী অর্দ্ধেক নিয়ে সন্ধ্যেতে নিচের ভুটিয়া-বস্তিতে ফিরে যায়। কুখ্যাত অঞ্চলের অল্প পরিসর একটি ছোট ঘরের শূন্য জীবনই মেনে নিয়েছে সিস্টার ওয়াংদি।

কথা বলতে বলতে গলা কেমন আর্দ্র হয়ে ওঠে সিস্টার ওয়াংদির। পরিশ্রান্ত সুন্দর মুখশ্রীতে কিছুমাত্র কালিমা চোখে পড়ে না। অলস অশ্রুপূর্ণ ছলছলে চোখ দুটিতে তিলমাত্র কলুষেব আভাষ নেই।

আমি কিন্তু ভুল চিনিনি সিস্টার ওয়াংদিকে। গভীর রাত্রে যে নারী অবৈধ প্রেমের বেসাতি খোঁজে, বিষাক্ত বিষের ষড়যন্ত্র করে, কারাগারে যায়; তারপর সমাজ আর সংসার থেকে পায়ে ঠেলা হয়ে এসে পড়ে পথের ধূলোতে, সে কি ম্যালের ওপর ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়োয়? ম্যালের আবর্ত্তে আবর্ত্তে

ঘোড়ার মুখের গাঁজ আর নিজের ঠোঁটের ফেণা একাকার করে দেয় ছমুঠো মকাই-এর পরিবর্তে? প্রবল শীতেও কি সিস্টার ওয়াংদির মত তারা ঘামে? ছিন্ন বসনে অফুরন্ত যৌবন কি এভাবে তারা ঢাকে?

ঢাকে না। পথের ধূলো ঝেড়ে তারা উঠে আসে। অনিবার্য ভবিষ্যত তারা বেছে নেয় ঠিকই। বামন্-বস্তির হাতছানি তারা ঠিক চিনে আসে।

খুপরী খুপরী ঘরের পাশে শূন্য আর একটি ঘরে তারা ঠিক চিনে আসে। সন্ধ্যের পর স্যুট পরা জানোয়ারের সঙ্গে তাদের সুরু হয় অন্ধকারের অদ্ভুত ঘোড়দৌড়। তবে ঠোঁটে. তাদের ফেণা ওঠে না। তোংবার ফেণাই তাদের ঠোঁটে উঠে আসে! চোখে তাদের বিষণ্ন হাসি নেমে আসে না। খিল খিল করা ঝিলিক মারা হাসির সঙ্গে তাল রেখে অন্ধকারে কুকরী নেচে ওঠে সেখানে। কোদো আর শীতল ছ্যাংয়ের সঙ্গে উষ্ণ শোণিতের ঢেউ খেলতে থাকে কখনও কখনও।

সিষ্টার ওয়াংদি অশোকের কথা জানতে চায়। কথায় কথায় সে ভয়ঙ্কর রাত্রের কথাও ওঠে।

ধীরে ধীরে বর্ণনা করলে সিষ্টার ওয়াংদি—

রাত তখন গভীর। বিছানায় ছটফট করছিলো সিস্টার বিশ্বাস। এমন সময় অশোক এলো কেবিনে। হাতে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ। মর্ফিয়া কি না ওয়াংদি জানতে চায়। জবাব দেয়নি অশোক। ভয়ানক তাড়াহুড়ো করছিলো। ঘড়ি দেখছিলো মুহুর্মুহুঃ। বিনা বাক্যব্যয়ে কেবিন ছেড়ে চলে যায়। অল্পক্ষণ পর একটা ফোন আসে। অশোক বাড়িতে ডেকে পাঠায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

সিস্টার ওয়াংদির কাছে নতুন কোনো সংবাদ পেলাম না। এ কথা অনেকের মুখে বহুবার শুনেছি।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম বাধা দিয়ে সিস্টার ওয়াংদি বলে: কিন্তু আমার অশোক ডাক্তারের ওপর ঠিক সন্দেহ হয় না এখনও। সবটাই কেমন ধোঁয়াটে সেনসাহেব। সিস্টার বিশ্বাসের সঙ্গে ডাঃ মিত্রের খুব ভাব ছিলো। রাত্রে তার কোয়ার্টারে আনাগোনা করতো হামেশাই। ডাক্তারের সঙ্গে নার্সের সম্পর্ক আর যাই হোক সিল্কের শাড়ী দেওয়া-নেওয়ার নয়! ডাঃ মিত্রকে

আপনারা কি মনে করেন জানি না, তিনি আমাকেও একদিন হাসপাতালে তাঁর ঘরে আমার হাত চেপে ধরেছিলেন। আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। সেই থেকেই আমার ওপর রাগ। তাড়িয়েই দিতেন কিন্তু আপনাদের ভয়ে, জানাজানি হবার আশঙ্কায় আমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করতে হয়তো ভয় পেয়েছেন। গল ব্লাডারের পীড়ায় সিস্টার বিশ্বাস কষ্ট পাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু ডাঃ মিত্রের হাবভাবে মনে হচ্ছিল অন্য কোনো কিছুর চিকিৎসাও চলছিলো সেই সঙ্গে। আর একটা জিনিষ আমার কাছে আজও পরিষ্কার হলো না সেনসাহেব। ফোনটা যখন এলো, করিডোরে আমি প্রথমে ধরি। অপরপ্রান্ত থেকে গলা পাইনি প্রথমে। শুধু একটানা কুকুরের ডাক কানে আসছিলো। আমি শুধু বলি : হ্যালো! হ্যালো!! অপরপ্রান্ত থেকে শুধু একবার স্পষ্ট শুনলাম—'সাট আপ লিও'। পরক্ষণেই কুকুরের ডাক বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপর গলা পেলাম। আমাকে বিশেষ কাজে অশোক তার কোয়ার্টারে ডেকে পাঠালে! আমি সিস্টার বিশ্বাসের পাশে আছি তিনি ভাল করেই জানেন, তাছাড়া বিনা কারণে তার কোয়ার্টারে ডেকে পাঠানোর মানুষ তিনি নন। আমার সামান্য রকম সন্দেহ হয় নি। বাড়ীতে গিয়ে দেখি অশোক ডাক্তার নেই। ফিরে এলাম কিন্তু হাসপাতালে কোনো পাত্তা পেলাম না তার। ডাঃ অশোকের পালানোতে আমার মাথা কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল। সব কিছুই ধোঁয়াটে লাগতে লাগলো। তারপর দিন তার ফিরে আসাটাও কেমন গোলমেলে লাগলো। বারো ঘণ্টার হিসেব না দেওয়া, গভীর রাত্রে হাসপাতাল থেকে পালানোর কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না। তারপর জিপ থেকে তার পালানোতে আমি আর অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। কিন্তু অশোক ডাক্তার নেপালী জানে ভাল, সে আমার সঙ্গে নেপালীতেই কথা বলে। ফোনে ইংরেজী বল্লে কেন? আচ্ছা সেনসাহেব, ডাঃ মিত্রের একটা কুকুর আছে জানেন। তার নাম আমি জানি—লিও! আপনার কিছু মনে পড়ে?

সেইদিনই আমি কলকাতা রওনা হ'য়ে যাই। জয়ন্তীকে সব বললাম। সে আমাকে টানতে টানতে কাঁদতে কাঁদতে নিয়ে চললো।

প্রবীণ আইনজীবি কিন্তু ফিরিয়েই দিলেন আমাদের। বললেন: মরা কেস! সে বীরপুরুষ পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে গেল কেন? আপনাদের হাতে আছে শুধু বছর খানেক আগেকার নার্সের কানে শোনা ফোনের কথা—'সাট আপ লিও'! তার এখন ওকথা বলারই বা কি মূল্য আছে? তাছাড়া সে নিজেও তো এ কেসে ছিলো! আসামী এখনও পলাতক, আপনাদের এসব বুদ্ধি দিল কে? কে কেস করবে? সে তো পালিয়েছে! নার্ভাস ব্রেক ডাউন থেকে অবশ্য এ রকমই হয়। মূলার্ড সাহেব একবার কেস করেছিলেন এই রকম। তবে এদেশে নয় শিকাগোতে। ক্রিমিন্যাল ল-এ বলে, আমাদের পেণাল কোডেও পাবেন। এই ধরুন……!

ক্রিমিন্যাল ল বুঝিনি! পেণাল কোড-এর ব্যাখ্যা এক বর্ণ মাথায় নেয়নি।

জয়ন্তীর চিঠিতে সুবিমলবাবুর মৃত্যু সংবাদ আমার হাতে এলো কিছুদিন পর। হাইকোর্টের এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাবার পথে বারান্দাতেই তিনি ঢলে পড়েন। বার লাইব্রেরীতে ধরাধরি ক'রে আনা হয়। ঘরের জমাট চুরুটের গন্ধ এক হাত তুলে সরাতে চেষ্টা করেছিলেন শুধু। কথা বলতে পারেননি। খবর পেঁৗছে ছিলো ঠিকই। কিন্তু ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল না।

শীতের শুরুতে আমার কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। কলকাতায় আবার ফিরে এলাম।

জয়ন্তী একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির। পরণে লাল পেড়ে সাদা তাঁতের শাড়ী। পায়ে পাতলা ফু-ফালি চটি। গেরুয়া রঙের পুরো হাতা ব্লাউজ। ঠোঁটের কোনে অফুরন্ত খুশীর আভাস।

জয়ন্তী বলে: অনেকগুলো টাকা হাতে এসেছে। সৎকাজে ব্যয় করতে চাই।

বললাম: বেশতো বিলেত যাও। সৎকাজে ব্যয় করবার মত হোটেল রেস্তরাঁ ওদেশে নাকি আছে বিস্তর। ব্যয় করবার মত সৎকাজের অভাব কি?

জয়ন্তী বলে : রসিকতা রাখুন। পরিহাসের সময় নয় এখন। আমি যে কাজে হাত দিতে চাই আপনি পাশে না থাকলে ভরসা পাইনে। সাহস পাইনে মোটেই।

আমি কিন্তু রসিকতাই করছিলাম। দায়িত্বহীন বাজে কথাই বলছিলাম। জয়ন্তীর ভাব দেখে থামতে হলো। কথার ঢঙ, গলার স্বর কিছুটা অন্য রকম।

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম : কি কাজের কথা বলছো তুমি ?

জবাব দিয়েছে জয়ন্তী অনেকক্ষণ ধরে। জয়ন্তীর সৎকাজের পরিকল্পনা শুনে আমি থ হয়ে গেলাম। জয়ন্তী হাসপাতাল খুলতে চায়। সে যে রাজসিক ব্যাপার।

ইচ্ছা নয়, অভিলাষই নয় শুধু। জয়ন্তী দেখলাম এগিয়েছে অনেকদূর। কাগজপত্তর দেখালে। কেউ কেউ মোটা টাকা সাহায্য করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কাগজে পত্তর-এ জয়ন্তী অনেক কিছুই করেছে।

অনেক রাত পর্যন্ত জয়ন্তী সেদিন আমার বাড়িতে বসে নানা আলোচনা করলে। নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। জয়ন্তীর দৃঢ়তা আমাকে স্পর্শ করে। জয়ন্তী চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

তারপর জয়ন্তীকে দেখেছি অন্য চেহারায়। কলকাতায় বসে চেক-কাটা, এঞ্জিনীয়ারকে ধমকানো, চৌরঙ্গীর কোনো হোটেলে মিটিং ডেকে কাগজে হুলস্থুল বাধিয়ে দেবার চেষ্টাই করলে না জয়ন্তী।

অতি উৎসাহী একজনের কথায় কিছুটা উষ্মাই সে প্রকাশ করে। জয়ন্তী বলে : আমি ধর্মশালা খুলতে বসিনি! মন্দির বা মসজিদ তুলে ইনকাম ট্যাক্সের ঘরে খরচ দেখিয়ে দেবার কোনো মতলবও নেই আমার। আমি কাজ করতে চাই। পাপ করিনি, পুণ্য সঞ্চয়ে কিছুমাত্র আমার আগ্রহ নেই।

হাসপাতালের জায়গা পেতে সামান্য দেরী হলো। জঙ্গলা উঁচুনীচু পাহাড়ী জায়গা। পাথর কেটে কেটে 'রিবেটমেণ্ট্ ওয়াল' দিতেও সময় লাগলো বেশ। হাসপাতাল গড়ে উঠলো তারপর। কুষ্ঠাশ্রমের উদ্‌বোধন হ'লো নীরবেই। দিনটি বড় সুন্দর ছিল সেদিন। তিলমাত্র কুয়াশা ছিল না আকাশে।

পাহাড়ের গায়ে চঞ্চল ঝরনাধারা দেখছিলাম সেদিন। জয়ন্তী আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ঠোঁটে সামান্য হাসি টেনে ব'ললে: ঝরনাটার আপনি নাম জানেন সেনসাহেব?

বললেন: না!

জয়ন্তী বলে: রঞ্চিমায়া!

জয়ন্তীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি: অর্থটি কি দাঁড়ালো?

ম্লান এক টুকরো হেসে জয়ন্তী বলে: কথাটা নেপালী। আমাদের কথায় তর্জমা ক'রে বলা যেতে পারে—'কান্নায় প্রেম' বা কাঁদতে যে ভালবাসে। এই ঝরনার জন্যেই জায়গাটা আমার আরও ভাল লেগেছে। এই খরস্রোতা ঝরনাটির মধ্যে থেকে শুধু কিন্তু কান্নাই আমি শুনতে পাইনে, হাসিও আমি দেখতে পাই! কুয়াশার বিষন্নতার মধ্যে থেকে সূর্য্যের আলোতে ঝলমল করা খুশীর হাসিও আমি লক্ষ্য ক'রেছি বহুবার। তা না হলে বাঁচবো কি নিয়ে বলতে পারেন সেন সাহেব? It is an endless ocean of my hope and despair. Neverending falls of my tears and laughter.

সামান্য কথায় জয়ন্তী কেমন ভাবপ্রবণ হ'য়ে পড়ে। বুঝতে পারি রঞ্চিমায়ার অবিশ্রান্ত বর্ষনের মত ওর অন্তরের মর্মস্থলে অফুরন্ত শোকাশ্রু অবিরাম প্রবহমান। সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের শূন্যতা আজ হাসপাতাল খুলে কাজের মধ্যে দিয়ে ভরিয়ে তুলতে চায় জয়ন্তী।

প্রেম মানুষের পূর্ণতা আনে। ভালবাসাই জীবনে মুখরতা আনে। কিন্তু জয়ন্তীর জীবনে শূন্যতাই এনেছে শুধু! নীরবতা এনেছে অনেক ক'রে।

ভুটিয়া-বস্তির অন্ধকার এক ঘর থেকে সিস্টার ওয়াংদিকে আমি জয়ন্তীর কাছে ধরে নিয়ে এলাম একদিন।

সিস্টার ওয়াংদি বলে: আমি তো নার্সের কাজ নিতে পারি না। আমি আজ আর সিস্টার নই সেনসাহেব।

জবাবে জয়ন্তী বলেছে: নার্সের আমার প্রয়োজন নেই। সিস্টার আমার আছে। কিন্তু দেখা শোনা করার মত লোক চাই। আপনি আমার এখানে থাকুন।

এক টুকরো ম্লান হেসে সিস্টার ওয়াংদি আপন মনেই বলে চলে : ম তো আবো নার্স হোই ন। নার্সি কো নোকরী ম তো লিন্নু সক্‌দেই ন।

সময় আর সময়। দীর্ঘকাল পার হয়ে গেছে তারপর। জয়ন্তী ডাকলে বহু কাজ ফেলে আসি আমি মাঝে মাঝে। অশোকের কথা তুলতে ভয় পেয়েছি। তবে আমি লক্ষ্য করেছি জয়ন্তী বিশ্বাস করে অশোক নিশ্চয় একদিন ফিরে আসবেই। অশোককে সে ফিরে পাবেই।

কোনো কিছুর আওয়াজে আমার সম্বিত ফিরে আসে। চোখ তুলে দেখি মালভূমিটাকে ওরা পেরিয়ে এসেছে অনেকটা। অশোক চ'লেছে আগে। পেছনে জয়ন্তী। শাড়ীর আঁচলের ওপর বাতাস যেন চঞ্চল কিশোরীর মত হেসে কুটিকুটি হচ্ছে।

আমি তখনও সেগুনগাছের আড়ালেই। চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে রশ্মিমায়ার অবারিত বর্ষণই চলেছে একটানা।

সবার শেষে যেন কৌতুকই করেন সূর্যদেব। পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম সূর্যের বিচ্ছুরণে খুশীর হাসি ঝলমল করে ওঠে ঝরনার গায়। আমার লম্বাটে দেহের ছায়ামূর্ত্তিটি আরও অনেক দীর্ঘ হ'য়ে গোটা মালভূমিকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে।

কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলাম। বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ি অনেকটা। দীর্ঘ সেই ছায়ামূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। যেন ধরা পড়ে যাই নিজের কাছেই।

দিগন্ত বিস্তৃত উঁচুনীচু পাহাড়ের সীমাহীন আবেষ্টন কেমন গুমট মনে হয়। সারা চরাচরের নীরবতা ভেঙ্গে কঠিন পাষাণে ঝরনার জল বাড়ি খেয়ে খেয়ে যেন প্রশ্ন করে চ'লেছে একটানা : ক'রলে কি ?

মাথার সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে লটকানো পিঠের বোঝা নিয়ে যারা অনেক নীচে নেমে গেল তাদের দৃষ্টিতেও আমি যেন একই প্রশ্ন দেখেছি। আমার লম্বাটে দীর্ঘ সরল ছায়া মূর্ত্তিটি মালভূমির অনেক ওপর থেকে যেন একই প্রশ্ন করে : সেন সাহেব ক'রলে কি ?

চেনা মুখ

সত্যিই তো করলাম কি!

আজ বুঝতে পারি নিজেকেও আমি কম ফাঁকি দিইনি। নিজের থলিতে আজ শুধু আছে অন্য কথা। অপরের কথা। হাসি ও অশ্রুর কাহিনী আছে শুধু অন্য কোনো খানের।

যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট সে ফুলের জোগাড়ই শুধু রেখেছি। একটি ফুলও আজ অবশিষ্ট নেই আমার হাতে। ফাঁকি দিয়েছি, তাই ফাঁকও হ'য়েছে অনেকটা। প্রপোজল্ ফর্ম দিয়ে, জীবন বীমার নামতার বই ঢুকিয়ে, চেক বই-এর পুর দিয়ে সে ফাঁক ভরাট হবে না আজ। ব্যক্তি ফেলে বস্তুই শুধু সংগ্রহ করেছি এতদিন। সে সবই যেন তুচ্ছ, নিতান্তই যেন সব ময়লা কাগজ সংগ্রহ ক'রে রেখেছি যত্ন ক'রে। মানুষের অভিসন্ধির পেছনে ছুটে নিজের জীবনে সন্ধি করতেই ভুলে গেছি। ফন্দি আর মতলবই শুধু খুঁজেছি। মন মরে গেছে বহুদিন।

বয়স আজ আমার উনোচল্লিশ বলে চালাই। অনেকে খুশী ক'রতে চায়, বলে, পঁয়ত্রিশের বেশী কখনও নয়। আশ্চর্য, আমি খুশীও হই তাতে। কিন্তু আমি জানি! আমি জানি সব। সত্যি কথা ব'লবো? না থাক।

কি গ্রহ কি রাশিতে আমার জন্ম বিন্দু মাত্র আগ্রহ নেই জানার। তবে মুণ্ডহীন কেতুর মত অবিশ্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলার কবে যে শেষ হবে, বড় জানতে ইচ্ছে করে।

ইদানীং দেখছি বহু পুরাতন অভ্যস্ত পাঠ আমি কেমন ভুলে ভুলে যাচ্ছি। শুধু তাই নয়, নীরব শ্রোতা হিসাবে আমার সুনামই আছে যথেষ্ট। আজকাল আমি লক্ষ্য করছি, আমারও অনেক বলার আছে। জানানোর আছে অনেক কিছু। কিন্তু শোনানোর মত লোক পাইনে। তাকিয়ে দেখি চেয়ার শূন্য। ঘরে আমি সম্পূর্ণ একা।

আজও আমি ব্যস্ত। সারাটি দিন কাজে কাজেই থাকি। তবে পুর্বের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারিনে। পার্ক ষ্ট্রীটে দুরন্ত বাঁক নেওয়া আর পুর্বের মত আসে না। ডিনার টেবিলে ঘর কাঁপানো প্রাণখোলা হো হো করা হাসি আজ আর পুর্বের সুরে বাজে না।

নিষ্প্রাণ এই উদ্দাম গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে গাড়ি নিয়ে আজও আমি চলেছি ঠিকই। শীত-গ্রীষ্ম, প্রখর তাপ বা বড় দুর্দিনের কিছুই পরোয়া করি না এখনও।

দৈবাৎ কোনো মেঘলা দিনে আকাশ থেকে ভেসে আসা জলবিন্দুগুলি গাড়ির সামনের কাচের ওপর যখন টুপ টুপ ক'রে জমা হয় তা দেখে কেমন যেন আমি হ'য়ে যাই।

ছোট ছোট জলবিন্দুগুলির মধ্যে থেকে অদ্ভুত ভাবে অতি পরিচিত চেনা মুখ যেন সব ভেসে ওঠে। আশ্চর্য রকম স্থির দৃষ্টি মেলে তারা এক এক ক'রে এসে হাজির হয়। তারপর ওয়াইপার-এর আঘাতে আঘাতে তারা মিলিয়ে যায়।

ভেসে ওঠে অনিল মিত্তির। মনে পড়ে প্রথম দিনের আসা। জানালা দিয়ে তাঁর অদ্ভুত জিজ্ঞাসা: ডাক্তারবাবু আছেন নাকি? তামাটে ঠোঁটের অদ্ভুত হাসি যেন দেখতে পাই। বিস্ময়কর কণ্ঠস্বর যেন কানে আসে: যাই বলুন, মেয়েমানুষ এক অদ্ভুত চিজ্।

পর মুহূর্তেই এসে হাজির হয় মীরা। কাচের ওপরে আমার সিগারেটের আগুনের প্রতিফলনে জলবিন্দুটা যেন জ্বলে ওঠে। বরণডালায় যেন আগুন লেগেছে। মাথার চুলগুলো জ্বলে উঠলো মুহূর্তে। তারপর এক শীতল কণ্ঠ ভেসে এলো: আপনাকে এতদিন দেখিনি কেন সৌরীনদা। লাল কম্বলে ঢাকা মীরার দেহটা আর দেখতে পেলাম না। জুঁইফুলের গন্ধও আর নাকে পৌঁছলো না।

ওয়াইপার-এর আঘাতে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

তারপর আসে সরমুখ। এক পলকের জন্যে হাজির হ'য়েই ফুরিয়ে গেল। বাগানের অপর প্রান্ত থেকে যেন বেয়াড়া বাতাসের গায়ে হেলান দিয়ে এক চোরাই কান্না আমার গাড়িকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বহু দূরে মিলিয়ে গেল।

সেবা আসে তারপর। কি যেন ব'লতে যাচ্ছিল, টুপ ক'রে এসে হাজির হ'লো সোমনাথ। আদিনাথের ছেলেটা দেখি দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রছে, পারছে না। শুকনো পা দুটি বার বার তাকে ফেলে দিচ্ছে।

ওয়াইপ্পার সরিয়ে নিল তাদের।

—সাবলাই মাউণ্ট এভারেষ্ট মা ছড়মু পরছ। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু চিনতে পারি না প্রথমে। হাত নেই, কাঁধের দু-প্রান্ত বেয়ে দুখানা পা নেমে এসেছে। বামদিকের আধখানা মুখ ঠিকই আছে, বাকি অর্দ্ধেকটা অদ্ভুত লম্বাটে আকার ধারণ ক'রেছে। জ্যামিতিক ঢঙের এক অদ্ভুত দেহ।

চিনলাম অবশেষে। অ্যাবস্ট্রাক্ট্ চরিত্র এবার এলি দত্তের দেহটাকেও গড়ন দিয়েছে নিপুনভাবে। কি দুরন্ত কিউবিজম্!

এলি দত্তের বাম চোখে সুন্দর এক টুকরো মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ে। কানে এলো: তোমাকে আমার এত ভালো লাগে কেন সেন? তুমি কি দেখছো আমার দিকে অমন ক'রে?

পর মুহূর্তেই ডান দিকের ঠোঁটটি নড়ে উঠলো। ব'লতে শুনলাম তারপর: মিঃ সেন ইজ অ্যান ইন্টারেষ্টিং ম্যান কিন্তু নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। কাছে ডাকলেই একেবারে ঘাড়ে এসে পড়তে চান। পীটি, ইউ মাষ্ট হ্যাভ পীটি ফর মিঃ সেন।

জ্যামিতিক ভঙ্গিতে গড়া এলি দত্ত কেমন ছড়িয়ে পড়লো। দেখতে পেলাম লণ্ডনের টিউব ষ্টেশন। অতি সামান্য লোক ডাঃ সরকার। চোরের মত পালাচ্ছেন। দুর্ধর্ষ এক ডন জুয়ান যেন তাড়া করে নিয়ে চলেছে।

তারপর অর্দ্ধবৃত্তাকারে ওয়াইপার মুছে নিয়ে গেল সব।

টুপ করে এসে হাজির হলেন দস্তিদার সাহেব। ডান হাতটা বাম হাতে নিয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করছেন একমনে। কিছুটা দূরে ঘাসের ওপর ইয়াম্বার রক্তে সিঞ্চিত দেহ। থেলমার দিকে চোখ পড়লো তারপর। এক ফালি 'রিম্ব্াঁ'তে তার পরিপূর্ণ যৌবন শাসনে আসেনি। কানে বাঁশের দুল। জট পাকানো চুলের মধ্যে কাঁকই। তামাটে বন্য মুখটি অশ্রুতে মাখামাখি হয়ে গেছে।

ওয়াইপার যেন অজগরের মত সব কিছু লেহন করে নিয়ে গেল।

ডাঃ মিত্রের কর্কশ গলায় চমকে উঠলাম: সাট আপ লিও। অন্ধকার রাত্রের সেই পোর্টিকোর কণ্ঠ যেন ভেসে এলো তারপর: আপনি কিছু জানেন না! অবাক করলেন দেখছি।

পাশে তাকিয়ে দেখি জয়ন্তী। বিছানায় ভেঙে পড়ে তছনছ হচ্ছে নিজের দেহ নিয়ে। একবার শুধু অশ্রুমাখা সুন্দর মুখটি তুলে বলে: দেবতার কথা জানিনে কিন্তু আপনি মানুষ নন! আপনি একটা কি!!

টুপ করে এসে পড়ে জয়ন্তীর সঙ্গে একাকার হয়ে নিচে খসে পড়লো অশোক। অশোক যেন পালাচ্ছে।

রেখে গেল শুধু সর্পিল এক জলরেখা। মনে হলো উদাসীর মালভূমিটাকে আবর্তন করছে ডি. এইচ. আর। মিথ্যে, মিথ্যে, সবই মিথ্যে,—বলতে বলতে ফুরিয়ে গেল নিঃশেষ হয়ে।

ওয়াইপার টেনে নেয় তাদেরও।

তারপর এক এক করে নয়। টুপ টুপ করে ভেসে আসা নয়। এক সঙ্গে অনেক। একাকার হয়ে যাওয়া বহু মুখ সমস্ত কাচটিকে ঢেকে ফেলে। বহু উঁচু আকাশ থেকে অজস্র জলবিন্দু অবিশ্রান্ত বেগে ছুটে আসে। চোখের সামনে সহস্র চেনা মুখের হাসি ও অশ্রুর অফুরন্ত স্রোতধারা বয়ে যায়।

অবিশ্রান্ত ওয়াইপার-এর একটানা মুছে নেওয়ার বিরাম থাকে না তখন। ওয়াইপার-এর একটানা ওঠা-পড়ার শব্দ। বিলম্বিত যান্ত্রিক সেই আওয়াজের মধ্যে থেকে একই প্রশ্নই চলে একটানা: সেনসাহেব, করলে কি! করলে কি, করলে কি!! সেনসাহেব, করলে কি!!

আকাশে বড় দুর্দিন। আমার মনেও নামে দুর্যোগ। শুধু সামনে তাকাই। পেছনে তাকাতে ভয় করে। সামনের ছোট আয়নাটিকে বেঁকিয়ে দিই এক হাতে। মনে হয় এ পৃথিবীর যেন কোনো শেষ নেই। ঝড় আর প্লাবনের যেন অবসান হ'বে না কোনদিন। পথ অনেক দূর।

কিন্তু দুর্দিনের অবসান হয়। মনের দুর্যোগও থেমে আসে অনেকটা। অবিশ্রান্ত বর্ষণের শেষে মেঘলা আকাশের আড়ালে অনেক ওপরের অনন্ত নীলাকাশ ভেসে ওঠে। স্বচ্ছ কাচের ওপর একটি জল বিন্দুও অবশিষ্ট থাকে না। শুধু কানে লেগে থাকে অনেকক্ষণ, বহু মানুষের হাসি ও অশ্রুর অনুরণন। আবার যাত্রা সুরু। মানুষের পিছনে আমার দুরন্ত অনুসরণ।